নব
ভারত
স্রষ্টা

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ

হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত ডি. লিট



নব ভারত স্রষ্টা

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ

হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত ডি. লিট

প্রকাশন বিভাগ
তথ্য ও বেতার মন্ত্রক
ভারত সরকার

প্রথম প্রকাশ ঃ অক্টোবর, ১৯৭০ (আশ্বিন কার্তিক, ১৮৯২)
October, 1970 (Asvina-Kartika, 1892)

DESHBANDHU CHITTARANJAN DAS (Bengali)

মূল্য ঃ ৬ টাকা ৫০ পয়সা
Price : Rs. 6. 50

ডিরেক্টর, প্রকাশন বিভাগ, পাতিয়ালা হাউস, নূতনদিল্লী-১
কর্তৃক প্রকাশিত ও কৃপাল প্রিন্টিং প্রেস, দিল্লী-৭ দ্বারা মুদ্রিত।

সুধী রঞ্জন দাশ—কে

সূচীপত্র

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ

এই গ্রন্থে মুদ্রিত দেশবন্ধুর নামের পদবী প্রতিটি স্থলে 'দাস'-এর স্থলে 'দাশ' পড়িতে হইবে।

ভূমিকা

প্রত্যেক মহান জাতীয় আন্দোলন একাধিক জ্যোতিষ্মান ব্যক্তির আবির্ভাব ঘটায় যাঁরা অংশত এই আন্দোলনের স্রষ্টা ও সৃষ্টি। তাঁরা এই আন্দোলনের সৃষ্টি, কারণ এর পটভূমি ও আবেগ না পেলে তাঁদের চিন্তা ও কর্ম বাস্তবে রূপ পেত না বা রূপ পেলেও তা অঙ্কুরে বিনষ্ট ও অকালপ্রসূ হত। তাঁরা আবার আন্দোলনের স্রষ্টাও। কারণ তাঁদের আবির্ভাবের আগে জনগণের অবচেতন মনে যে আবেগ ও উত্তেজনা আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল সেগুলিকে রূপ দেন তাঁরা, ঠিকপথে পরিচালিত করেন তাঁরা। যুগের আশা আকাঙ্খা প্রকাশ করেন মহান ব্যক্তিরা আর সেই সঙ্গে সঙ্গে আশা আকাঙ্খার রূপায়ণ ঘটাবার প্রয়াস করেন বাস্তব রাজনীতির মাধ্যমে।

ভারতীয় জনগণের মানসিক শক্তির এ ধরণের আলোড়ন দেখা যায় ১৯১৯ সালে অসহযোগ আন্দোলনে। মহাত্মা গান্ধীর মত এক বিশ্বপুরুষের আবির্ভাবের জন্য মঞ্চ তৈরী করেছিলেন বহু বিরাট ব্যক্তি। তাঁর পূর্বসূরীদের অবদান ও সেবা না পেলে মহাত্মা গান্ধীর পক্ষে নিয়তি নির্দিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ কখনই সম্ভব হত না। সীমাহীন সমতটের মধ্যে নির্জন শিখরের মত তিনি একক, উর্দ্ধে মাথা তুলে দাঁড়ান নি। ধরিত্রী যখন অশান্ত হয়, আলোড়িত হয় তখন পুরো পর্বত-শ্রেণী আত্মপ্রকাশ করে—অবশ্য কোন কোন শিখর অন্য শিখরের তুলনায় বেশী উঁচু হতে পারে।

অসহযোগ আন্দোলন এনেছিল বীরত্বের দিন; সারা ভারতে স্ত্রী পুরুষ নির্বিশেষে হাজার হাজার সাধারণ মানুষের মনে লেগেছিল নতুন আশা, নতুন প্রচেষ্টার জোয়ার। ভারত জন্ম দিয়েছিল এক তারকামণ্ডলীর। তারমধ্যে উজ্জ্বলতম তারকাটি হল মহাত্মা গান্ধী। কিন্তু অন্যান্যেরাও নিষ্প্রভ ছিলেন না। তাঁদের সকলেরই স্থান প্রথম সারিতে। আর, কি উজ্জ্বল সেই তারকামণ্ডলী যাতে শোভা পেয়েছিলেন মহাত্মা গান্ধী, পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু, চিত্তরঞ্জন দাশ, মৌলানা মহম্মদ আলি, হাকিম আজমল খাঁ, সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল, ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ, মৌলানা আবুল কালাম আজাদ ও পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু।

মাত্র ছবছর চিত্তরঞ্জন দাশ সক্রিয় রাজনীতিতে ছিলেন কিন্তু তারই মধ্যে ভারতীয় জনগণের চিত্তে তাদের অন্যতম মহান নেতারূপে তাঁর আসন পাকা হয়ে গিয়েছিল। আরও উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে, এই সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে তিনি বিক্ষোভমূলক রাজনীতির স্তর থেকে উচ্চ পর্য্যায়ের রাজনীতিতে উন্নীত হতে পেরেছিলেন। এ তথ্য শুধু তাঁদেরই বিস্ময়ের উদ্রেক করে যাঁরা জানেন না যে চিত্তরঞ্জনের সারা জীবন ধরে শুধু এই পরিণতির জন্যই প্রস্তুতি চলছিল। চিত্তরঞ্জন দাশ বড় আইনজীবী ছিলেন। কিন্তু ভারতের জাতীয় স্বার্থ তুলে ধরার জন্য ব্রিটিশ আইনের খুঁটিনাটি যে সব ক্ষেত্রে তিনি সম্যক প্রয়োগ করতে পেরেছিলেন সেগুলিই হয়ে দাঁড়ায় তাঁর আইনজীবনের সফলতম মামলা। তিনি আবার উচ্চস্তরের এবং সম্ভাবনাপূর্ণ কবি ও সাহিত্যিক ছিলেন। তাঁর সমস্ত রচনার লক্ষ্য এক। ভারতীয় কৃষ্টি রক্ষা ও তার শ্রীবৃদ্ধি এবং পাশ্চাত্যের প্রভাব থেকে ভারতীয় আত্মার মুক্তি সাধন। চিত্তরঞ্জন দাশ ভারতের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নতির জন্যও কাজ করেছিলেন কারণ তিনি বিশ্বাস করতেন যে শুধুমাত্র এই পথেই ভারতের স্বাধীনতালাভ সম্ভব।

রাজনীতির কবলে পড়ার পর চিত্তরঞ্জন দাশ ভারতের মুক্তি আন্দোলনে মনপ্রাণ সমর্পণ করেন। রাতারাতি তিনি তাঁর রাজোচিত আইন ব্যবসা ত্যাগ করেন। ভারতের অন্যতম ধনীশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিকে দেখা গেল এমন এক অবস্থায় যখন তাঁর নিজের বলতে কিছুই নেই। দরিদ্রের প্রতি সহজাত সহানুভূতি থাকার জন্য তিনি ঘোষণা করেছিলেন যে, স্বরাজের অর্থ হবে ভারতীয় জনগণের সমৃদ্ধতর ও উন্নতিতর জীবন—শুধুমাত্র সুবিধাগ্রস্ত শ্রেণীর জন্য অতিরিক্ত অধিকার অর্জন করা নয়। ভারতের জাতীয় আন্দোলনে তিনি নিয়ে আসেন কবির আবেগ ও আইনজীবীর বিশ্লেষণী মন। তাঁর সেবা ও ত্যাগ যে সারা দেশের জনগণের চিত্ত জয় করবে তাতে আর আশ্চর্য্য কি! প্রায় রাতারাতি ব্যারিষ্টার মিঃ সি. আর. দাশ হয়ে দাঁড়ালেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন—তাঁর দেশ ও জনগণের বন্ধু এবং সেবক।

ভারতীয় রাজনীতির ক্ষেত্রে অন্যতম ট্রাজেডি হল দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের অকাল বিয়োগ। মাত্র পঞ্চান্ন বছর বয়সে মৃত্যু তাঁর সংগ্রাম ও সেবার অবসান ঘটায়। আর তা ঘটে এমন এক সময় যখন শুধুমাত্র তাঁর প্রয়াসের ফলেই ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গী এবং ব্রিটিশ প্রতিক্রিয়া উভয়ক্ষেত্রেই একটা পরিবর্তন দেখা দিয়েছিল। তাঁর কাজের ফলে দেশের দুটি বড় সম্প্রদায়ের মধ্যে সমঝোতা ও সৌহার্দ্যের আবহাওয়া সৃষ্টি হয়েছিল। তখন পর্য্যন্ত অন্য কোন ভারতীয় নেতা মুসলমান ও হিন্দুর ওপর সমভাবে প্রভাব বিস্তার করতে পারেন নি। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ এবং তারপরে খিলাফত আন্দোলন ও অসহযোগ আন্দোলনের ফলে রীতিমত নাড়া খেয়ে যাওয়া ব্রিটিশ সরকারের সামনে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের উদ্দীপনাময় নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ ভারতের একীভূত দাবী পেশ করা সম্ভব ছিল।

শেষ পর্য্যন্ত ফল কি হতো তা কেউ বলতে পারে না। কিন্তু সেদিন বহু বিশিষ্ট নেতার বিরোধিতা সত্ত্বেও দেশবন্ধু

চিত্তরঞ্জন যেভাবে কংগ্রেসকে স্বমতে আনতে পেরেছিলেন তা তাঁর বিরাট সাহস ও অধ্যবসায়ের পরিচায়ক। তাঁর প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, আলাপ আলোচনায় দক্ষতা এবং ভারতীয় জনগণের চিত্তে তাঁর প্রভাব কত দৃঢ় ছিল তারও প্রমাণ এতে পাওয়া যায়। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের এই সব গুণ থাকার জন্য এবং তাঁর বন্ধু ও সহকর্মী পণ্ডিত মতিলাল নেহরুর কাছ থেকে যে সমর্থন তিনি পেয়েছিলেন তাতে এ আশা করা যেতে পারে যে সেদিন ব্রিটিশ সরকার ও ভারতীয় জনগণের মধ্যে যে জটিল আবর্তের সৃষ্টি হয়েছিল তা থেকে বেরোবার পথ তিনি খুঁজে পেতেন।

দেশবন্ধু ছিলেন বস্তুনিষ্ঠ আদর্শবাদী। তিনি জানতেন কেমন করে অভিপ্রেতের সঙ্গে সম্ভাব্যের সংযোগ ঘটাতে হয়। শ্লোগানের বশীভূত তিনি কোনদিনই হন নি এবং অপ্রাসঙ্গিক ও অনতিপ্রয়োজনীয়ের মধ্য থেকে অত্যাবশ্যক জিনিষটি বেছে নেবার মত অনন্যসাধারণ ক্ষমতা তাঁর ছিল। তিনি জানতেন, দীর্ঘকালব্যাপী রাজনৈতিক সংগ্রামের মাঝে মাঝে কলাকৌশল পরিবর্ত্তন অবশ্যই করতে হবে। কোন মিথ্যা দম্ভকে এ ধরণের পরিবর্ত্তনের অন্তরায় হতে তিনি কোনদিন দেননি। বাস্তববাদী ছিলেন বলে দেশবন্ধু জানতেন যে আলাপ আলোচনা ও আপোষের মাধ্যমে স্বাধীনতা লাভের চেষ্টা করলে তা আসবে ধাপে ধাপে। বারবার তিনি একথাই বলেছিলেন, প্রত্যেকটি লাভ সংহত এবং তাকে ভিত্তি করে লক্ষ্যাভিমুখে আরও এগিয়ে যাওয়ার প্রয়াসই হবে রাজনৈতিক বিচক্ষণতার পরিচায়ক। তাঁর বিচক্ষণতা ও দূরদৃষ্টি কতখানি ছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় তাঁর একটি উক্তিতে। ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন কার্য্যকরী হওয়ার দশ বছরেরও আগে তিনি বলেছিলেন যে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে পরবর্তী অগ্রগতি হবে প্রাদেশিক স্বায়ত্বশাসন ও সঙ্ঘবদ্ধ কেন্দ্রীয় সরকার।

রাজনৈতিক নেতারা নিজেদের কালে অভূতপূর্ব জনপ্রিয়তা লাভ করে থাকেন। জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে অনুরূপ বা অধিকতর বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মহিমা তাঁরা ম্লান করে দেন। অবশ্য তাঁদের খ্যাতির তীব্রতার সঙ্গে প্রায়ই জড়িত থাকে ক্ষণস্থায়িত্ব। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে রাজনৈতিক নেতাদের খ্যাতি ম্লান হতে থাকে কিন্তু বৈজ্ঞানিক, লেখক বা শিল্পীরা—যাঁরা তাঁদের জীবনকালে রাজনৈতিক নেতাদের সামনে নিষ্প্রভ হয়ে গিয়েছিলেন—অধিকতর ঔজ্জ্বল্যে দীপ্তমান হয়ে ওঠেন। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের অনেক মহান যোদ্ধাই আজ বিস্মৃত-প্রায় নাম। তবে জাতীয় স্বার্থে তাঁদের সকলের সেবা স্মরণ করা আবশ্যক। যে জাতি তার অতীত বীরদের ভুলে যায় এবং শুধুমাত্র বর্তমান নায়কদেরই সম্মান জানায় সে জাতি অনুপ্রেরণার দিক থেকে দারিদ্র্যগ্রস্ত। হঠাৎ বিপ্লব ও পরিবর্তনের মত বিপদের সম্মুখীন তাকে হতে হবে। যে সব বড় বড় নেতা ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস গঠন করেছিলেন এবং জাতীয় আন্দোলনে শক্তি জুগিয়েছিলেন, ও দিক নিরূপণ করেছিলেন তাঁদের সেবার কথা যদি ভুলে যাওয়া হয় এবং আজকের তরুণ সম্প্রদায় তাঁদের অবদান সম্বন্ধে কিছু না জেনে ও তাঁদের সেবার প্রতি কোন শ্রদ্ধা পোষণ না করে বড় হয় তাহলে সেটা হবে রাজনৈতিক অপরিপক্কতার নিদর্শন।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন এবং তাঁর দিনগুলি আমাদের স্মৃতিতে পুনরায় জাগিয়ে দেওয়ার জন্য ডাঃ হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত আমাদের ধন্যবাদ ও অভিনন্দনের পাত্র। ডাঃ দাশগুপ্ত দেশবন্ধুর অন্যতম অনুচর ও বন্ধু ছিলেন। দেশবন্ধুর আশা ও আন্দোলনের ভাগ তিনি নিয়েছিলেন এবং দুর্দিনে ও সুদিনে তাঁর পাশে পাশে ছিলেন। সারা জীবনের শ্রদ্ধা ও ব্যক্তিগত পরিচয়লব্ধ বিশ্বাস ও ভক্তি নিয়ে তিনি নিজের নেতার

সম্বন্ধে লিখেছেন। ডাঃ দাশগুপ্তের প্রতিটি অভিমত হয়তো সমর্থন করা যায় না কিন্তু দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের এই সংক্ষিপ্ত জীবনী উপহার দিয়ে তিনি যে ভারতের প্রকৃত সেবা করেছেন একথা কেউ অস্বীকার করতে পারবেন না।

হুমায়ুন কবীর

নয়াদিল্লী
১৩ই মে, ১৯৫৯

প্রথম অধ্যায়

পরিবেশ ও পিতৃ পরিচয়

পূর্ব্ব ভারতে জ্ঞান ও কৃষ্টি চর্চার জন্য বহু শতাব্দী ধরে বিক্রমপুর বিখ্যাত। দ্বাদশ শতাব্দীতে বঙ্গ নৃপতি বল্লাল সেন এবং লক্ষণ সেনের রাজধানী এই বিক্রমপুরে অবস্থিত ছিল। দশম শতাব্দীতে তিব্বতে বুদ্ধের বাণী বহন করে যিনি নিয়ে গিয়েছিলেন সেই দীপঙ্করের দেশ হল বিক্রমপুর। মধ্যযুগে কেদার রায়ের—যিনি বহুকাল দিল্লী সম্রাটের শক্তি উপেক্ষা করেছিলেন—গদীও ছিল এখানে। আরও সম্প্রতিকালে বাংলাদেশের কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তির দেশ হল বিক্রমপুর। জগদীশচন্দ্র বসু এই পরগণা থেকে এসেছিলেন, চিত্তরঞ্জন দাসও।

বিক্রমপুর—বর্ত্তমানে পূর্ব পাকিস্তানের অন্তর্গত—বহু নদী-বিধৌত স্থান। এর পশ্চিম সীমান্তে বয়ে চলেছে প্রচণ্ড পদ্মা, পূর্বে মেঘনা। এই সব নদী-প্রবাহের ফলে অনবরত পাড় ভাঙছে ও নতুন চর মাথা তুলছে। এই নদীগুলি যেমন ভাল আবহাওয়া সৃষ্টি করেছে তেমনি স্থানীয় অধিবাসীদের বাধ্য করেছে প্রকৃতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে জীবিকার সন্ধান করতে। লর্ড কারমাইকেল ১৯১৫ সালে বিক্রমপুর পরিদর্শন করেন। তিনি বিক্রমপুর সম্বন্ধে লিখেছেন, "বিক্রমপুর অনেকটা আমার দেশ স্কটল্যাণ্ডের মত। কারণ এর শ্রেষ্ঠ সন্তানদের মধ্যে অনেকেই বিক্রমপুর থেকে অনেক দূরে কর্মসন্ধানে যান এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে স্কটদের মতই জনসম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়ের প্রশাসনে বড় অংশ নিয়ে থাকেন। আবার স্কটদের মত তাঁরা নিজেদের দেশ সম্বন্ধে সদা গর্বিত আর তাঁদের সন্তান পূর্বপুরুষদের জন্মভূমির সঙ্গে

যোগ থাকার জন্য গর্ববোধ করেন।" বিক্রমপুরে তেলিরবাগ গ্রাম পদ্মা নদীর উত্তর তীরে অবস্থিত। এই গ্রামের বৈদ্য পরিবারে চিত্তরঞ্জন জন্মগ্রহণ করেন। বৈদ্যেরা পেশায় চিকিৎসক এবং প্রগতিশীলতা ও জ্ঞানানুরাগের জন্য বিখ্যাত। বহু বছর ধরে নিজেদের লোকদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারে এই সম্প্রদায় উল্লেখযোগ্য উৎসাহ দিয়ে এসেছেন। বস্তুত ভারতে স্ত্রীশিক্ষার ক্ষেত্রে এই সম্প্রদায় সব সময়ই পুরোভাগে ছিলেন।

নিজের জন্মস্থান ও সম্প্রদায়ের সকলগুণ ও বৈশিষ্ট নিয়ে চিত্তরঞ্জন জন্মেছিলেন। শৈশবেই দুঃসাহসিকতা, মহৎ উদ্দেশ্যের প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ এবং শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের দৃঢ় প্রতিজ্ঞা তাঁর মধ্যে দেখা গিয়েছিল। তিনি তাঁর প্রপিতামহ শ্রী চন্দ্রনাথ দাসের মহানুভবতা উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছিলেন। এই মহানুভবতাই ছিল তাঁর স্বভাবের বৈশিষ্ট্য।

চিত্তরঞ্জনের পিতামহ কাশীশ্বর দাস বরিশালের সরকারী উকিল ছিলেন। তাঁর তিন ছেলে, কালীমোহন, দুর্গামোহন ও ভুবনমোহন। কলকাতা হাইকোর্টে ওকালতি করতেন। জ্যেষ্ঠ কালীমোহন বেশ বড় উকিল হয়েছিলেন। তিনি নির্ভীক ও স্পষ্টবাদী ছিলেন। একটু বদরাগী ছিলেন বলে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে প্রায়ই তাঁর খিটিমিটি লাগত। তখনকার দিনে কোন উকিল বিচারপতিকে, বিশেষ করে হাইকোর্টের বিচারপতিকে, চ্যালেঞ্জ করেছেন এমন কথা খুব কম শোনা যেত। একবার কোন এক মামলায় সওয়াল করার সময় বিচারপতি লুই জ্যাকসন কালীমোহন দাসের প্রতি বিরূপ মন্তব্য করেন। কালীমোহন তীব্র জবাব দেন, মাননীয় বিচারপতি মহাশয়, আমি অবাক হচ্ছি এই দেখে যে আপনার জেলা জজিয়তির দীর্ঘ অভিজ্ঞতা থাকা সত্বেও আপনাকে এ বিষয়টি আমি বোঝাতে পারছি না যা আইনের ছাত্র অতি সহজেই বুঝতে পারে।"

ফলে বিচারপতি রেগে যান এবং কালীমোহনের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বন করেন। কালীমোহনের বহু বন্ধু তাঁকে ক্ষমা প্রার্থনার পরামর্শ দেন। কিন্তু তিনি তা করতে অস্বীকার করেন। কলিকাতা হাইকোর্টের ফুল বেঞ্চের সামনে এই বিষয়টি পেশ করা হয়। তদানীন্তন প্রধান বিচাপতি স্যার বার্নস পিকক কালীমোহনের অনুকূলে রায় দেন। তিনি বলেন, "কালীমোহন বাবু যে ভাষা প্রয়োগে সংযমবোধের পরিচয় দেননি সে বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ। কিন্তু আইনের যে নীতি তিনি ব্যাখ্যা করছিলেন তা ঠিক। অতএব তাঁর বিরুদ্ধে কিছু করার নেই।"

দুর্গামোহন দাস একজন বড় সমাজ সংস্কারক এবং গোঁড়া ব্রাহ্ম ছিলেন। মেয়ের বয়স ষোল বছর—ব্রাহ্ম সমাজের বিধান অনুযায়ী মেয়েদের বিবাহের ন্যূনতম বয়স হয়নি বলে কুচবিহারের মহারাজার সঙ্গে তার বিয়ে দেননি। স্ত্রী পুরুষের সমান অধিকার ও পর্দাপ্রথা উচ্ছেদ করার জন্য তিনি আনন্দমোহন বসু, শিবনাথ শাস্ত্রী ও অন্যান্যদের সঙ্গে একযোগে কাজ করেছিলেন। তাঁর তিন ছেলেও আইন ব্যবসায় গ্রহণ করেন এবং ব্যারিষ্টার হন। তাঁদের মধ্যে সতীশরঞ্জন বাংলাদেশের অ্যাডভোকেট জেনারেল ও পরে বড়লাটের কার্য্যনির্ব্বাহক পরিষদে আইন সদস্য হন।

চিত্তরঞ্জনের পিতা ভুবনমোহন কলকাতা হাইকোর্টের উকিল ও অ্যাটর্নী ছিলেন। মার্জিত রুচি, উদার হৃদয় ভুবনমোহনের, অন্যের দোষ ত্রুটি উপেক্ষা করার মত মহানুভবতা ছিল। কবিতা ও সঙ্গীত তাঁর প্রিয় ছিল। কবিতা ও গাথা তিনি রচনা করতেন। প্রতি সকালে স্বরচিত গাথা তিনি গাইতেন। তিনি সুলেখক ছিলেন। তাঁর ভাষা ছিল সরল, স্বচ্ছন্দ ও সাবলীল। আন্তরিকতা ও সতেজ লেখনীর জন্য 'ব্রাহ্মজনমত' পত্রিকার সম্পাদকরূপে বাংলার সাংবাদিক সমাজে তিনি বিশিষ্ট আসন লাভ করেছিলেন।

কালীমোহনের মত বহুবার কর্তৃপক্ষের সঙ্গে তাঁরও ঝগড়া হয়েছিল।

চিত্তরঞ্জন পিতার বহু গুণ পেয়েছিলেন। কিন্তু মনে হয় তাঁর ওপর মায়ের প্রভাবই বেশী। তাঁর মা ছিলেন উদার হৃদয়, অতিথিপরায়ণ ও ন্যায়নিষ্ঠ। উচ্চ শিক্ষা তিনি পাননি। কিন্তু সহজাত ধীশক্তি ও প্রতিভার অধিকারিণী ছিলেন তিনি। তাঁর স্বামীর আবেগ প্রবণতা ও মহানুভবতার ফলে তাঁদের পারিবারিক যে কষ্টের মধ্যে পড়তে হয়েছিল তা থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্য এ সমস্ত ক্ষমতা তাঁর প্রয়োজন ছিল। ভুবনমোহন শুধু অমিতব্যয়ী ছিলেন না, পরার্থে ঋণ করতেও সদা তৎপর ছিলেন। শেষে তাঁকে দেউলিয়া ঘোষণা করা হয়। প্রচণ্ড ঋণ ও বহু পোষ্যের দাবী মেটাতে গিয়ে ভুবন মোহনের পরিবার দুর্দশাগ্রস্ত হয়। সাধারণ বুদ্ধি ও সাহসের সঙ্গে নিস্তারিণী দেবী এ দায়িত্ব বহন করেন। দুর্দিন বা সম্পদ কোন কিছুই তাঁর চরিত্রের উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। তিনি দুইই সমান প্রশান্তির সঙ্গে গ্রহণ করেন। খুবই স্বাভাবিক যে চিত্তরঞ্জন এমন মায়ের প্রতি অত্যন্ত অনুরক্ত হবেন এবং তাঁর জন্য যে কোন ঝুঁকি নিতে প্রস্তুত থাকবেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়

বাল্যজীবন ও শিক্ষা

চিত্তরঞ্জন দাস ১৮৭০ সালে ৫ই নভেম্বর শনিবার জন্মগ্রহণ করেন। আট ভাই বোনের মধ্যে তিনি দ্বিতীয়। তাঁর আগে এক দিদি, তাঁর পরে চার ছোট বোন ও দুভাই।

বাল্যে চিত্তরঞ্জন ভারতের অন্যতম সুপরিচিত রাজনৈতিক নেতা ও বিখ্যাত বাগ্মী বিপিন চন্দ্র পালের সংস্পর্শে আসেন। শিশুকাল থেকেই চিত্তরঞ্জন দেশাত্মবোধক কবিতা অনুরাগী। বিশেষ উদ্দীপনার সঙ্গে তিনি সেগুলি আবৃত্তি করতেন। ন বছর বয়সে তিনি স্কুলে ভর্ত্তি হন এবং ১৮৮৬ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তারপর, প্রেসিডেন্সী কলেজে ভর্ত্তি হন। গত একশ বছরে ভারতের বহু বিশিষ্ট সন্তান এই কলেজের অবদান। তাই প্রেসিডেন্সী কলেজের ছাত্রেরা বলত, "জাতীয় জীবনে যে কোন বিশিষ্ট ব্যক্তিই প্রেসিডেন্সী কলেজের কেউ।" চিত্তরঞ্জনের সমকালীন ছাত্রদের মধ্যে অনেকেই পরবর্ত্তী জীবনে জন প্রশাসন, রাজনীতি ও সাহিত্যে বিশিষ্টতা অর্জন করেছিলেন।

চিত্তরঞ্জন ইংরেজি ভাল জানতেন কিন্তু অঙ্কে কাঁচা ছিলেন। বাংলা সাহিত্যে তাঁর বিশেষ অনুরাগ ছিল, বঙ্কিমচন্দ্রের লেখা তাঁকে অভিভূত করত। তিনি রবীন্দ্রনাথের রচনাও পড়তেন এবং কীটস, শেলী ও ব্রাউনিংয়ের ভক্ত ছিলেন। বিতর্কে তাঁর অসামান্য দক্ষতা ছিল। চিত্তরঞ্জন ছাত্র সমিতির সেক্রেটারী হন। সেখানে সুরেন্দ্রনাথ, যিনি অচিরে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের অন্যতম নেতা

হয়ে দাঁড়ান, প্রায়ই বক্তৃতা করতে আসতেন। চিত্তরঞ্জন বাংলাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার দ্বিতীয় ভাষা মাধ্যম করতে চেয়েছিলেন এবং এ বিষয়ে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য্যের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। কিন্তু তাঁর প্রস্তাব গৃহীত হয়নি কারণ উপাচার্য্য মনে করেন যে বাংলা দ্বিতীয় ভাষা মাধ্যম হয়ে দাঁড়ালে সংস্কৃতের মর্য্যাদা ও গুরুত্ব খর্ব হবে।

ভারতীয় সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় উর্ত্তীর্ণ হওয়ার জন্য চিত্তরঞ্জনকে ১৮৯০ সালে বিলেতে পাঠান হয়। তাঁর সঙ্গে তাঁর কলেজের বন্ধু জে. এন. গুপ্তও গিয়েছিলেন। শ্রীগুপ্ত পরবর্ত্তী জীবনে আই. সি. এস অফিসাররূপে বিশেষ দক্ষতার পরিচয় দেন।

লণ্ডনে চিত্তরঞ্জন অধ্যাপক কারভেথ রীডের সংস্পর্শে আসেন। অধ্যাপক রীড চিত্তরঞ্জনকে খুব স্নেহ করতেন এবং তাঁকে দর্শন ও সাহিত্যে শিক্ষা দেন। ১৮৯২ সালে চিত্তরঞ্জন সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় বসেন কিন্তু পরীক্ষার ফল ভাল হবে না ভেবে শেষ পর্য্যন্ত সব কটি পরীক্ষা দেননি। তাঁর বন্ধু শ্রী জে. এন. গুপ্ত সিভিল সার্ভিসে যোগ দিয়ে অক্সফোর্ডে চলে যান। চিত্তরঞ্জন লণ্ডনেই ছিলেন।

অধ্যাপক কারভেথ রীড তাঁর এই তরুণ ছাত্রটি সম্বন্ধে উচ্চ ধারণা পোষণ করতেন। তিনি চিত্তরঞ্জনকে বলতেন নিজে থেকেই সমস্যা চিন্তা করতে। এবং সেই সমস্যা সম্বন্ধে নিজের অভিমত স্থির করার পর পাঠ্যপুস্তক খুলে মিলিয়ে নিতে হবে। এ খুব কঠিন কাজ। কিন্তু অধ্যাপক রীডের মতে এতে চিত্তরঞ্জনের স্বাধীন চিন্তা ও নিজস্ব ভঙ্গীতে প্রকাশ করার ক্ষমতা হবে।

১৮৯৩ সালে চিত্তরঞ্জন আবার সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা দেন। এবং এবার পরাক্ষা ভাল দিয়েছেন বলে তাঁর মনে হয়। পরাক্ষায়

সাফল্য লাভের আশার কথা তিনি পিতাকে কেবল্ যোগে জানান। আর একজন প্রতিযোগী আলবিয়ন ব্যানার্জি তাঁর বন্ধুদের জানান যে চিত্তরঞ্জন অবশ্যই পাশ করবেন। শেষে কিন্তু জানা গেল যে পূর্ব ঘোষণা অনুসারে সিভিল সার্ভিসে পঞ্চাশ জন না নিয়ে সে বছর বিয়াল্লিশ জনকে নেওয়া হবে। তালিকায় চিত্তরঞ্জনের স্থান ছিল তেতাল্লিশ।

অনেকের ধারণা চিত্তরঞ্জন তাঁর রাজনৈতিক কার্য্যকলাপের জন্য সিভিল সার্ভিসে স্থান পাননি। শিশুকাল থেকে তাঁর স্বদেশ প্রীতি প্রগাঢ় এবং স্বদেশী বস্তুর প্রতি তাঁর অসীম অনুরাগের নিদর্শন দিয়েছেন। লণ্ডনে তিনি সোণার ভারী ছড়া ব্যবহার করতেন। তাঁর শিক্ষকদের নজরে সেটি পড়ে। এ ধরণের ফ্যাশন বহির্ভূত বস্তু ব্যবহার করার কারণ জিজ্ঞাসা করলে চিত্তরঞ্জন সদর্পে জবাব দেন যে ব্রিটেনের অতি ফ্যাশন দুরস্ত চেনের চেয়ে ভারতের তৈরী অসুন্দর চেন তিনি বেশী পছন্দ করেন।

তাছাড়া, প্রথমবার সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা দেওয়ার পরেই চিত্তরঞ্জন ভারতের পক্ষ থেকে রাজনৈতিক কার্য্যকলাপে জড়িয়ে পড়েন। ১৮৯২ সালে ব্রিটেনে সংসদীয় নির্বাচন চলছিল। গ্লাডষ্টোনের অনুসরণকারীদের প্রতি ভারতীয়দের সমর্থন ছিল। ১৮৮৩ সালে ইলবার্ট বিলের বিরুদ্ধে আন্দোলন দিয়ে সুরু হওয়ার পর থেকে পর পর নানা ঘটনায় ছাত্রদের মধ্যে রাজনৈতিক উদ্দীপনা জেগেছিল। সেই বছরেই সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কারারুদ্ধ হন। এবং ভারতীয় জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত বিদায় অভিনন্দন ও শুভেচ্ছার মধ্যে লর্ড রিপন ভারত ত্যাগ করেন। যদিও ভারতের ইংরেজগণ তাঁর বিদায়ে আনন্দিতই হয়।

ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন ১৮৮৫ সালে শ্রী উমেশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে বম্বেতে অনুষ্ঠিত হয়।

দ্বিতীয় অধিবেশন কলকাতায় দাদাভাই নওরোজীর সভাপতিত্বে এবং তৃতীয় অধিবেশন মাদ্রাজে সৈয়দ বদরুদ্দীন তায়েবজীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। বুদ্ধিজীবী শ্রেণী কংগ্রেসের ডাকে প্রবল উৎসাহে সাড়া দেন কিন্তু ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ বিরক্ত ও ক্রুদ্ধ হন। লর্ড ডাফরিন কংগ্রেস সদস্যদের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র সংখ্যালঘু সম্প্রদায় বলে উল্লেখ করেন। কিন্তু এসবের ফলে দেশের তরুণ সমাজে জাতীয়তাবোধ আরও উগ্র হয়েছিল মাত্র। ১৮৮৯ সালে বম্বেতে কংগ্রেসের পঞ্চম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের খ্যাতনামা উদার-নৈতিক দলীয় সদস্য চার্লস ব্রাডলো এই অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন। দেশে ফিরে গিয়ে ব্রাডলো ভারতে সংস্কার সম্পর্কে একটি বিল পেশ করেন। বিলটি দ্বিতীয় পাঠে গৃহীত হওয়া সত্বেও আইনে পরিণত হতে পারেনি। কারণ চার্লস ব্রাডলো হঠাৎ গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং শেষ পর্য্যন্ত তাঁর মৃত্যু ঘটে। তদানীন্তন ভারত সচিব লর্ড ক্রস একটি বিল আনয়ন করেন যা ১৮৯২ সালের ভারত পরিষদ আইনরূপে গৃহীত হয়। লর্ড সভায় লর্ড নর্থব্রুক, লর্ড রিপন ও লর্ড স্যাণ্ড্‌লে এবং কমন্স সভায় গ্লাডষ্টোনের পরামর্শ উপেক্ষা করে উক্ত আইনে মনোনীত—নির্বাচিত নয়—বিধানসভা প্রবর্তনের নির্দেশ দেওয়া হয়।

ইংলণ্ডে ১৮৯২ সালের নির্বাচনে স্বাভাবিক কারণেই ভারতীয় সমস্যার প্রতি কিছুটা নজর দেওয়া হয়েছিল। ভারতে স্বায়ত্ব শাসনের বিরোধীদের কয়েকজন তাঁদের ভাষণে ভারতীয়দের সম্বন্ধে অপমানজনক মন্তব্য করেন। তাতে ব্রিটেনে অবস্থিত ভারতীয় ছাত্রদের মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। এই রাজনৈতিক অভিযানে চিত্তরঞ্জন বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করেন এবং সিভিল সার্ভিস প্রার্থী হওয়া সত্বেও এক্সিটার ও অন্যত্র ভারত সংস্কারের পক্ষে তীব্র ভাষায় বক্তৃতা করেন। তাঁর বক্তৃতা উদারনৈতিক দলের গ্লাডষ্টোনসহ বিশিষ্ট নেতাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। অবশেষে

উদারনৈতিক দল নির্বাচনে জয় লাভ করে। কিন্তু সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণদের তালিকায় চিত্তরঞ্জনের নাম যে ছিল না সেকথা আগেই বলেছি। চিত্তরঞ্জনের মনে হল যে তাঁর রাজনৈতিক কার্য্যকলাপের ফলেই তিনি পরীক্ষায় সফল হতে পারেন নি। তিনি পিতাকে কেব্ল্ পাঠালেন, 'ফেল করেছি। একটি স্থানের জন্য চাকরীর বাইরে।'

চিত্তরঞ্জনের পিতামাতা খুবই উদ্বিগ্ন হলেন। তাঁদের ভয় ছিল, এই ব্যর্থতার ফলে চিত্তরঞ্জন হয় মরীয়া হয়ে কিছু একটা করে বসবেন। নয়ত আর দেশে ফিরবেন না। ভুবনমোহন তার করে চিত্তরঞ্জনকে নির্দেশ দিলেন ব্যারিষ্টারি পড়ার জন্য। পরে চিঠিতে লিখলেন পারিবারিক ঐতিহ্য চিত্তরঞ্জনকে আইন ব্যবসার উপযোগী করে গড়েছে। এ প্রসঙ্গে ভুবনমোহনকে লিখিত কলিকাতা হাইকোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি স্যার রিচার্ড গার্থের পত্রের অংশবিশেষ উল্লেখযোগ্য—"আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু ওল্ডহামে তোমার ছেলের জ্বালাময়ী ভাষণ সব কিছু পণ্ড করে দিয়েছে। ইণ্ডিয়া অফিসকে টলাতে পারলাম না।"

চিত্তরঞ্জন ইনার টেম্পলে যোগদান করেন এবং ১৮৯৩ সালে ব্যারিষ্টার হন।

তৃতীয় অধ্যায়

প্রারম্ভিক সংগ্রাম ও সাফল্য

১৮৯৩ সালের ডিসেম্বর মাসে চিত্তরঞ্জন বিচারপতি সালের সম্মুখে কলকাতা হাইকোর্টের এ্যাডভোকেটরূপে শপথ গ্রহণ করেন। বহু নবীন আইনজীবীর মত তাঁকেও গোড়ার দিকে যথেষ্ট কষ্ট করতে হয়েছিল, নানা হতাশার সম্মুখীন হতেও হয়েছিল। ভবিষ্যৎ রীতিমত অন্ধকার বলে মনে হয়েছিল। তাঁর পিতা দেনার দায়ে মাথা বিকিয়ে বসে আছেন। অবস্থা এতেই যথেষ্ট খারাপ। তার ওপর কলকাতা পৌরপ্রতিষ্ঠানের নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে গিয়ে পরাজিত হয়ে আর্থিক অবস্থা আরও শোচনীয় করে তোলেন। তখন ব্যারিষ্টারেরা আড়ম্বর দেখাতে ভালবাসতেন। অনেকে মনে করতেন, ট্রামে যাতায়াত বা পায়ে হেঁটে কোর্টে আসা রীতিমত অপমানজনক। চিত্তরঞ্জন হাইকোর্টে যেতেন ট্রামে। আর ফিরতেন হেঁটে ময়দানের মধ্যে দিয়ে।

চিত্তরঞ্জনের পিতার ব্যক্তিগত ঋণের বোঝা যথেষ্ট ভারী ছিল। তার ওপরে নিজস্ব মহানুভবতা ও ভাবাবেগের জন্য অন্যের অনেক দায় নিজের ঘাড়ে নিয়েছিলেন। নিজের মুহুরির অনুরোধে জনৈক ব্যক্তির জামীন হয়েছিলেন। লোকটি পলাতক হলে ভুবনমোহন ত্রিশ হাজার টাকা দিতে বাধ্য হন। চিত্তরঞ্জন আইন ব্যবসা শুরু করলে এ দুটি ঋণের বণ্ড পিতা পুত্র উভয়ের নামে পুনরায় বহাল করা হয়। কয়েকজন উত্তমর্ণ ঋণের টাকা আদায় করার জন্য আদালতের সাহায্য নেন। ১৮৯৬ সালের ১৬ই জুন ভুবনমোহনও চিত্তরঞ্জনকে দেউলিয়া ঘোষণা করে তাঁদের সমস্ত সম্পত্তির ভার সরকারী স্বত্বনিয়োগীর হাতে দেওয়া হয়।

চার বছর ধরে কিংবা তারও বেশী সময় কোনও রকমে টিকে থাকার জন্য চিত্তরঞ্জনকে প্রচণ্ড সংগ্রাম করতে হয়েছিল। তাঁর পিতা সম্পূর্ণ অবসর গ্রহণ করেছেন। এক বিরাট পরিবারের সমস্ত দায়িত্ব চিত্তরঞ্জনকে বহন করতে হচ্ছিল, যদিও তিনি দেউলিয়া। তবে এসব চিত্তরঞ্জনকে দমাতে পারেনি, বরং স্ববৃত্তিতে সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্য তীব্রতর সংগ্রামের জন্য প্ররোচিত করেছে।

অবশ্য পারিবারিক ঐতিহ্য এবং দাস পরিবারের সঙ্গে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের যোগাযোগ থাকার ফলে চিত্তরঞ্জনের বিশেষ সুবিধা হয়েছিল। তাঁর পিতামহ কাশীশ্বর সরকারী উকিল ছিলেন। তাঁর পিতৃব্যেরাও সুপরিচিত আইনজীবী ছিলেন। তাঁদের পরিবার থেকে তিন জন হাইকোর্টের বিচারপতি হয়েছিলেন। আবার তাঁদের মধ্যে একজন, সুধীরঞ্জন দাস কিছুদিন আগে পর্য্যন্ত ভারতের প্রধান বিচারপতির পদে আসীন ছিলেন। চিত্তরঞ্জনের ছোট ভাই পি. আর. দাস অন্যতম শ্রেষ্ঠ আইনজীবী।

কলকাতা হাইকোর্টে দেওয়ানী মামলায় মৌলিক বিষয়ে পসার জমাতে অনেক সেরা উকিল এগিয়ে এসেছেন। কিন্তু ঠিক এই বিষয়ে পসার জমাতে সাধারণত যথেষ্ট সময় লাগে। চিত্তরঞ্জনের যা অবস্থা তাতে সময় সাপেক্ষ দেওয়ানী মামলায় আত্মনিয়োগ করা সম্ভব ছিল না। তাঁকে নিতে হত ফৌজদারী মামলা, যার ফলে তাঁকে প্রায়ই মফঃস্বলের বিভিন্ন আদালতে যেতে হত। আর্থিক অনটনের জন্য তিনি প্রায়ই এমন ফী নিতেন যা তাঁর মানের ব্যারিষ্টারের পক্ষে অতি তুচ্ছ ছিল। চিত্তরঞ্জনের অন্তরঙ্গ বন্ধু নাটোরের মহারাজা একটি ঘটনার উল্লেখ করেছেন যাতে চিত্তরঞ্জনের সেই সময়ের দুর্দশার ছবি পাওয়া যায়। একদিন তিনি চিত্তরঞ্জনের বাড়ীতে গিয়ে দেখেন যে তিনি বিষণ্ণমুখে একলা চুপ করে বসে আছেন। কয়েকদিন পরে আবার দেখা হল। তখন চিত্তরঞ্জনের মুখ বেশ উৎফুল্ল। কারণ তিনি একটা মামলা হাতে পেয়েছেন। ফী পাবেন

তিনশ টাকা। টাকার ঐ সামান্য পরিমাণ দেখে মহারাজা অবাক হলেন। কিন্তু চিত্তরঞ্জন কৃতজ্ঞতার সঙ্গে মামলাটি হাতে নিলেন। কারণ তখন দৈনন্দিন অত্যাবশ্যক দ্রব্যগুলি কেনার মত টাকা ছিল না তাঁর।

অচিরে চিত্তরঞ্জনের খ্যাতি বৃদ্ধি হতে লাগল। সাক্ষীকে জেরা করে নাজেহাল করা এবং প্রদত্ত সাক্ষ্য ও প্রমাণ নিজের মক্কেলের অনুকূলে কাজে লাগান—এই ছিল চিত্তরঞ্জনের বৈশিষ্ট্য। আলিপুর ফৌজদারী আদালতের অন্যতম সফল উকিল ও চিত্তরঞ্জনের বন্ধু শরৎ চন্দ্র সেন চিত্তরঞ্জনকে বিশেষ সাহায্য করেন। খ্যাতি বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে চিত্তরঞ্জন শুধু কলকাতায় পসার জমানর জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করলেন। তার ফলে দেওয়ানী মামলার মৌলিক দিকেও তিনি নজর দিতে পারলেন এবং ধীরে ধীরে দেওয়ানী মামলাতেও বিশিষ্ট ব্যারিষ্টার হয়ে দাঁড়ালেন।

১৯০৭ সাল চিত্তরঞ্জনের আইন ব্যবসায়ী জীবনে মোড় ঘুরিয়ে দিল। দেওয়ানী ও ফৌজদারী মামলায় সফল উকিল হিসেবে তিনি তখন প্রতিষ্ঠিত। এবার দেখা গেল দেশপ্রেমিক ও দেশকর্মীদের রক্ষকরূপে চিত্তরঞ্জনকে। ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় রাজদ্রোহের দায়ে কলকাতা চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে অভিযুক্ত হন। চিত্তরঞ্জন ব্রহ্মবান্ধব এবং বিপিনচন্দ্র পালের পক্ষ সমর্থন করেন।

বিখ্যাত আলিপুর বোমা ষড়যন্ত্র মামলা বৃহত্তর আলোড়ন সৃষ্টি করে। এই মামলায় অন্যতম আসামী ছিলেন শ্রীঅরবিন্দ বসু—পরবর্তী জাবনে পণ্ডিচেরীর বিখ্যাত দ্রষ্টা ও দার্শনিক। এই মামলা সম্বন্ধে আরও বিশদ আলোচনা প্রয়োজন কারণ এটি ভারতের জাতীয় সংগ্রামের একটি বিশিষ্ট অধ্যায়।

রাজনৈতিক অপরাধে অভিযুক্তদের নির্মম শাস্তি দেওয়ার জন্য কলকাতার চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট কিংসফোর্ড সবার অপ্রিয় হয়ে পড়েছিলেন। জাতীয়তাবাদী পত্রিকাগুলির সম্পাদক ও মুদ্রাকরদের তিনি কঠোর শাস্তি দিয়েছিলেন। কোন এক মামলায় তিনি পনের বছরের একটি ছেলেকে বেত্রাঘাতের হুকুম দেন। এতে এমন কি ব্রিটিশ সমাজও ক্ষুব্ধ হয়। তদানীন্তন ভারত সচিব লর্ড মরলে কিংসফোর্ডের কয়েকটি রায় দেখে স্তম্ভিত হন। তিনি বড়লাট লর্ড মিণ্টোকে এক পত্রে লেখেন—

"বর্তমানে রাজদ্রোহ প্রভৃতির জন্য যে মারাত্মক শাস্তি দেওয়া হচ্ছে তা আমি বিশেষ উদ্বেগ ও ভয়ের সঙ্গে লক্ষ্য করছি, একথা তোমার কাছে স্বীকার করছি। আমরা অবশ্যই শৃঙ্খলা বজায় রাখব কিন্তু কঠোরতর বাড়াবাড়ি শৃঙ্খলার পথ নয়। বরং তা বোমার পথে নিয়ে যায়।"

বাংলাদেশে বিপ্লব আন্দোলনের নেতারা স্থির করলেন যে কিংসফোর্ডকে তাঁর কাজের জন্য প্রাণ দিতে হবে। তাতে অন্যান্য অফিসারদেরও সাবধান করে দেওয়া যাবে। কিংসফোর্ডকে ডাকযোগে বোমা পাঠান হল। তিনি পার্শেল খোলেন নি। ভাগ্যের জোরে সে যাত্রা বেঁচে গিয়েছিলেন। কলকাতা থেকে মজঃফরপুরে জেলা জজরূপে বদলী হয়ে যাওয়ার পর কিংসফোর্ডকে হত্যা করার জন্য দ্বিতীয়বার চেষ্টা করা হয়। ক্ষুদিরাম বসু ও প্রফুল্ল চাকী এই দুই যুবককে পাঠান হল কিংসফোর্ডকে শেষ করার জন্য। কিন্তু তাঁদের নিক্ষিপ্ত বোমায় প্রাণ হারালেন দুজন নিরপরাধ মহিলা মিসেস কেনেডী ও তাঁর কন্যা। তাঁদের মৃত্যু সকলকেই ক্ষুব্ধ করে। ক্ষুদিরাম ওয়ানি রেল ষ্টেশনে ধরা পড়লেন ১লা মে ১৯০৮ সালে। আর প্রফুল্ল চাকী মোকামা রেল ষ্টেশনে। তিনি নিজের রিভলভারের গুলিতে প্রাণত্যাগ করেন। বিচারে ক্ষুদিরামের ফাঁসী হয়।

এই হত্যার পেছনের ষড়যন্ত্র ফাঁস করার জন্য সরকার তৎপর হলেন। মুরারিপুকুর রোডে ৩২ নং বাড়ী খানাতল্লাসী করা হল। বিপ্লবী দল যুগান্তর পার্টির ছাব্বিশ জন সদস্য ধৃত হলেন। পরে ৪৮নং গ্রে ষ্ট্রীট থেকে শ্রী অরবিন্দ বসুকে জেলখানায় নিয়ে যাওয়া হয়। ১৯শে আগষ্ট ১৯০৮ প্রাথমিক তদন্তের পর আসামীদের বিরুদ্ধে রাজদ্রোহ ও ষড়যন্ত্রের অভিযোগ আনা হয়। আরও অভিযোগ করা হয় যে, ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গের পর আসামীরা বাংলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'যুগান্তরে'র মাধ্যমে রাজদ্রোহ প্রচার এবং ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধের যড়যন্ত্র করেছিলেন। শুধু তাই নয়, হিংসার মাধ্যমে কর্তৃপক্ষকে সন্ত্রস্ত করার চেষ্টা এবং অস্ত্রশস্ত্র যোগাড় ও বোমা তৈরির ব্যাপক আয়োজন তাঁরা করেছিলেন। অন্যান্য অভিযোগের মধ্যে ছিল ছোটলাট স্যার অ্যাণ্ডরু ফ্রেজারের ট্রেন ধ্বংসের প্রয়াস, চন্দননগরের মেয়রের বাড়ীতে বোমা নিক্ষেপ, ঢাকার ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ আলেনকে গুলি করা এবং মিঃ কিংসফোর্ডকে হত্যার উদ্দেশ্যে ক্ষুদিরাম বসু ও প্রফুল্ল চাকীকে মজঃফরপুরে প্রেরণ।

অন্যতম আসামী নরেন্দ্রনাথ গোস্বামী রাজসাক্ষী হয়ে গেলেন। তিনি কতগুলি গোপন তথ্য প্রকাশ করার ফলে আরও আটজন বিপ্লবী ধরা পড়েন। তবে এই বিশ্বাসঘাতকতার পুরস্কার ভোগ করতে নরেন্দ্রনাথ পারেন নি। দুজন আসামী কানাইলাল দত্ত ও সত্যেন্দ্র নাথ বসু নরেন্দ্রনাথকে প্রেসিডেন্সী জেলের হাসপাতালের মধ্যে গুলি করে মারেন। বিচারে হত্যার অপরাধে তাঁদের ফাঁসী হয়। এ সমস্ত প্রমাণ বাকী আসামীদের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করে তাঁদের দায়রা সোপর্দ করা হয়।

১৯শে অক্টোবর ১৯০৮ আলিপুরের অতিরিক্ত সেসন জজ বীচক্রফ্‌টের আদালতে আসল মামলা শুরু হল। সরকারী পক্ষে মামলা পরিচালনা করেন বিখ্যাত আইনজীবী ইয়ার্ডলে নর্টন।

প্রথমে শ্রী অরবিন্দের পক্ষ সমর্থন করেন বি. চক্রবর্তী ও কে. এন. চৌধুরী। শ্রী অরবিন্দ স্বেচ্ছায় দারিদ্র্য বরণ করেছিলেন। তাঁকে রক্ষার জন্য জনগণের কাছ থেকে চাঁদা সংগ্রহ করা হয়। কিন্তু সে টাকা খুব তাড়াতাড়ি ফুরিয়ে যায়। দেখা গেল চিত্তরঞ্জন ছাড়া অরবিন্দের পক্ষ সমর্থন করার আর কেউ নেই। ছাড়া পাওয়ার পর শ্রীঅরবিন্দ চিত্তরঞ্জনের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে গিয়ে বলেন—

"আমার এই বন্ধুটি এসেছিলেন অপ্রত্যাশিতভাবে। আপনারা সেই ব্যক্তির নাম শুনেছেন যিনি অন্য সমস্ত চিন্তা ত্যাগ করে, নিজের আইন ব্যবসা ছেড়ে মাসের পর মাস রাত জেগে স্বাস্থ্য নষ্ট করেছেন আমায় বাঁচাবার জন্য। তাঁর নাম শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাস। তাঁকে দেখামাত্র আমি তৃপ্ত হয়েছিলাম।"

মক্কেলকে বাঁচাবার জন্য চিত্তরঞ্জন কঠোর পরিশ্রম করেন। তাঁর সমস্ত চিন্তা ও শক্তি নিয়োগ করেছিলেন এই মামলায়। নিজের নথি জোরদার করার জন্য সমস্ত মামলার প্রাপ্ত বিবরণ বিশেষ অভিনিবেশ সহকারে পাঠ করেন। দশমাস ধরে চিত্তরঞ্জন শুধু অরবিন্দের মামলা নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন। শুধু যে বিনা পারিশ্রমিকে এই মামলা চালিয়েছেন তা নয়, এজন্য তাঁকে গাড়ী ঘোড়া বিক্রি করতে হয়েছে। ব্যক্তিগত বণ্ড দিয়ে টাকা ধার করতে হয়েছে। আয়ের কোন পথ নেই অথচ ব্যয়ের মাত্রা আগের মতই ছিল। মামলা শেষ হলে দেখা গেল চিত্তরঞ্জনের দেনার পরিমাণ দাঁড়িয়েছে পঞ্চাশ হাজার টাকা।

অরবিন্দকে বাঁচাবার জন্য চিত্তরঞ্জন প্রাণপণ চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু মক্কেলের জন্য অত উদ্বেগ থাকা সত্ত্বেও তিনি ব্যক্তিগত মর্য্যাদা কখনও ক্ষুণ্ণ হতে দেননি। একদিন চিত্তরঞ্জন কোন একটি সাক্ষ্য গ্রহণের যথার্থতা সম্বন্ধে নিজ বক্তব্য পেশ করেছিলেন। বিচারপতি

তা অর্থহীন (ননসেন্স) বলে বাতিল করে দেন। চিত্তরঞ্জন তৎক্ষণাৎ গর্জে উঠলেন, 'দুঃখের বিষয় আপনি বিচারপতির আসনে আর আমি ওকালতি করছি। আপনি অন্য কোথাও যদি একথা বলতেন তাহলে সমুচিত জবাব দিতাম।'

বিচারপতি বুঝতে পারেন যে তিনি ভুল করেছেন। তিনি ক্ষমা চাওয়ায় ব্যাপারটির ওখানেই নিষ্পত্তি হয়।

এই ষড়যন্ত্রে আরও অনেকে অভিযুক্ত থাকলেও সরকারের প্রকৃত লক্ষ্য ছিলেন অরবিন্দ। বীচ্‌ক্রফট্‌ নিজেই তাঁর রায়ে সেকথা উল্লেখ করেছেন—

"অভিযুক্তদের মধ্যে অরবিন্দের শাস্তিদানের জন্যই সরকার অত্যন্ত বেশী আগ্রহশীল ছিলেন। কাঠগড়ায় তিনি না দাঁড়ালে এ মামলা অনেক আগে শেষ হয়ে যেত।"

মামলাটি একশ ছাব্বিশ দিন ধরে চলেছিল। দু শতাধিক সাক্ষীর বিবৃতি গ্রহণ করা হয়েছিল। চার হাজার কাগজপত্র ও পাঁচশ বোমা ও বিস্ফোরক দ্রব্য ইত্যাদি দ্রষ্টব্য হিসেবে পেশ করা হয়েছিল। চিত্তরঞ্জনের সমাপ্তি ভাষণ দিতে নদিন লেগেছিল। ভাষণের উপসংহারে তিনি যে ব্যঞ্জনাময় ভাষা প্রয়োগ করেছিলেন তাতে তা ক্লাসিক ধর্মী আইন বক্তৃতার পর্য্যায়ে উন্নীত হয়।

১৯০৫ সালে স্ত্রীকে লিখিত অরবিন্দের চিঠি সরকার পক্ষ প্রমাণ হিসাবে পেশ করেন। সেই চিঠিতে অরবিন্দ লিখেছিলেন— "বর্তমানে আমার নিজস্ব কাজ বলতে কিছু নেই। আমি তাঁর কাজ নিয়ে সদা ব্যস্ত। আমার আমূল মানসিক পরিবর্তন ঘটেছে। তিনি আমাকে যা আদেশ করেন আমি তাই করি। আমার নিজস্ব কোন ইচ্ছা নেই। ভগবান তোমার প্রতিও সদয় হবেন এবং সত্য পথ

তোমাকে দেখিয়ে দেবেন। তুমি আমার সহধর্মিণী। আমার ব্রত সাধনে তুমি কি সাহায্য করবে না?

দেশের মুক্তির জন্য ব্রহ্মতেজ প্রয়োজন।"

ষড়যন্ত্রের প্রমাণ বলে এই চিঠির ব্যাখ্যা করলেন সরকারপক্ষ। তাঁদের মতে অরবিন্দ তাঁর স্ত্রীকে এই ষড়যন্ত্রে যোগ দিতে বলেছিলেন। অন্যপক্ষে চিত্তরঞ্জন ঘোষণা করলেন, চিঠিটা গভীর আধ্যাত্মিক বিকাশের অভিব্যক্তি। তাঁর মতে চিঠির ভাষা সম্পূর্ণ আত্মবিলোপ ও ভগবৎ চরণে আত্মসমর্পণের ভাষা। তিনি বলেন হিন্দুধর্মের প্রধান নীতি হল নিজেকে ভগবানের হাতের যন্ত্র মনে করা। ভগবৎ ইচ্ছাই মানুষের মধ্য দিয়ে কাজ করে। চিঠিতে ধর্মের সুর যে বড় হয়ে বেজেছে তা 'সহধর্মিণী' শব্দটি প্রয়োগের মধ্যেও দেখা যায়। সহধর্মিণী বলতে তাঁকে বোঝায় যিনি ধর্মীয় আদর্শ লাভে সহায়তা করেন। অনুরূপভাবে 'ব্রহ্মতেজ' বা ভগবৎ তেজ শব্দটির প্রয়োগ প্রমাণ করে যে ভগবানের শক্তির কাছে মানুষের ক্ষমতা তুচ্ছ।

সরকার পক্ষ অরবিন্দের বিরুদ্ধে আর একটি প্রমাণ দাখিল করেছিলেন যে, বিপিনচন্দ্র পাল জেল থেকে ছাড়া পেলে তাঁকে সম্মান জানাবার জন্য ২৮শে মার্চ অনুষ্ঠিত জনসভায় অরবিন্দ যোগদান করেছিলেন। চিত্তরঞ্জন বললেন, বিপিনচন্দ্র পাল, অরবিন্দের জন্য কারাদণ্ড ভোগ করেছিলেন। কর্তব্যবোধে অরবিন্দ সেই সভায় যোগ দেবেন, এ ত খুবই স্বাভাবিক। সভায় তাঁর উপস্থিতি ষড়যন্ত্রমূলক কাজ বলে কোনমতেই অভিহিত করা যায় না।

সরকারপক্ষের অন্য সমস্ত যুক্তি চিত্তরঞ্জন এভাবে খণ্ডন করে দেন। আইনে তাঁর প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তির পরিচয় পাওয়া যায় যখন

তিনি স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন যে, অরবিন্দের অপরাধ প্রমাণের জন্য অন্যান্য অভিযুক্তদের প্রদত্ত জবানি কোনমতেই কাজে লাগান যেতে পারে না। রাজসাক্ষীর জবানি ছেঁটে ফেলা হয়। মামলার বিষয়টি চিত্তরঞ্জন এমন দক্ষতার সঙ্গে বিশ্লেষণ করেন যে, বিচারপতির পরামর্শদাতা ছ'জন অরবিন্দের নিরপরাধ সম্বন্ধে সন্দিহান হন। যে কথা দিয়ে চিত্তরঞ্জন তাঁর ভাষণ শেষ করেছিলেন তা স্বাধীনতা ও মানবমর্য্যাদা প্রিয় মানুষকে চিরদিন অভিভূত করবে।

চিত্তরঞ্জন প্রথমে অরবিন্দের মনোভাব এভাবে ব্যাখ্যা করেন, "যদি বলেন আমি আমার দেশের স্বাধীনতার আদর্শ প্রচার করেছিলাম এবং তা আইন বিরুদ্ধ কাজ, তাহলে আমি আমার অপরাধ স্বীকার করছি। যদি তাই এখানের আইন হয়ে থাকে, আমি বলছি যে আমি অপরাধ করেছি। আমার অনুরোধ আমাকে শাস্তি দিন কিন্তু আমি যে অপরাধে অপরাধী নই, যে কাজের বিরুদ্ধে আমার সমস্ত অন্তরাত্মা বিদ্রোহ করে এবং যা আমার মনের দিক থেকে বিচার করলে কোনকালে করা সম্ভব নয় আমার পক্ষে, এমন সব অপরাধ, এমন সব কাজের জন্য আমাকে দায়ী করবেন না। স্বাধীনতার আদর্শ প্রচার যদি অপরাধ হয়, আমি স্বীকার করছি আমি তা করেছি। আমি কখনও তা নিয়ে তর্ক করিনি। এজন্যই আমি জীবনের সমস্ত উজ্জ্বল সম্ভাবনা ত্যাগ করেছি। এজন্যই আমি কলকাতায় এসেছি। এই আদর্শের জন্যই—আমার জীবন, আমার সাধনা। এ আমার জাগরণের চিন্তা, নিদ্রার স্বপ্ন। এ যদি আমার অপরাধ হয় তাহলে এ প্রসঙ্গে নানা ধরণের বিবৃতি দেওয়ার জন্য সাক্ষীর পর সাক্ষী পেশ করার কোন দরকার নেই। এইখানে দাঁড়িয়ে আমি সেই অপরাধ স্বীকার করছি। তাই যদি আমার অপরাধ হয় তাহলে আপনি আমাকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করতে পারেন, কারাদণ্ড দিতে পারেন এবং এ অভিযোগের অস্বীকৃতি কোনমতেই আমার কাছ থেকে পাবেন না। তবে একথা নিবেদন করতে

আমি সাহসী হয়েছি যে, স্বাধীনতার আদর্শ প্রচার আইনের চোখে অপরাধ নয়। যে সব অপরাধে আমাকে অভিযুক্ত করা হয়েছে সে সম্বন্ধে আমি বলতে চাই, সেগুলির কোন প্রমাণ নেই এবং যা কিছু আমি ভেবেছি, যা কিছু লিখেছি এবং সাক্ষ্য প্রমাণে আবিষ্কৃত আমার মানসিক ধারার সঙ্গে সে সব অপরাধ আদৌ খাপ খায় না।"

তারপর চিত্তরঞ্জন বিচারপতিকে মর্মস্পর্শী ভাষায় আবেদন জানান, "আপনার কাছে আমার আবেদন এই যে, অপরাধের আরোপিত অভিযোগে অভিযুক্ত এই লোকটি শুধু এই আদালতের সামনে দাঁড়িয়ে নেই, তিনি দাঁড়িয়েছেন ইতিহাসের উচ্চ আদালতের সামনে। আপনার কাছে আমার এই আবেদন, আজকের এই বাক বিতণ্ডা চির নীরবতার মাঝে স্তব্ধ হয়ে যাওয়ার বহু পরে, বর্তমান গোলযোগ, আন্দোলন থেমে যাওয়ার বহু পরে, তাঁর মৃত্যুরও বহু পরে লোকে তাঁকে মনে করবে দেশপ্রেমের কবি বলে। জাতীয়তাবাদ দ্রষ্টা ও মানবপ্রেমিক বলে। তাঁর মৃত্যুর অনেক, অনেক পরে তাঁর কথা শুধু ভারতেই নয়, সমুদ্র পারে দূর দূরান্তে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরবে। সেজন্যই আমি বলছি, এই মানুষটি শুধু এই আদালতের সামনে এসে দাঁড়ান নি, তিনি দাঁড়িয়ে আছেন ইতিহাসের উচ্চ আদালতে।

মহাশয়, আপনার রায় এবং (বিচারপতির পরামর্শদাতাদের প্রতি) ভদ্রমহোদয়গণ, আপনাদের রায় সম্বন্ধে বিবেচনা করার সময় এসেছে। মহাশয়, ইংরেজী আদালতের ঐতিহ্যের—যা ইংরেজের ইতিহাসে এক গৌরবময় অধ্যায়ের সংযোজন করেছে—নামে আমি আপনার কাছে আবেদন করছি, আমি আবেদন করছি ইংরেজী বিচার ব্যবস্থার যা কিছু মহান, সেই ব্যবস্থায় উদ্ভূত হাজার হাজার আইন নীতির নামে, আমি আবেদন করছি সেই সব বিশিষ্ট

বিচারপতির নামে যাঁরা আইন এমনভাবে প্রয়োগ করেছিলেন যাতে শুধু বাধ্যতা নয়, আইনের প্রতি শ্রদ্ধা অর্জন করা যায়। আমি আপনার কাছে আবেদন করছি ইংরেজের ইতিহাসের গৌরবময় অধ্যায়ের নামে—একথা কেউ যেন না বলেন জনৈক ইংরেজ বিচারপতি ন্যায় বিচার করতে বিস্মৃত হয়েছেন।

"আর, ভদ্রমহোদয়গণ, আমি আপনাদের কাছে আবেদন করছি অরবিন্দ যে আদর্শ প্রচার করেছেন সেই আদর্শ এবং আমাদের দেশের ঐতিহ্যের নামে। একথা কেউ যেন না বলেন, যে তাঁরই দেশের দুজন অধিবাসী ভাবাবেগ ও পক্ষপাতিত্বের বশবর্তী হয়ে সময়ের হট্টগোলে নিজেদের হারিয়ে ফেলেছিলেন।"

বিচারপতির পরামর্শদাতাদ্বয় ১৯০৯ সালের ৬ই মে অরবিন্দের অনুকূলে মত দেন। তাঁদের অভিমত গ্রহণ করে বীচ্‌ক্রফট্‌ অরবিন্দকে মুক্তি দেন। তবে তিনি অরবিন্দের ভাই বারীন্দ্রকুমার ও অন্যতম আসামী উল্লাসকর দত্তকে প্রাণদণ্ড দেন। এই রায়ের বিরুদ্ধে প্রধান বিচারপতি স্যার লরেন্স জেঙ্কিন্স ও বিচারপতি কার্ণডাফের কাছে আপীল করা হয়। চিত্তরঞ্জন আবার এই মামলার ভার নেন। অপূর্ব দক্ষতা ও প্ররোচনার সঙ্গে তিনি আটচল্লিশ দিন ধরে মক্কেলদের পক্ষ সমর্থন করেন।

চিত্তরঞ্জন এই মামলা পরিচালনার জন্য যে যুক্তির অবতারণা করেছিলেন তা এখানে সংক্ষেপে দেওয়া হচ্ছে। এ থেকে আইন ও বিস্ফোরক দ্রব্য সম্বন্ধে তাঁর প্রগাঢ় জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যাবে। ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২১, ১২১ক, ১২২ ও ১২৩ ধারা অনুযায়ী বারীন্দ্রকুমার ও উল্লাসকরকে অভিযুক্ত করা হয়। এই সকল ধারা অনুযায়ী কারুর বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করতে হলে ফৌজদারী বিধির ১৯৬ ধারা অনুযায়ী সরকারের অনুমোদন অবশ্যই

আগে নিতে হবে। সরকারী অনুমোদনের ভিত্তিতেই এই সমস্ত ধারা অনুযায়ী অভিযোগ দায়ের করা যায়। চিত্তরঞ্জন দেখিয়ে দেন যে, ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২১ক, ১২২ ও ১২৩ ধারাবর্ণিত অপরাধের জন্য অভিযোগ দায়ের করার উদ্দেশ্যে সরকারের অনুমোদন নেওয়া হলেও ১২১ ধারার জন্য কোন অনুমোদন নেওয়া হয় নি। অতএব এই ধারা অনুযায়ী অভিযুক্ত করার কোন অনুমোদন ছিল না, সেক্ষেত্রে বৈধ অভিযোগ থাকতে পারে না। ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২১ ধারা অনুযায়ী চরম দণ্ড হল মৃত্যু। যেহেতু এই ধারা অনুযায়ী অভিযোগ পেশ করার বৈধ অনুমোদন নেই বারীন্দ্রকুমার ও উল্লাসকরকে এই ধারার অন্তর্গত অপরাধের অভিযোগ থেকে অবশ্যই অব্যাহতি দিতে হবে।

বিচারপতিদ্বয় চিত্তরঞ্জনের যুক্তির অকাট্যতা উপলব্ধি করে ১২১ ধারার অভিযোগ থেকে বারীন্দ্রকুমার ও উল্লাসকরকে অব্যাহতি দেন। তাঁরা ফাঁসীর হাত থেকে বেঁচে যান। ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২১ ক ধারা অনুযায়ী দোষী প্রতিপন্ন হওয়ায় দণ্ডের মাত্রা হ্রাস করা হয়। ফাঁসীর বদলে তাঁদের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর হয়।

চিত্তরঞ্জন যেভাবে মামলাটি পরিচালনা করেন এবং যে দক্ষতার সঙ্গে জটিল ও প্রচুর সাক্ষ্যপ্রমাণ ঘাঁটাঘাঁটি করেন তাতে প্রধান বিচারপতি বিশেষ অভিভূত হন। তিনি তাঁর রায়ে চিত্তরঞ্জনের প্রশংসা এভাবে লিপিবদ্ধ করেন, "তাঁদের প্রধান অ্যাডভোকেট শ্রী চিত্তরঞ্জন দাস যেভাবে এই মামলা আদালতে পেশ করেন তার ভূয়সী প্রশংসা আমি বিশেষভাবে লিপিবদ্ধ করতে চাই।" এই মামলা চিত্তরঞ্জনকে কলকাতা আইনজীবী মহলের পুরোভাগে প্রতিষ্ঠিত করে। দেশপ্রেমিক ও বিশিষ্ট আইনজীবী হিসেবে তাঁর খ্যাতি সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ে। প্রকৃতপক্ষে বহু লোক তাঁকে সারা ভারতের শ্রেষ্ঠ অ্যাডভোকেট বলে মনে করতেন।

আলিপুর বোমা মামলায় চিত্তরঞ্জনের খ্যাতি যদি ফৌজদারী মামলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ আইনজীবীরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকে তাহলে বিখ্যাত ডুমরাঁও মামলা প্রমাণ করে দিল যে তিনি দেওয়ানী আইনের ক্ষেত্রেও সমান সাফল্য অর্জন করেছিলেন। মামলাটি যখন তাঁর হাতে আসে তখন সবাই জয়লাভ সম্বন্ধে হাল ছেড়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু চিত্তরঞ্জন কঠোর পরিশ্রম ও তীক্ষ্ণ মেধার সাহায্যে মক্কেলকে জিতিয়ে দেন।

মামলার বিবরণ সংক্ষেপে এইরূপ—ডুমরাঁওয়ের মহারাজা স্যার রাধাপ্রসাদ সিংহ অপুত্রক অবস্থায় মারা যান। তাঁর প্রথমা কন্যা মান্দারের রাজার সঙ্গে বিবাহের অল্পকাল পরেই নিঃসন্তান অবস্থায় মারা যান। রাধাপ্রসাদের দ্বিতীয়া কন্যার সঙ্গে রেওয়ার রাজার বিয়ে হয়। ১৮৮৯ সালের মার্চ মাসে মহারাজা রেজিষ্ট্রী করে তাঁর স্ত্রীকে এই ক্ষমতা দিয়ে যান যে তাঁর মৃত্যুর পর রাণী ডুমরাঁও, বক্সার বা জগদীশপুরের উজ্জয়িনী পরিবার থেকে কোন ছেলেকে পোষ্য নিতে পারবেন। ১৮৯০ সালে মহারাজা যখন উইল করেন তাতেও এই পোষ্য গ্রহণের অধিকারের কথা উল্লেখ করেন। ১৮৯৪ সালে মহার'জা মারা যান। এবং মহারাণী বেণীপ্রসাদ কেওরী ১৯০৭ সালের ১২ই ডিসেম্বর—তাঁর মৃত্যুর ঠিক একদিন আগেই জগদীশপুরের জয়প্রসাদ সিংহের ছেলে জঙ্গবাহাদুর সিংহকে পোষ্য গ্রহণ করেন। তিনি ডুমরাঁওয়ের গদির উত্তরাধিকারী হন। এবং তাঁর নামকরণ হয় মহারাজকুমার শ্রীনিবাসপ্রসাদ সিংহ। মহারাণীর মৃত্যুর পর সম্পত্তির তত্ত্বাবধানের ভার কোর্ট অব ওয়ার্ডের হাতে আসে।

ডুমরাঁওয়ের মহারাজার নিকট জ্ঞাতি বাবু কেশোপ্রসাদ সিংহ কোন কারণে মহারাণীর বিরাগের পাত্র হয়েছিলেন। মহারাণী চিরকাল তাঁর দ্বিতীয়া কন্যা রেওয়ার রাণীকে তাঁর সম্পত্তি দেবেন বলে মনস্থ করেছিলেন। কিন্তু মহারাজা এই মনোভাব পছন্দ করেন নি।

তাঁর পৈতৃক সম্পত্তি সম্পূর্ণ ভিন্ন গোত্রে চলে যাক এ তিনি চান নি। নিকটতম জ্ঞাতি কেশোপ্রসাদকে পোষ্য গ্রহণের অভিপ্রায় তিনি কেশোপ্রসাদের পিতা বাবু রাজেশ্বরী প্রসাদের কাছে ব্যক্ত করেছিলেন। কিন্তু রাজেশ্বরী প্রসাদ মহারাজের প্রস্তাবে রাজী হন নি। তারপরে কেশোপ্রসাদ মহারাণীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার অনুমতি পর্য্যন্ত পেতেন না। মহারাণী গুরুতর অসুখে শয্যাশায়ী হবার পর ম্যানেজার শিউশরণলাল মুন্তাজীন লছমীপ্রসাদ এবং জামাতা মান্দারের রাজার সাহায্যে জঙ্গবাহাদুরকে পোষ্য গ্রহণ করেন। তাঁর মৃত্যুর পর বাবু কেশোপ্রসাদ মহারাণীর পোষ্য গ্রহণ বেআইনী ও অবৈধ এবং ডুমরাঁওয়ের গদি তাঁর প্রাপ্য বলে ঘোষণা করার জন্য আদালতে আবেদন করেন।

কেশোপ্রসাদ বিখ্যাত আইনজীবীদের সঙ্গে পরামর্শ করেছিলেন কিন্তু তাঁরা সকলেই এ মামলায় জয়লাভ অসম্ভব বলে মনে করেন। তখন তিনি চিত্তরঞ্জনের শরণাপন্ন হন। চিত্তরঞ্জনের বিপক্ষে কলকাতার বিখ্যাত ব্যারিষ্টার মিঃ গার্থ এবং পাটনার হাসান ইমামকে নিয়োগ করা হয়। চিত্তরঞ্জনের পারিশ্রমিক মাসিক দশ হাজার টাকা ধার্য্য হয়েছিল এবং এ মামলায় জয়লাভ করলে বার্ষিক পঞ্চাশ হাজার টাকা খাজনাবিশিষ্ট ভূসম্পত্তি তাঁকে দেওয়ার প্রতিজ্ঞা করা হয়েছিল। শ্রী দাস এ মামলা জিতে তাঁর চুক্তি রক্ষা করেন। কিন্তু তাঁর মক্কেল তাঁর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী কাজ করেন নি।

চিত্তরঞ্জনের যুক্তির ভিত্তি ছিল, প্রচলিত রীতি অনুযায়ী শুধুমাত্র পোষ্য গ্রহণ করে উত্তরাধিকারীর আইনসঙ্গত অধিকার থেকে তাকে বঞ্চিত করা যায় না। মহারাজার মৃত্যুতে কেশোপ্রসাদ মিতাক্ষর আইনানুযায়ী যে অধিকার পেয়েছিলেন তা থেকে তাঁকে বঞ্চিত করা যায় না পরবর্তীকালে পোষ্য গ্রহণের দ্বারা। বিচারপতি শ্রী দাসের যুক্তি সমর্থন করেন এবং পোষ্য গ্রহণ অবৈধ ও কেশোপ্রসাদ সম্পত্তির আইনসঙ্গত উত্তরাধিকারী বলে ঘোষণা করেন।

এই রায়ের বিরুদ্ধে কলকাতা হাইকোর্টে আপীল করা হয়। প্রধান বিচারপতি স্যার লরেন্স জেঙ্কিন্স, বিচারপতি আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ও স্যার জন উডরফ্‌কে নিয়ে গঠিত এক স্পেশাল বেঞ্চের নিকট এই আপীলের শুনানী হয়। হাইকোর্টে নিম্ন আদালতের রায় বহাল রাখা হলেও শ্রীনিবাসকে বার্ষিক পঞ্চাশ-হাজার টাকার খাজনার ভূসম্পত্তি দানের নির্দেশ দেওয়া হয়।

১৯১৪ সালে ডুমরাঁওয়ের দ্বিতীয় মামলা হয়। এবার রেওয়ার রাণী নতুন মহারাজার বিরুদ্ধে মামলা করেন। মহারাজা কেশো প্রসাদ এই মামলায় চিত্তরঞ্জনকে নিয়োগ না করলেও শেষ পর্য্যন্ত রেওয়ার রাণীর সঙ্গে মিটমাটের জন্য তাঁর শরণাপন্ন হন। বার্ষিক আটচল্লিশ হাজার টাকার খাজনার ভূসম্পত্তির বিনিময়ে রেওয়ার রাণী তাঁর দাবী প্রত্যাহার করেন।

১৯১৭ সাল থেকে ১৯২০ সালের মধ্যে ডুমরাঁওয়ের তৃতীয় মামলা হয়। এবারেও চিত্তরঞ্জন মহারাজাকে বাঁচান। মহারাজার দেওয়ান বর্মায় কিছু সম্পত্তি কিনেছিলেন পরে তিনি দাবী করেন যে তাঁকে তার দান হিসেবে দেওয়া হয়েছে। শ্রী দাস একটি বিশেষ পার্শী শব্দ—যা দুভাবে যথা, 'আনজানি' বা 'এয়ামত' পড়া যায়—নিয়ে জেরা সুরু করেন। তিনি বলেন, শুদ্ধ পাঠ হলো 'আনজানি' যার অর্থ মহারাজা দেওয়ানকে টাকা দিয়েছিলেন সম্পত্তিটি সরকারের হয়ে কেনবার জন্য। বিচারপতি শ্রী দাসের যুক্তিতে অভিভূত হন এবং মহারাজা অগ্রিম অর্থ পুরস্কার হিসেবে নয় বরং রাজ্যের স্বার্থে দিয়েছিলেন, এই যুক্তি স্বীকার করে নেন।

এই রায়ের বিরুদ্ধে ১৯২৪ সালে পাটনা হাইকোর্টে আপীল করা হয়। চিত্তরঞ্জনকে মামলা পরিচালনার জন্য অনুরোধ করা হয়েছিল কিন্তু তিনি তখন আইন ব্যবসা পরিত্যাগ করতে মনস্থ করেছিলেন বলে এ ভার তিনি নেন নি।

তবে চিত্তরঞ্জনের ওকালতি প্রতিভার শ্রেষ্ঠ বিকাশ ঘটেছিল রাজনৈতিক মামলাগুলিতে। ১৯১০ সালে ঢাকা ষড়যন্ত্র মামলায় চিত্তরঞ্জন অনুশীলন সমিতির নেতা পুলিন বিহারী দাস ও তাঁর সহকর্মীদের পক্ষ সমর্থন করেন। অনুশীলন সমিতি ১৯০৫ সালে, বঙ্গভঙ্গের পরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এর বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল যে বেআইনী পদ্ধতিতে ব্রিটিশ সরকারকে উৎখাত করার জন্য এই গোপন সমিতিটি চেষ্টা করছে। শ্রী দাস এই মামলা বিচারে আদালতের এক্তিয়ার আছে কিনা শুধু সে প্রশ্নই করেন নি, পুরো মামলার বৈধতা সম্বন্ধেই সন্দেহ প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, অনুশীলন সমিতির উদ্দেশ্য হল সদস্যদের মানসিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক গুণের বিকাশ সাধন। চিত্তরঞ্জনের বিচক্ষণ ওকালতি সত্বেও অভিযুক্তদের মধ্যে তিনজনের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর এবং আরও তেত্রিশ জনের বিভিন্ন মেয়াদের কারাদণ্ড হয়। কলকাতা হাইকোর্টে আপীল করে চিত্তরঞ্জন দণ্ডের মাত্রা যথেষ্ট হ্রাস করতে সক্ষম হন। যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের বদলে ছবছর সশ্রম কারাদণ্ড এবং মাত্র এগারো জনের প্রতি নিম্ন আদালতের দণ্ডাদেশ বহাল থাকে।

অনতিকাল পরে চিত্তরঞ্জন দিল্লী ষড়যন্ত্র মামলার অভিযুক্তদের পক্ষ সমর্থন করেন। এটি আর একটি রাজনৈতিক মামলা যা সারা ভারতবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সরকারকে উৎখাত করার জন্য ষড়যন্ত্র ও প্রকাশ্য কার্য্যকলাপের—যার চূড়ান্ত পরিণতি হল ১৯১২ সালে বড়লাট লর্ড হার্ডিঞ্জের প্রাণনাশের চেষ্টা—অভিযোগ আনা হয় চৌদ্দজনের বিরুদ্ধে। দীর্ঘ তদন্তের পরে দিল্লীর সেসন জজ মিঃ হ্যারিসন আই. সি. এস-এর আদালতে মামলাটি পেশ করা হয়। সরকারী পক্ষে ছিলেন উত্তর প্রদেশের অ্যাডভোকেট-জেনারেল স্যার জন আলষ্টন। তাঁর সঙ্গে মোকাবিলা করার মত যোগ্যতা আসামী পক্ষের স্থানীয় উকিলদের ছিল না। তাঁদের মধ্যে কয়েকজন কলকাতায় গিয়ে শ্রী দাসকে অনুরোধ করেন আসামীপক্ষ সমর্থনের

জন্য। চিত্তরঞ্জন তখন কলকাতায় বিভিন্ন মামলায় বিশেষ ব্যস্ত ছিলেন। তিনি দেখলেন, দুদিনের জন্যও দিল্লীতে এলে তাঁর কমপক্ষে ছ হাজার টাকা লোকসান হবে। কিন্তু সেই সঙ্গে এও উপলব্ধি করেন যে মামলায় যে সব তরুণদের জড়ান হয়েছে তাদের পক্ষ আদালতে যাতে ঠিকমত সমর্থন করা হয় তার ব্যবস্থাও করা উচিত। প্রচণ্ড আর্থিক ক্ষতির সম্ভাবনা সত্বেও শেষ পর্য্যন্ত তিনি মামলা পরিচালনার ভার নিতে মনস্থ করেন।

১৯১৪ সালে মে মাসে চিত্তরঞ্জন এলেন দিল্লীর আদালতে। তিনি দেখিয়ে দিলেন যে সরকারী পক্ষের বিবৃতিতে আইনসঙ্গত বৈধতা ও প্রকৃত প্রমাণের অভাব রয়েছে। বিচারপতি, শ্রী দাসের যুক্তির সারবত্তা স্বীকারে বাধ্য হন। কিন্তু স্যার জন তা চ্যালেঞ্জ করেন। তিনি এক জাযগায় বলেন যে শ্রী দাসের একটি উক্তি অসত্য। শ্রী দাস এমন তীব্র ভাষায় প্রতিবাদ করেন যে বিচারপতি পর্য্যন্ত স্তম্ভিত হয়ে যান এবং তিনি চিত্তরঞ্জনকে স্যার জনের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতে বলেন। কিন্তু শ্রী দাস পরিষ্কার জানিয়ে দেন যে, ক্ষমা প্রার্থনা করার কোন কারণ ঘটে নি এবং তিনি ক্ষমা চাইতে প্রস্তুত নন। শেষ পর্য্যন্ত শ্রী দাস জয়ী হলেন এবং বিচারপতির—যিনি এতক্ষণ আসামীপক্ষের উকিলদের সঙ্গে রূঢ় ব্যবহার করছিলেন—মনোভাবের পরিবর্তন ঘটল। তিনি আসামী ও সরকারী উভয়পক্ষকে সমভাবে দেখতে লাগলেন। দিল্লীর স্থানীয় উকিলগণ এতে খুশী হলেন এবং মামলা পরিচালনায় প্রবল উৎসাহ পেলেন।

আর একটি বিখ্যাত রাজনৈতিক মামলা হল ১৯১৮ সালের আলিপুর ট্রাঙ্ক হত্যা মামলা। এতে চিত্তরঞ্জন পাঁচজন তরুণকে রাজনৈতিক অপরাধের অভিযোগের হাত থেকে বাঁচান। অভিযোগের বিবরণে প্রকাশ, পাঁচজন তরুণ বিপ্লবী গুপ্তচর সন্দেহে নিজেদের এক সদস্যকে

হত্যা করে। তার মৃতদেহ ট্রাঙ্কে ভরে রেল পার্শ্বেল হিসেবে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। দু একদিনের মধ্যে তা পচে ওঠে এবং কেউ পার্শ্বেল নিতে আসে না। কলকাতায় অন্যতম বৃহত্তম সম্পত্তির উত্তরাধিকারী এই মামলায় অভিযুক্ত পঞ্চাননের পক্ষ থেকে চিত্তরঞ্জনকে নিয়োগ করা হয়। প্রকৃতপক্ষে শ্রী দাস পাঁচজনের হয়ে মামলা পরিচালনা করেন এবং আঠাশ দিন মামলা চলার পর পাঁচজনেই ছাড়া পায়। বাংলাদেশের অ্যাডভোকেট জেনারেল চিত্তরঞ্জনের ভূয়সী প্রশংসা করেন।

কিছুটা অস্বাভাবিক মামলা হল কুতুবদিয়া রাজবন্দী মামলা। ভারত রক্ষা আইন বলে সতের জনকে অন্তরীণ করা হয়। তাঁরা নিজেদের স্থান ছেড়ে চট্টগ্রামে যাওয়ার জন্য তাঁদের বিরুদ্ধে মামলা করা হয়। চিত্তরঞ্জন বিনা পারিশ্রমিকে এই অন্তরীণ রাজবন্দীদের পক্ষ সমর্থন করেন। শুধু তাই নয়, তাঁদের সাহায্য করার জন্য অর্থ ব্যয় করেন। তিনি এক পক্ষকাল চট্টগ্রামে ছিলেন। আদালতে তিনি বলেন, রাজবন্দীরা অন্তরিত স্থান থেকে পালান নি, তাঁরা জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে এসেছিলেন খাদ্য, পানীয় জল, বাসস্থান ও ভাতা সম্বন্ধে নিজেদের ন্যায্য অভিযোগ পেশ করার জন্য। অতএব কোন আইন বা বৈধ আদেশ ভঙ্গের অভিযোগ তাঁদের বিরুদ্ধে আনা যায় না। শ্রী দাসের বাকপটুতা সত্বেও বিচারপতি রাজবন্দীদের দোষী সাব্যস্ত করেন। তবে তিনি তাঁদের মাত্র দু'মাস কারাবাসের আদেশ দিয়েছিলেন।

আইনজীবী হিসেবে চিত্তরঞ্জনের সাফল্যের এই সংক্ষিপ্ত বিবরণী ১৯১৮ সালে অমৃতবাজার পত্রিকা অবমাননা মামলার উল্লেখ করে শেষ করা যেতে পারে। কলকাতা হাইকোর্টের একটি বেঞ্চ রায় দেন যে, কলকাতা ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাষ্ট নিজেদের ইচ্ছামত বেসরকারী জমি নিয়ে নিতে পারে না। ঠিক সেই সময় হাইকোর্টের জনৈক বিচারপতি অনুরূপ এক মামলায় রায় দেন যে, এভাবে জমি

সংগ্রহের অধিকার ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাষ্টের আছে। এই দুই পরস্পর বিরোধী অভিমতের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের উদ্দেশ্যে প্রধান বিচারপতি স্যার ল্যান্সলট স্যাণ্ডারসন, বিচারপতি স্যার জন উডরফ্ এবং বিচারপতি চিট্টি'কে নিয়ে একটি স্পেশ্যাল বেঞ্চ গঠন করা হয়। কলকাতার সুপরিচিত দৈনিক পত্রিকা 'অমৃতবাজার পত্রিকা'য় এই স্পেশ্যাল বেঞ্চ গঠন নিয়ে সম্পাদকীয় মন্তব্য এবং বিচারপতি চিট্টির বদলে জমির মালিক কোন ভারতীয় বিচারপতিকে ঐ স্পেশ্যাল বেঞ্চে গ্রহণের সুপারিশ করা হয়। প্রধান বিচারপতি আদালত অবমাননার দায়ে পত্রিকাকে কেন দণ্ডিত করা হবে না তার কারণ দেখাবার জন্য পত্রিকাকে নোটিশ দেন। হাইকোর্টের ফুলবেঞ্চের সামনে মামলা শুরু হয়।

অমৃতবাজার পত্রিকা কলকাতা আইনজীবী মহলের প্রায় সকল জ্যোতিষ্ককে নিয়োগ করেন—জ্যাকসন, নর্টন, চক্রবর্তী ও চিত্তরঞ্জন দাস সবাই পত্রিকার পক্ষে দাঁড়ান। স্বাভাবিক কারণে জ্যাকসনই পত্রিকার পক্ষে বক্তব্য শুরু করেন। কিন্তু গোড়া থেকেই প্রধান বিচারপতির সঙ্গে তাঁর বাদানুবাদ লেগে যায়। তারপর মিঃ নর্টন চেষ্টা করেন। তিনিও বিচারপতিদের হৃদয় গলাতে পারলেন না। শ্রী ব্যোমকেশ চক্রবর্তীও কিছু সুবিধে করতে পারলেন না। মনে হল মামলার ফল আসামী পক্ষের প্রতিকূলে যাবে।

এরপর চিত্তরঞ্জন উঠে দাঁড়ালেন মক্কেলের পক্ষ সমর্থন করার জন্য। তিনি সম্পূর্ণ নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে বিষয়টি পেশ করলেন। তিনি বললেন, আদালতের প্রতি কোনরকম কটাক্ষ করা পত্রিকার উদ্দেশ্য ছিল না। লেখক যা করেছেন তা হল, বিতর্কমূলক বিষয়টির বিভিন্ন দিকের উত্থাপন করে নিজের ধারণামত সেগুলি সমাধানের প্রয়াস। তাঁর কয়েকটি মন্তব্য অবশ্য না করলেই ভাল হত কিন্তু তাঁর প্রকৃত বক্তব্য হল যে বিষয়টি যেন হাইকোর্টের ফুলবেঞ্চের

নিকট পেশ করা হয়। তাতে প্রবন্ধটি লেখা অনুচিত হয়েছে বলে মনে করা যেতে পারে, কিন্তু আদালতের অবমাননা হয় নি। শ্রী দাস দেওয়ানী ও ফৌজদারী বাধ্যবাধকতার মধ্যে পার্থক্য কি তা দেখিয়ে দেন। তাঁর অসামান্য বিশ্লেষণী শক্তি ও পাণ্ডিত্য বিচারপতিদের মুগ্ধ করে এবং তাঁরা পত্রিকার অনুকূলে রায় দেন।

চিত্তরঞ্জনের মৃত্যুতে কলকাতার আইনজীবী ও বিচারকমণ্ডলী তাঁর দক্ষতা, সাহস ও চারিত্রিক দৃঢ়তার ভূয়সী প্রশংসা করেন। তাঁর সম্বন্ধে বলা হয় যে, সমস্ত খুঁটিনাটি তথ্য তন্নতন্ন করে সংগ্রহ করা এবং প্রতিটি বিষয় যাচাই করার জন্য যে অপরিসীম যত্ন তিনি করতেন তাতেই তিনি এই অভূতপূর্ব সাফল্য লাভ করেছিলেন। সাক্ষীদের বিবৃতি, প্রমাণপত্র ও পরিপার্শ্বের ভিত্তিতে গৃহীত প্রমাণাদি তিনি অত্যন্ত যত্ন ও স্বকীয়তার সঙ্গে পরীক্ষা করতেন। তদুপরি, ইস্পাতের মত দৃঢ় ছিল তাঁর সঙ্কল্প, বিচারক বা প্রতিপক্ষের কাছে হার মানেন নি কোনদিন। তাঁর ভাষণে কখনও তোষামোদ বা কর্তৃপক্ষ-ভীতি প্রকাশ পায় নি। প্রকৃত মানুষের মত দাঁড়িয়ে অত্যন্ত আন্তরিকতা ও দৃঢ় বিশ্বাসের সঙ্গে তিনি ভাষণ দিতেন—যার ফলে বিচারপতিগণ প্রথমে তাঁর বিরোধিতা করলেও পরে প্রভাবান্বিত হতেন।

চতুর্থ অধ্যায়

কবি ও সাহিত্যিক

চিত্তরঞ্জনের মত তীব্র অনুভূতিসম্পন্ন ও কল্পনাপ্রবণ ব্যক্তি যে সাহিত্য ও কবিতার প্রতি আকৃষ্ট হবেন, তা খুবই স্বাভাবিক। শিশুকাল থেকেই তিনি বৈষ্ণব কবিদের দ্বারা বিশেষ প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন। তাঁদের আন্তরিকতা ও ঐকান্তিক সরলতা চিত্তরঞ্জনের মনকে গভীরভাবে প্রভাবান্বিত করেছিল। সারা জীবন সেই প্রভাব অম্লান ছিল। শ্রীচৈতন্যের জীবন ও বাণী এই প্রভাব দৃঢ়তর করে। ব্রাহ্ম পরিবারে—যেখানে যুক্তিবাদের ওপর অধিক প্রাধান্য দেওয়া হয়—জন্মানর ফলে বোধহয় চিত্তরঞ্জন বাংলাদেশের বৈষ্ণব ধর্মের ভাব-প্রবাহ আরও তীব্রভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। চিত্তরঞ্জন, বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কর্তৃকও প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের লেখায় মনন প্রবণতা থাকলেও ভক্তি ও অতীন্দ্রিয়তার রেশ আছে।

চিত্তরঞ্জনের প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ হল 'মালঞ্চ'—কবিতা সঙ্কলন। এতে ধর্মমূলক ও প্রকৃতির কবিতা আছে। কয়েকটি কবিতা আছে যাতে সমাজের অধঃপতিতদের প্রতি চিত্তরঞ্জনের গভীর সহানুভূতি প্রকাশ পেয়েছে। তাঁর 'পতিতা' নামক কবিতাটি ব্রাহ্ম সমাজে প্রতিবাদের প্রচণ্ড ঝড় তুলেছিল এবং তা নিয়ে তাঁর বিয়ের সময় কিছু গোলমাল হয়েছিল। শ্রী দাস কিন্তু তাতে বিচলিত হন নি—এ বিরোধিতায় মানুষের দুর্দশার প্রতি তাঁর সহানুভূতি বিন্দুমাত্র হ্রাস পায় নি। কোন সমাজের গোঁড়া বিশ্বাসের কাছে তিনি নতি স্বীকার করেন নি। তিনি বিশ্বাস করতেন মানুষের প্রধান গুণ হল গভীর আস্থা ও ভক্তি।

চিত্তরঞ্জনের অন্যান্য কবিতাগ্রন্থ হল, 'মালা', 'সাগর সঙ্গীত', 'অন্তর্যামী' এবং 'কিশোর কিশোরী'। গ্রন্থগুলি পাঠক সমাজে বিশেষ সমাদৃত হয়। বিখ্যাত প্রাচ্যবিদ মিঃ জন আলেকজাণ্ডার চ্যাপমান এই কাব্যগ্রন্থগুলির উচ্চ প্রশংসা করেন। চ্যাপমান কয়েকটি কবিতার ইংরেজী অনুবাদও করেন। শ্রী অরবিন্দ অবশ্য চিত্তরঞ্জনের বহু কবিতা ইংরেজীতে অনুবাদ করেছিলেন। চিত্তরঞ্জনের একটি কবিতার আলোচনা প্রসঙ্গে চ্যাপমান বলেন, "চিত্তরঞ্জনের কাছে গান গাওয়া ও জীবন ধারণ একই জিনিষ। সঙ্গীতই জীবন, জীবনই সঙ্গীত। সঙ্গীত অবশ্য মানব জীবনের মতই প্রাচীন, মানুষের দেবত্বের প্রমাণ।·· ···মানুষ যদি মানুষের মত জীবন ধারণ করে তাহলে সে নিশ্চয়ই উচিত মত গান গাইবে। সঙ্গীতে অপূর্ণতা, জীবনের অপূর্ণতা।"

'মালা' প্রকাশিত হয় ১৯০৪ সালে। এক গভীর ধর্মানুভূতি এ গ্রন্থে লক্ষিত হয়। যে ধর্ম বিশ্বাস এবং অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয়ের প্রতি যে আস্থা চিত্তরঞ্জনের মনে দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর হচ্ছিল তারই প্রকাশ 'মালা'র কবিতাগুলিতে।

'মালঞ্চ' যদি চিত্তরঞ্জনকে কবি হিসেবে সাহিত্যের দরবারে এনে থাকে, 'সাগর সঙ্গীত' দিয়েছে তাঁকে প্রাথিত যশ। ১৯১০ সালে নভেম্বর মাসে বিলেত থেকে সাগরপথে ফেরার সময় 'সাগর সঙ্গীত' রচিত হয়। শুধু বিষয় বৈচিত্রে নয়, চিন্তা, সৌন্দর্য্য ও ভাষা সৌকুমার্য্যের জন্য কবিতাগুলি উল্লেখযোগ্য। 'সাগর সঙ্গীতে' কবির অনুভূতি ও ছন্দের গতি সমুদ্রের মতই গভীর। ভক্তি ও চিন্তার সার্থক সঙ্গম ঘটেছে এতে।

চিত্তরঞ্জনের ক্রমবর্দ্ধমান ভগবৎ-আকাঙ্খা আরও স্পষ্ট হয়ে দেখা দিয়েছে তাঁর 'অন্তর্যামী' ও 'কিশোর কিশোরী' গ্রন্থে। প্রার্থনা ও ধ্যানের ফলে যে আত্মা নানা বাধা বিপত্তির মধ্যেও শান্ত ও

সমাহিত থাকে তারই প্রকাশ দেখি 'অন্তর্যামী'তে। আর, 'কিশোর কিশোরী' রাধাকৃষ্ণের শাশ্বত প্রেম গাথা।

চিত্তরঞ্জনের গভীর ধর্মবিশ্বাস প্রকাশ পেয়েছে তাঁর কবিতায় কিন্তু সামাজিক ও রাজনৈতিক কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে তাঁর গভীর উদ্বেগ তাঁকে নিয়ে এল বঙ্গভারতীর সেবায়, বিভিন্ন পত্র পত্রিকার মাধ্যমে। ১৯১৪ সালে চিত্তরঞ্জন বিখ্যাত মাসিক পত্রিকা 'নারায়ণ' প্রকাশ করেন। সম্পাদকের প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা ও গান ছাড়াও এই এই পত্রিকায় ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, বিপিনচন্দ্র পাল, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, সুরেশচন্দ্র সমাজপতি প্রভৃতি বহু বিখ্যাত লেখকের রচনা প্রকাশিত হত। তবে দুঃখের বিষয় 'নারায়ণ' পত্রিকাকে 'সবুজপত্রে'র পাল্টা জবাব বলে মনে করা হত। 'সবুজপত্র' সম্পাদনা করতেন শ্রী প্রমথ চৌধুরী—'বীরবল' ছদ্মনামে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রেরণায় পরিচালিত এই পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের তখনকার মনের ভাব প্রকাশ পেত। তখন তাঁর মনে ইবসেনের প্রভাব চলছিল। রবীন্দ্রনাথের 'বোষ্টমী', 'স্ত্রীরপত্র' প্রভৃতি কয়েকটি গল্প বাংলাদেশের অধিকতর গোঁড়া লোকেদের বিক্ষুব্ধ করে তুলেছিল। সাহিত্যে এইসব নতুন ধারণার পাল্টা জবাব দেওয়া 'নারায়ণ' পত্রিকার উদ্দেশ্য ছিল। কোন এক প্রবন্ধে চিত্তরঞ্জন লেখেন, "রবীন্দ্রনাথ পাশ্চাত্য থেকে অনেক কিছু আমদানি করেছেন। তা নিঃসন্দেহে বাংলা সাহিত্যের বৈচিত্র্য ও সম্পদ বৃদ্ধি করেছে কিন্তু বাংলাদেশের নিজস্ব কৃষ্টি ও তার জাতীয় প্রতিভার উন্নয়ন ও সংরক্ষণে কিছু করেনি। আমরা পাশ্চাত্যের চাকচিক্যে বিভ্রান্ত হয়ে তা নিজেদেরকে অনুসরণ করতে দিতে কোনমতেই পারি না।"

রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে এ মন্তব্যের সঙ্গে সকল সমালোচক হয়ত একমত হবেন না কিন্তু একথা কোনমতেই অস্বীকার করা যায় না যে,

চিত্তরঞ্জনের গুরুগম্ভীর ও চিন্তাপূর্ণ রচনা এবং ভারতের নিজস্ব ঐতিহ্যের ভিত্তিতে রচিত গান আধুনিকতার শক্তিগুলিকে—যা বহু তরুণ লেখককে বিভ্রান্ত করেছিল—প্রতিরোধ করতে সাহায্য করে। চিত্তরঞ্জন নিজেও যে এই শক্তিগুলির চাপ অনুভব করেছিলেন তার প্রমাণ পাওয়া যায় তাঁর 'পতিতা'র মত কবিতা বা 'ডালিম' ও 'প্রাণপ্রতিষ্ঠা'র মত ছোট গল্পগুলিতে। এতে তিনি দেখিয়েছেন সমাজের বিরুদ্ধে পাপাচারিণী নারী প্রেম ও ভক্তি দিয়ে মুক্তি পেতে পারে।

তবে একথা মনে করা অন্যায় হবে যে, চিত্তরঞ্জন সব সময় অনুভূতি ও ভক্তির উচ্চ শীর্ষে অবস্থান করতেন। তাঁর গীতি কবিতা অতি উচ্চ স্তরে উন্নীত হয়েছিল কিন্তু তাঁর গল্প ও চিন্তাশীল প্রবন্ধে তাঁর তীক্ষ্ণ মনন-সঞ্জাত বোধের পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর চরিত্রের আর একটি সমান জোরালো বৈশিষ্ট্য ছিল তাঁর রসবোধ। তাঁর লেখা ও কথায় তার পরিচয় পাওয়া যেত। সদা গাম্ভীর্য্য ভারতীয়দের বৈশিষ্ট্য বলে মনে করা হয় কিন্তু চিত্তরঞ্জনের ভাঁড়ারে প্রকৃত হিউমার অফুরন্ত ছিল। সব থেকে নিরানন্দ সঙ্গীতও তাঁর সরস কথাবার্তায় প্রাণবন্ত হয়ে উঠত। তাঁর পেশা জীবনে এই রসবোধ অনেক কাজে লেগেছে।

তিনি কলকাতার মেয়র হবার পর জনৈক কাউন্সিলর শহরে ভিক্ষাবৃত্তি বন্ধ করতে চান। শ্রী দাস তৎক্ষণাৎ জবাব দেন, তাহলে প্রথম অপরাধী হবেন কলকাতার মেয়র স্বয়ং কারণ সেই সময় শহরে তিনি সকলের চেয়ে বড় ভিক্ষুক।

আর একবার কলকাতা পৌর প্রতিষ্ঠানের প্রধান কার্য্যনির্বাহক অফিসার মেয়রের ঘরে একটি টেবিল দেখে তারিফ করে বলেন, এটি সৌন্দর্য্যের এক টুকরো। সঙ্গে সঙ্গে শ্রী দাসের জবাব, "কিন্তু আমার কাছে চিরানন্দদায়ক নয়।"

একবার প্রবীণ উকিল কিশোরীপতি রায় হাঁটতে না পারার জন্য ছোট ডুলিতে করে তাঁকে জেলে আনা হয়। চিত্তরঞ্জন তাঁর শরীর কেমন আছে জিজ্ঞাসা করলে কিশোরীপতি বলেন, হাঁটতে পারছি না, তাই রথে এসেছি। চিত্তরঞ্জনের মন্তব্য, কিশোরীপতি (বিষ্ণু) ত সব সময় ওতেই আসেন।

বঙ্গ বিধান পরিষদের নির্বাচনকালে চিত্তরঞ্জন নিজের জেঠতুতো ভাই শ্রীসতীশ রঞ্জন দাসের বিরুদ্ধে সাতকড়ি রায়কে সমর্থন করছিলেন। সূর্য্য নামে জনৈক ভদ্রলোক চিত্তরঞ্জনকে জানান যে বিধু নামে তাঁর এক বন্ধু সতীশ রঞ্জনের নির্বাচনের জন্য কাজ করছেন। চিত্তরঞ্জন অমনি বললেন, বিধু (চাঁদ) যদি সতীশ রঞ্জনের জন্য কিছু করে তাহলে তার দশগুণ সূর্য্য করবে সাতকড়ির জন্য—।

শ্রী দাস প্রায়ই বলতেন যে, বৈদ্যরা প্রকৃতপক্ষে ব্রাহ্মণ। বাসন্তী দেবী বললেন, "এর প্রমাণ কি"? "আমি যে ব্রাহ্মণকন্যা বিয়ে করেছি, সেটাই ত বড় প্রমাণ"। জবাব দিলেন চিত্তরঞ্জন। সবাই হেসে উঠলেন।

কংগ্রেসের গয়া অধিবেশনে চিত্তরঞ্জন ও তাঁর বন্ধুরা নিজেদের মধ্যে ঘরোয়া আলোচনা করছিলেন। জনৈক আগন্তুক অধৈর্য্যের সঙ্গে প্রশ্ন করেন, "মশাই সভার কাজ কখন শুরু হবে?" "আপনি থামলেই"। চিত্তরঞ্জনের গম্ভীর জবাব।

একবার জনৈক ভদ্রলোক মন্তব্য করেন, স্বাধীনতাপন্থী ও স্বরাজবাদীদের মধ্যে যদি কোন পার্থক্য না থাকে তাহলে স্বাধীনতা-পন্থীরা কেন স্বরাজবাদীদের দলে যোগ দিচ্ছে না, তা বুঝতে পারি না। শ্রী দাস জবাব দিলেন, "তাহলে ওরা যে স্বাধীন সত্বা হারাবে।"

পঞ্চম অধ্যায়

রাজনৈতিক জীবনের সূত্রপাত

গোড়াতেই বলেছি ছাত্রাবস্থা থেকেই রাজনীতিতে চিত্তরঞ্জনের আগ্রহ দেখা যায়। বস্তুত, তিনি এবং তাঁর বন্ধুরা মনে করতেন যে, তাঁর রাজনৈতিক কার্য্যকলাপের জন্যই তিনি ভারতীয় সিভিল সার্ভিসে নিযুক্ত হননি। তাঁর পেশা জীবনেও রাজনীতি এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল এবং রাজনৈতিক মামলাতেই তিনি অসামান্য সাফল্য লাভ করেছিলেন। তাঁর সাহিত্য চর্চাতে দেশপ্রেমই প্রধান সুর। তাঁর সমস্ত রচনায় তাঁর গভীর দেশপ্রেম ও ভারতীয় ঐতিহ্যের প্রতি অসীম শ্রদ্ধা প্রকাশ পেয়েছে। সামাজিকদায়বোধই চিত্তরঞ্জনকে 'নারায়ণ' পত্রিকা প্রকাশে প্ররোচিত করে। তাঁর প্রথম পরিচয় জাতীয়তাবাদীরূপে, তারপরে আসেন উকিল ও সাহিত্যিক চিত্তরঞ্জন।

চিত্তরঞ্জন রাজনৈতিক মল্লভূমিতে আসেন সেই সব গুণ নিয়ে যা তাঁকে বিশিষ্ট আইনজীবী ও সাহিত্যিকরূপে চিহ্নিত করে দিয়েছিল। বাকপটুতা ও অন্যকে প্ররোচিত করার অসাধারণ ক্ষমতা ছিল তাঁর। ওকালতি করার ফলে যে কোন সমস্যার বিভিন্ন দিক বিশ্লেষণ করার দক্ষতা ও তীক্ষ্ণ বাস্তববোধ তিনি অর্জন করেছিলেন। বস্তুগত বিশ্লেষণের ক্ষমতার সঙ্গে মিশ্রিত হয়েছিল কবির অনুভূতি ও আবেগ। খুবই স্বাভাবিক যে, তাঁর রাজনৈতিক জীবনের সূত্রপাত থেকেই মুষ্টিমেয় উচ্চশ্রেণীর নরনারী নয়, জনগণের স্বরাজের জন্য তিনি সংগ্রাম করেছিলেন। তাঁর দেশ তাঁর মহান গুণ উপলব্ধি করে তাঁকে ভালবেসে 'দেশবন্ধু' উপাধি দিয়েছিল।

বর্তমান ভারতীয় রাজনীতির সূত্রপাত হয় ১৮৮৫ সালে বম্বেতে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনে। তখন কংগ্রেস শুধু আবেদন নিবেদনের প্রতিষ্ঠান ছিল। বঙ্গভঙ্গ তার এই মোলায়েম ভাবটি ছুটিয়ে দিল। কংগ্রেস অধিবেশনে বক্তৃতা ও প্রস্তাবের ভাষা আরও জোরালো হয়ে উঠল। তবে এই পর্য্যায়ে কংগ্রেস বিপ্লবী সংস্থা হয়ে উঠেছিল তা মনে করা ভুল হবে।

১৯০৫ সালে কংগ্রেসের মধ্যে নতুন শক্তি মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। বিপিনচন্দ্র পাল তরুণদের মুখপাত্র হয়ে দাঁড়ালেন এবং তাঁর কাগজ 'নিউ ইণ্ডিয়া'য় তাদের আশা আকাঙ্খা প্রতিফলিত হল। চিত্তরঞ্জন বিপিনচন্দ্র পালের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। তিনি নরমপন্থীদের—ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস যাঁদের নিয়ন্ত্রণে ছিল—ভিক্ষা নীতির তীব্র বিরোধিতা করেন। এই সময়ের কথা বলতে গিয়ে বিপিনচন্দ্র লেখেন, "এই সময় আমাদের রাজনীতিতে আর একটি আন্দোলন ধীরে ধীরে শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল। ১৯০১ সালে 'নিউ ইণ্ডিয়া' আত্মপ্রকাশ করে। এর জন্মলগ্ন থেকেই চিত্তরঞ্জন এই পত্রিকার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত হয়ে পড়েন। আসল মালিকদের পক্ষে এর বোঝা বহন কষ্টসাধ্য হয়ে পড়লে চিত্তরঞ্জন এগিয়ে আসেন পত্রিকাটিকে বাঁচাবার জন্য। পত্রিকার খরচ যোগাবার জন্য একটি যৌথ মূলধন কোম্পানি গঠন করা হয়। চিত্তরঞ্জন দেউলিয়া হওয়ার কারণে ডিরেক্টার বোর্ডে যোগ দিতে না পারলেও নিজের বন্ধুদের এ উদ্যোগে তাঁদের নাম ও অর্থদানের জন্য প্ররোচিত করেন। ১৯০৫ সালে আমাদের নতুন জাতীয় আন্দোলন শুরু হওয়ার পর আমাদের পুরানো পরিচয় ও সাথীত্ব আরও অন্তরঙ্গ হয়েছে। প্রায় কুড়ি বছর আমাদের একই মাতৃভূমির সেবায় আমরা দুজনে ছিলাম প্রকৃত অংশীদার। আমি কাজ করেছি আর তিনি আমাকে বাঁচিয়ে রাখার উপায় বের করেছেন। পুণ্য কর্তব্য করার গভীর অনুভূতি নিয়ে তিনি আমার বোঝা বহন

করেছেন যার ফলে তাঁর সাহায্য নিতে আমার কখনও লজ্জা হয়নি, সঙ্কোচ হয়নি।"

১৯০৪ সালে চিত্তরঞ্জনের বাড়ীতে স্বদেশী মণ্ডলী গঠিত হয়। কয়েকজন নির্বাচিত বন্ধুকে নিয়ে এই মণ্ডলী তৈরি হয়েছিল। তাঁদের কাজ ছিল স্বাবলম্বন ও স্বদেশী ভাব প্রচার করা। ১৬ই অক্টোবর, ১৯০৫ তারিখে দার্জিলিঙে এক ভাষণে চিত্তরঞ্জন বলেন, "যে প্রধান কারণে স্বদেশী আন্দোলন বাঞ্ছনীয় বলে আমার মনে হয় তা হল, বাঙ্গালী জাতিকে আত্মনির্ভরতার পথে নিয়ে যাওয়ার এই হল প্রথম পদক্ষেপ। সেই একই কারণে আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়েছে যে, এই আন্দোলনের সাফল্যের ওপরই আমাদের জাতীয় অগ্রগতি নির্ভর করছে। বিশ্ব ইতিহাস প্রমাণ করে দিয়েছে যে কোন দেশ অন্য দেশকে সাহায্য করতে পারে না। প্রত্যেক ব্যক্তিকে নিজের উদ্যোগে নিজের ভবিষ্যৎ সৃষ্টি করতে হয়, প্রত্যেক জাতির ক্ষেত্রেও তাই। স্বাধীনতা লাভের জন্য দেশকে নিজের শক্তির ওপর নির্ভর করতে হবে। কিন্তু আপনারা যদি অন্য দেশের ওপর নির্ভর করেন তাহলে হাজার বছরেও প্রকৃত স্বাধীনতার পথ খুঁজে পাবেন না।"

এই সভায় শ্রী দাস শুধু বঙ্গদেশের পরিপ্রেক্ষিতে বক্তৃতা দিলেও তিনি ছিলেন উদার জাতীয়তাবাদী—সারা ভারত নিয়ে তাঁর চিন্তা। এমন কি, এশীয় সম্মেলনের কথা ভাবতে শুরু করেছিলেন। তাঁর এই চিন্তার প্রেরণা যুগিয়েছিলেন বিখ্যাত জাপানী কবি ওকাকুরা ও ভগিনী নিবেদিতা। তিনি ওকাকুরার "প্রাচ্যের আদর্শ" বইটি পড়ে বিশেষ অভিভূত হন। ভগিনী নিবেদিতা এই গ্রন্থের ভুমিকায় লেখেন, "এশিয়া এক—হিমালয় পর্বত বিভেদের বেড়া তুলেছে শুধু প্রাচ্যের দুটি শক্তিশালী সভ্যতা—ভারত ও চীনকে আরও কাছাকাছি আনার জন্য।"

এই সময় চিত্তরঞ্জন ও তাঁর বন্ধুগণ জাতীয় শিক্ষা পদ্ধতির প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে অনুভব করতে থাকেন। কয়েকটি ঘটনায় তাঁদের জাতীয় কলেজ প্রতিষ্ঠার ইচ্ছা আরও জোরালো হয়ে উঠল। ১৯০৫ সালের অক্টোবর মাসে বঙ্গ সরকার ছাত্রদের রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ নিষেধ করে এক আদেশ জারী করেন। কোন কোন স্কুলের প্রধান শিক্ষক স্কুল ইন্সপেক্টরের নির্দেশে ছাত্রদের জরিমানা, এমন কি বেত্রাঘাতও করতেন। শ্রী দাস জানতে পারেন যে কলকাতার ধনী সমাজসেবী শ্রী সুবোধ মল্লিক জাতীয় কলেজ প্রতিষ্ঠার জন্য মোটা টাকা দান করতে রাজী আছেন। চিত্তরঞ্জন অনতিবিলম্বে একটি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের পরিকল্পনা নিয়ে সুবোধ মল্লিকের কাছ থেকে এক লক্ষ টাকা দানের প্রতিশ্রুতি আদায় করেন। ১৯০৫ সালের ৯ই নভেম্বর এই পরিকল্পনাটি ঘোষণা করা হয়।

এইভাবে জাতীয় শিক্ষা পরিষদের সূত্রপাত হয়। পরবর্তীকালে তা হয়ে দাঁড়ায় যাদবপুর এঞ্জিনিয়ারিং কলেজ। আজ তা বিধিবদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয়, শিল্প কৌশলের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয় এখানে। চিত্তরঞ্জন অরবিন্দকে আহ্বান জানালেন, বরোদার গায়কোয়াড় কলেজের সহকারী অধ্যক্ষের পদত্যাগ করে দেশ সেবার উদ্দেশ্যে কলকাতায় আসার জন্য। জাতীয় শিক্ষা পরিষদ স্থাপিত হলে অরবিন্দ হন এর প্রথম অধ্যক্ষ।

১৯০৬ সাল চিত্তরঞ্জনের রাজনৈতিক জীবনে আর একটি স্মরণীয় বছর। এ. রসুলের সভাপতিত্বে বরিশালে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনে চিত্তরঞ্জন মূল প্রস্তাবের খসড়া রচনা করেন। আবেদন নিবেদনের পালা—যা তখন রাজনৈতিক কার্য্যকলাপের প্রধান যন্ত্র ছিল—শেষ করে আত্মনির্ভরতার নীতি গ্রহণের জন্য তিনি আহ্বান জানান। সম্মেলনের কাজ অবশ্য শান্তিপূর্ণভাবে শেষ করা যায় নি। প্রকাশ্য অধিবেশন পুলিস জোর করে ভেঙ্গে

দেয়। 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনি দেওয়ার জন্য স্বেচ্ছাসেবক ও ছাত্রদের লাঠি পেটান হয়। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে গ্রেপ্তার এবং দণ্ডিত করা হয়। নরমপন্থীরাও এতে মর্মাহত হন। তাঁরা ভবিষ্যদ্বাণী করেন যে ভারতে ব্রিটিশ শাসন অবসানের সূচনা এই ঘটনায় হয়েছে। সম্মেলন ভঙ্গের দেড় মাসের মধ্যে ১৯০৬ সালের জুন মাসে লোকমান্য টিলক কলকাতায় আসেন এবং শিবাজী উৎসবের আয়োজন করেন। এই উপলক্ষে টিলকের বাণী, "স্বরাজ আমার জন্মগত অধিকার" ভারতীয় জাতীয়তাবাদের শ্লোগান হয়ে দাঁড়ায়। কলকাতায় কংগ্রেস অধিবেশনকালে টিলক এবং অন্যান্য মহারাষ্ট্রীয় নেতা চিত্তরঞ্জনের আতিথ্য গ্রহণ করেন। তাঁদের মধ্যে যোগাযোগের ফলে জাতীয়তাবাদী দল বৃদ্ধিতে আরও বেশী উদ্যম দেখা দিল।

১৯০৭ সালে সুরাটে কংগ্রেস অধিবেশন ভেঙ্গে যাবার পর কংগ্রেস পরিচালনার ভার মধ্যপন্থীদের হাতে এসে পড়েছিল। চিত্তরঞ্জন সক্রিয় রাজনীতি থেকে দূরে ছিলেন। কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক মামলাগুলিতে অংশ গ্রহণের ফলে রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ছিল। ১৯১৭ সালের এপ্রিল মাসে কলকাতায় বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনে সভাপতিত্ব করবার জন্য তাঁকে আমন্ত্রণ জানানো হয়। সভাপতিত্বের জন্য তাঁর নাম প্রস্তাব করে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ঘোষণা করেন যে, চিত্তরঞ্জন শীঘ্রই ভারতের অন্যতম বিশ্বস্ত ও প্রিয় নেতা হয়ে দাঁড়াবেন।

এই সম্মেলনে সভাপতির ভাষণে চিত্তরঞ্জন প্রথম গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ঘোষণা করেন। কয়েকটি উদ্ধৃতি দিয়ে সেই সময় তাঁর রাজনৈতিক চিন্তাধারার গতি প্রকৃতির কিছুটা আভাস দিচ্ছি—"আমি নিজেকে বাঙ্গালী বলতে বিশেষ গর্ববোধ করি। বাঙ্গালীদের জীবনে একটা নিজস্ব উদ্দেশ্য আছে। তাদের সাহস, কৃষ্টি, সাহিত্য,

ধর্ম ও আচার ব্যবহার সবই তাদের নিজস্ব। তাদের রয়েছে অতীত ইতিহাস, সামনে তাদের মহান ভবিষ্যৎ। তাই আমি জোরের সঙ্গে ঘোষণা করছি যে যিনি বলেন বাঙ্গালীদের শৃঙ্খলাবোধের অভাব, তিনি আমার বাঙ্গলাদেশকে চেনেন না…

"বাঙ্গলাদেশের কথা আমরা খুব অল্পই ভাবি। সাধারণ মানুষের সঙ্গে আমরা সাধারণ যোগাযোগ হারিয়েছি বলে আমাদের সমস্ত রাজনৈতিক আন্দোলন নিষ্ফল ও শূন্য হয়ে গেছে। দেশ বলতে শুধু শিক্ষিত শ্রেণীকে বোঝায় না। সকল শ্রেণী, দল ও ধর্মমতের মানুষকে নিয়ে আমাদের দেশ…"।

জনসাধারণ ও কৃষকদের রাজনৈতিক সমাবেশে যোগদানের কাজে ঠিকমত আহ্বান করতে না পারার জন্য চিত্তরঞ্জন এগুলির নিন্দা করতেন। তাঁর মতে এ হল সম্পূর্ণ বুর্জোয়া নীতি এবং সর্ব্বাশ্রয়ী গণতান্ত্রিক নীতির ভিত্তিতে তা রচিত নয়। দেশের মেরুদণ্ড জনসাধারণের অন্তরঙ্গ স্পর্শ থেকে বিচ্ছিন্ন বলে আমাদের সমস্ত রাজনৈতিক আন্দোলন অবাস্তব। তিনি তাঁর ভাষণে দেখিয়ে দেন কেমন করে বৃটিশ শাসনের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে আমরা ইউরোপীয় কতগুলি জঘন্যতম দোষ অনুকরণ করতে শুরু করেছি, আগের সরল জীবন ও প্রাণশক্তি বিসর্জন দিয়ে আরাম ও ও বিলাসপ্রিয় হয়ে উঠেছি। তাঁর মতে বঙ্কিমচন্দ্রের কাছেই মায়ের প্রকৃতরূপ উদ্ঘাটিত হয়েছিল। "মাতৃভূমির পবিত্ররূপ প্রথম চোখে দেখবার সৌভাগ্য তাঁর হয়েছিল।"

চিত্তরঞ্জন ঘোষণা করেন—

"বাংলাদেশের প্রকৃত আত্মা আমি দেখতে পেয়েছি। বাংলাদেশের প্রকৃত ইতিহাস উপলব্ধি করতে আমি শিখেছি। বৌদ্ধদের বুদ্ধমূর্ত্তি, শৈবদের শিব, শাক্তদের শক্তি এবং বৈষ্ণবদের ভগবৎ প্রেমমূর্ত্তি আমার চোখের সামনে ভেসে উঠছে। আমি

বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের অমর সঙ্গীতের কথা ভাবি। আর মনে করি যে শ্রীচৈতন্যের গৌরবময় জীবনের প্রভায় আমার জীবনও গৌরবদীপ্ত হয়ে উঠছে। জ্ঞান দাস, গোবিন্দ দাস ও লোচনদাসের গান আমার হৃদয়তন্ত্রীতে স্পন্দন জাগায়। রামপ্রসাদ সেনের ভক্তি সঙ্গীতে আমার হৃদয় গলে যায়।

"তারপর আমরা মাকে দেখলাম! আর বঙ্কিমের গান কানের ভিতর দিয়ে আমাদের মর্মে গিয়ে পৌঁছাল। শ্রীরামকৃষ্ণ ও কেশব চন্দ্রের বাণী আমি উপলব্ধি করতে পারি। বিবেকানন্দের বাণী আমাকে প্রেরণা জোগায়। আমি উপলব্ধি করি যে বাঙ্গালী হিন্দু, মুসলমান বা খৃষ্টান যাই হোক না কেন আসলে সে বাঙ্গালী। তার নিজস্ব ব্যক্তিসত্তা আছে। তার নিজস্ব কৃষ্টি আছে। আর যদি সে নিজেকে উপলব্ধি করতে চায় তবে তাকে প্রকৃত বাঙ্গালী হতে হবে।

"বিশ্বে বাঙ্গালীদের একটা নিজস্ব স্থান আছে। তাদের একটা নিজস্ব স্থান আছে। তাদের একটা নিজস্ব কর্ত্তব্য ও জীবন উদ্দেশ্য আছে। বাঙ্গালীকে অবশ্যই অন্তরে বাঙ্গালী হতে হবে। ভগবানের সৃষ্ট অন্যান্যদের থেকে বাঙ্গালীদের একটা আলাদা বৈশিষ্ট্য আছে— স্রষ্টার ইচ্ছার শাশ্বত প্রকাশের একটা বিশেষ দিক।

তিনি শুধু দেশের বর্ত্তমান অবস্থা এবং অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অবক্ষয়ের কারণ বিশ্লেষণ করেননি, ভারতের মেরুদণ্ড পল্লীর পুনর্গঠনের জন্য একটি সৃজনমূলক পরিকল্পনা পেশ করেন—

(১) পল্লী সংস্কার ও জনসাধারণের পুনর্বাসনের জন্য সমস্ত পন্থা আমাদের অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে।

(২) কৃষক যাতে সারা বছর পরিশ্রম করতে পারে সেজন্য তাকে পর্য্যাপ্ত খাদ্য আমাদের অবশ্যই দিতে হবে।

(৩) পানীয় জলের অভাব অবশ্যই দূর করতে হবে, নতুন পুষ্করিণী খনন ও পুরানো পুষ্করিণীর সংস্কার করতে হবে।

(৪) জঙ্গল সাফ করতে হবে।

(৫) পঞ্চায়েত এবং কৃষকদের কম হারে সুদ দেওয়ার জন্য সমবায় ঋণদান সমিতি স্থাপন ও কুটির শিল্প শুরু করতে হবে।

চিত্তরঞ্জনের বক্তব্য বিষয় এক কথায় বলা যেতে পারে আত্মনির্ভরতার আহ্বান। তিনি পশ্চিমের শত্রু ছিলেন না কিন্তু তিনি মনে করতেন যে ভারত পশ্চিমের সমপর্য্যায়ে উঠতে না পারলে উভয়ের মধ্যে স্থায়ী বন্ধুত্ব হবে না। ভারত ব্রিটেনের বন্ধুত্বের বিরুদ্ধে তিনি ছিলেন না তবে তিনি মনে করতেন উভয়েরই উচ্চতম বিকাশ সর্বাগ্রে প্রয়োজন। ভারতের অতীত দিনের—যখন তার গোলাভরা ধান ছিল, লোকে পেট ভরে খেতে পেত—কথা তিনি বলতেন। পল্লীজীবনে সেদিন আনন্দ ছিল, চাষী সারা দিনের খাটুনির পরে হাসিমুখে ঘরে ফিরত। চিত্তরঞ্জন বলতেন আমাদের দুর্বলতার মূলে রয়েছে আমাদের অনৈক্য। পশ্চিমী আদব কায়দা, রীতিনীতি এবং কথাবার্তা, পোষাক, খাদ্য ও পান স্বভাবের অন্ধ অনুকরণের তিনি তীব্র নিন্দা করতেন।

লর্ড রোণাল্ডসে তাঁর 'দি হার্ট অফ আর্য্যাবর্ত' গ্রন্থে চিত্তরঞ্জনের ভাষণ প্রসঙ্গে বলেন, "বস্তুত ধর্মপ্রচারকের আবেগ ও উদ্দীপনা নিয়ে চিত্তরঞ্জন বক্তৃতা করেন। ইউরোপীয় আদর্শের প্রতীকরূপে তিনি তুলে ধরেন সোনার বাছুর, তারপর তিনি তা টুকরো টুকরো করে দেন। দ্রষ্টার আবেগ নিয়ে তিনি প্রতিশ্রুত ভূমির পথ নির্দেশের আশ্বাস দেন।"

১৯১৬ সালে মিঃ অ্যাশকুইথ ভারতের স্বায়ত্বশাসন লাভ সম্বন্ধে ভারতীয় প্রতিনিধিদের অভিমত জানার ইচ্ছা প্রকাশ করেন।

তখন ভারত সচিব ছিলেন মিঃ অস্টিন চেম্বারলেন। তিনি এ প্রসঙ্গে একটি ঘোষণা করতে চেয়েছিলেন। ভাইসরয়ের ব্যবস্থাপক সভার নির্বাচিত সভ্যগণ একটি স্মারকপত্র রচনা করেন। স্মারক পত্রটি ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস ও মুস্লিম লীগ উভয়েই সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদন করে। কংগ্রেস—মুস্লিম লীগ পরিকল্পনা নামে পরিচিত এই যৌথ পরিকল্পনাটি কিন্তু ব্রিটিশ সরকারের অনুমোদন পায়নি। তার বদলে মিঃ লায়োনেল কার্টিসের—যিনি ১৯১৭ সালে দিল্লীতে এসেছিলেন—একটি পরিকল্পনা, যাতে দ্বৈত শাসন প্রবর্তনের প্রস্তাব করা হয়েছিল, সরকারী আনুকূল্য পাবে বলে মনে হল। শেষ পর্য্যন্ত ১৯১৭ সালের ১০শে, আগষ্ট তারিখে তদানীন্তন ভারত সচিব মিঃ মণ্টেগু পার্লামেণ্টে, ভারতে ক্রমে ক্রমে দায়িত্বশীল সরকার প্রতিষ্ঠার জন্য আবেদন জানান।

তখন ভারতে স্বায়ত্ব শাসন প্রতিষ্ঠার দাবী যাঁর কণ্ঠে সোচ্চার হয়ে উঠেছিল তিনি হলেন অ্যানি বেশান্ত। তিনি হোমরুল লীগ প্রতিষ্ঠা করেন। তখনকার শ্রেষ্ঠ রাজনৈতিক নেতাদের অনেকেই এই লীগের প্রতি আকৃষ্ট হন। অ্যানি বেশান্তের কার্য্যকলাপ সরকারের বিরাগের কারণ হয় এবং মাদ্রাজের গভর্ণর তাঁকে অন্তরীণ রাখার জন্য আদেশ জারি করেন। চিত্তরঞ্জন অ্যানি বেশান্তের মতবাদকে পূর্ণ সমর্থন জানান এবং হোমরুল লীগে যোগদান করেন। অ্যানি বেশান্তকে অন্তরীণ রাখার বিরুদ্ধে তিনি তীব্র প্রতিবাদ জানান। কলকাতায় ভারতীয় সমিতির এক সভায় তিনি বলেন—

"মানবিকতার ঠাকুর একবার মাত্র ক্রশবিদ্ধ হয়েছিলেন, তা আমি মনে করি না। স্বেচ্ছাচারী শাসক ও উৎপীড়কেরা মানবিকতাকে বারবার ক্রশবিদ্ধ করেছে। মানবিকতার ওপর প্রতিটি অত্যাচার ভগবানের পবিত্র দেহে আর একটি পেরেক ঠোকার সমান।"

চিত্তরঞ্জন চেয়েছিলেন যে, কলকাতায় ১৯১৭ সালের ডিসেম্বর মাসে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে সভাপতিত্ব অ্যানি বেশান্ত করুন। অভ্যর্থনা কমিটি অ্যানি বেশান্তের অনুকূলে ভোট দেন কিন্তু অভ্যর্থনা কমিটির সভাপতি শ্রী বৈকুণ্ঠ নাথ সেন শ্রীমতী বেশান্তের নির্বাচন অবৈধ ঘোষণা করেন। প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির নেতা শ্রী সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মামুদাবাদের রাজাকে সভাপতি করতে চেয়েছিলেন। নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি—যেখানে তাঁর গরিষ্ঠ সংখ্যক সমর্থক ছিলেন—সভাপতি নির্বাচন সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিক, সুরেন্দ্রনাথ তাই চেয়েছিলেন। ইতিমধ্যে বাংলাদেশ ছাড়া আরও ছটি প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি শ্রীমতী বেশান্তের অনুকূলে ভোট দেয়।

অ্যানি বেশান্তকে চিত্তরঞ্জনের সমর্থন করার কারণ কংগ্রেসে গণতান্ত্রিক নীতি প্রতিষ্ঠায় তাঁর ঐকান্তিক আগ্রহ। তিনি পিতৃবন্ধু শ্রী বৈকুণ্ঠনাথ সেনের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধাপোষণ করতেন কিন্তু তিনি মনে করেন, শ্রী সেন বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটিতে সংখ্যা গরিষ্ঠের বিরুদ্ধে গিয়েছেন। তাই তিনি শ্রী সেনের বদলে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাম প্রস্তাব করেন অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি পদের জন্য। চরম সংকট অনিবার্য্য হয়ে দেখা দিল। শেষ পর্য্যন্ত কলকাতা হাইকোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি—যিনি কিছুকালের জন্য অস্থায়ী প্রধান বিচারপতি হয়েছিলেন স্যার চন্দ্র মাধব ঘোষের মধ্যস্থতায় মিটমাট হল। স্থির হল, শ্রীমতী বেশান্ত সভাপতি নির্বাচিত হবেন এবং রবীন্দ্রনাথ ও বৈকুণ্ঠনাথ দুজনেই অভ্যর্থনা কমিটি থেকে পদত্যাগ করবেন। তাঁদের পদত্যাগ অনুমোদনের পর শ্রী সেন অভ্যর্থনা কমিটির সভাপতি পদে পুনরায় নির্বাচিত হবেন। রবীন্দ্রনাথ তৎক্ষণাৎ পদত্যাগ করেন এবং শ্রীসেন সভাপতি বজায় থাকেন।

কলকাতায় কংগ্রেস অধিবেশন বিরাট সাফল্য মণ্ডিত হয়।

জনগণ শ্রীমতী বেশান্তকে স্বতঃস্ফূর্ত অভিনন্দন জানায়। অধিবেশনের পর শ্রী দাস বাংলাদেশের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত সফর করেন। তিনি বার বার ঘোষণা করেন যে তিনি কাজ করছেন "শুধু হিন্দু নয়, শুধু মুসলমান নয়, শুধু জমিদার ও ব্যবসায়ী সম্প্রদায় নয়, সারা ভারতের জনগণের স্বায়ত্বশাসনের জন্য"—যে স্বায়ত্ব শাসনে সকলের স্বার্থই রক্ষিত হবে।

ভারত সচিব মিঃ মণ্টেগু ২০শে আগষ্ট, ১৯১৭ তারিখে তাঁর ঘোষণার পর নভেম্বর মাসে ভারতে আসেন। সেই সময় তিনি চিত্তরঞ্জন ও অন্যান্য জাতীয় নেতার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। শ্রী দাসের সঙ্গে তিনঘণ্টাব্যাপী সাক্ষাৎকারে নিম্নরূপ আলোচনা হয়েছিল বলে জানা হায়—

"মিঃ মণ্টেগু—আচ্ছা, মিঃ দাস, লায়োনেল কার্টিসের সংস্কার পরিকল্পনা সম্বন্ধে আপনার অভিমত কি?

শ্রী দাস— কার্টিস শাসন সংস্কারের জন্য যে সব সুপারিশ করেছেন সেগুলি কখনই সফল হতে পারে না। প্রাদেশিক স্বায়ত্ব শাসন আবশ্যক।

মিঃ মণ্টেগু—কিন্তু আমার মনে হয় আপনি লায়োনেল কার্টিসের প্রস্তাবিত দ্বৈত শাসন সমর্থন করেছিলেন।

শ্রী দাস— হাঁ, তা করেছিলাম। কিন্তু তা ঐক্যের জন্য দুর্বলকে কিছুটা সুবিধা দেওয়ার জন্য। আশা করেছিলাম, ইঙ্গ-ভারতীয়েরা আমাদের সঙ্গে যোগ দেবেন। সেজন্য আমি আমার দাবী কিছুটা মোলায়েম করেছিলাম, কিন্তু তাঁদের জঙ্গী মনোভাব দেখে আমি আমার পুরানো আদর্শে ফিরে গিয়েছি।

লর্ড চেমসফোর্ড, বোধ হয় কিছুটা রাগের সঙ্গে মন্তব্য করেন, "প্রাদেশিক স্বায়ত্ব শাসনের কথা বলার সময় কি এখনও এসেছে? কয়েকটি সংস্কারমূলক ব্যবস্থা পরীক্ষা করে দেখা যেতে পারে। আপনারা যদি ভালভাবে কাজ করেন তাহলে সময়ে আরও বেশী অধিকার পাবেন।"

এই আলোচনা সম্বন্ধে নিজ অভিমত মিঃ মণ্টেগু এভাবে ব্যক্ত করেন, "১৯১৭ সালের ডিসেম্বর মাসে চিত্তরঞ্জন দাসের—চরমবাদী, তবে অত্যন্ত সমঝদার লোক—সঙ্গে আমার কথাবার্তা হয়। প্রথমে তিনি কার্টিসের পরিকল্পনার সমর্থক ছিলেন। এখন তিনি পুরোপুরি প্রত্যাখ্যান করেন। তাঁর দাবী হল স্থানীয় সরকারকে পূর্ণ দায়িত্ব এখনই দিতে হবে। দাস নিজের দাবীর পক্ষে অত্যন্ত জোরালো যুক্তি প্রদর্শন করেন। আমি তাঁকে পাল্টা বোঝাবার চেষ্টা করি। আমি তাঁকে আবেদন জানাই। তাঁর সঙ্গে একান্তে দেখা করলে তিনি বলেন, আধাআধি ব্যবস্থা ভাল নয়—দায়িত্বশীল সরকার ও পূর্ণ দায়িত্বের মধ্যবর্তী কোন স্তর সম্ভব নয়। আমি তাঁর প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট হয়েছি। পুলিশ এবং গোয়েন্দা বিভাগকে যেভাবে কাজে লাগান হচ্ছে তাতে তাঁর কোন আস্থা নেই।

"দাস আরও বলেন, আচ্ছা আমাদের স্থায়ী কমিটি, নতুন নির্বাচকমণ্ডলী, পরিচ্ছন্ন বিধান পরিষদ এবং পাঁচ বছর ধরে কোন ক্ষমতা না দিয়ে আপনাদের পার্লামেণ্টে তা দেবার প্রতিশ্রুতি দিতে থাকুন। আমি বরং তা মেনে নেব কিন্তু যে পন্থায় কাজ হবে না বলে আমি জানি তা কখনই গ্রহণ করব না।"

১৯১৭ সালে কলকাতায় কংগ্রেস অধিবেশন এই প্রতিষ্ঠানের ইতিহাসে একটি যুগান্তকারী অধ্যায়। এর আগে কংগ্রেস নরমপন্থী কর্মীদের নিয়ন্ত্রণে ছিল। গোখলের মৃত্যু এবং স্যার ফিরোজশা মেহতার অবসর গ্রহণের পর সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কংগ্রেসের

বিশিষ্টতম নেতা হয়ে দাঁড়ান। তাঁর প্রধান সহকর্মীদের মধ্যে ছিলেন ভূপেন্দ্রনাথ বসু ও অম্বিকাচরণ মজুমদার, উভয়েই নরমপন্থী। সুরেন্দ্রনাথের নেতৃত্বের বিরুদ্ধে প্রথম সফল চ্যালেঞ্জ হল শ্রীমতী বেশান্তের নির্বাচন। নরমপন্থীদের প্রতিপত্তিতে ভাটা পড়তে শুরু করল। বাল গঙ্গাধর টিলক, চিত্তরঞ্জন দাস, ব্যোমকেশ চক্রবর্তী, মহম্মদ আলি জিন্না ও হাসান ইমামকে নিয়ে এক নতুন নেতৃত্বের হাতে ক্ষমতা এল। শ্রীমতী বেশান্তের হোমরুল লীগ কংগ্রেসের নিয়ন্ত্রক হয়ে দাঁড়াল এবং তাঁর প্রধান সহকারী চিত্তরঞ্জন হলেন ভারতের রাজনৈতিক ও জাতীয় জীবনে বিশিষ্টতম ব্যক্তিদের অন্যতম।

কংগ্রেস অধিবেশনে সুরেন্দ্রনাথ স্বায়ত্বশাসন সম্বন্ধে একটি তীব্র ভাষণ দেন। কংগ্রেসের মঞ্চ থেকে এই তাঁর শেষ ভাষণ। কংগ্রেসের অধিবেশনে আর তাঁর কণ্ঠ শোনা যায়নি, তাঁর স্থান নিয়েছিলেন চিত্তরঞ্জন।

এই সময় এক ভাষণে চিত্তরঞ্জন সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের উল্লেখ করেন। এই আন্দোলন বাংলাদেশের তরুণদের এক বৃহৎ অংশের মন জুড়ে বসেছিল এবং ভারতের অন্যান্য অংশে অনুরাগীর অভাব হয়নি। চিত্তরঞ্জন নিজে সন্ত্রাসবাদ ও গোপন সমিতিতে বিশ্বাস করতেন না, কংগ্রেসের আদর্শে আকৃষ্ট না হয়ে তিনি থাকতে পারেননি।

চিত্তরঞ্জন বলেন, "স্বাধীনতা লাভের জন্য তাদের উদগ্র কামনা বাধা পাওয়াতে তারা অধৈর্য্য হয়ে পড়েছে, তারা বিপ্লবে বিশ্বাস করে। ওরা চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছে যে ছোট বড় সব দেশই স্বাধীনতার জন্য উৎসুক। স্বাধীনতা প্রিয় এই তরুণেরা ব্রিটিশ শাসনে উত্যক্ত হয়ে স্বাধীনতা লাভের জন্য মরীয়া হয়ে উঠেছে। ওদের স্বাধীনতা দিন, স্পষ্ট বলুন যে সংবিধানের পরিবর্তন করবেন,

বলুন ওদের কল্যাণের জন্য আপনি দেশ শাসন করবেন তাহলে দেখবেন দেশ থেকে অরাজকতা লোপ পেয়েছে। আপনি সৈন্য চান, আমি দেব! যদি আমাদের স্বাধীনতা দেন তাহলে আমি ছমাস ওকালতি ব্যবসা বন্ধ রেখে পর্য্যাপ্ত সেনাবাহিনী গড়ে দেব।"

কংগ্রেসের দুটি দলের মধ্যে ফাটল আরও বিস্তৃত হয়ে গেল। ভারত সচিব ও গভর্ণর জেনারেলের রিপোর্ট ব্রিটিশ সরকারের অনুমোদন লাভ করার পর শাসন সংস্কার সম্বন্ধে একটি খসড়া প্রস্তাব তাঁদের দুজনের স্বাক্ষর সমেত ৮ই জুলাই ১৯১৮ তারিখে প্রকাশিত হয়। এই ঘোষণার তিনদিন পরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির এক বিশেষ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। এই অধিবেশনে নরমপন্থীরা ছিলেন সংখ্যালঘু। অধিবেশনে এই খসড়া প্রস্তাব সম্বন্ধে হতাশা প্রকাশ করা হয়। তবে এ বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য ২৯শে আগষ্ট ১৯১৮ তারিখে বম্বেতে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশন আহ্বান করা হয়। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রস্তাবটি গ্রহণ করেন কিন্তু শ্রী দাস বলেন যে প্রস্তাবটি আদৌ পর্য্যাপ্ত নয়। নির্বাচনের ফলে চিত্তরঞ্জনের সমর্থকগণ নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি ও বিভিন্ন প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটিতে নিরঙ্কুশ সংখ্যা গরিষ্ঠতা লাভ করেছিলেন।

সুরেন্দ্রনাথ কংগ্রেস ত্যাগ করে গঠন করলেন লিবারেল লীগ। তিনিই হলেন লীগের সভাপতি। তাঁর বিদায় গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে চিত্তরঞ্জন বাংলা কংগ্রেসের প্রধান নেতা হয়ে দাঁড়ালেন। কংগ্রেসের সংগঠনের বেশীর ভাগ কাজ তাঁর ঘাড়ে পড়ল। প্রধানত তাঁরই চেষ্টায় কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনের স্থান বম্বেতে নির্বাচিত হল। বিশেষ অধিবেশনের সভাপতি নির্বাচিত হলেন সৈয়দ হাসান ইমাম। এই অধিবেশনের খরচ মেটাবার জন্য চিত্তরঞ্জন দশ হাজার টাকা দান করেন। উদারতা তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ছিল বলে তিনি যত বেশী

সম্ভব লোককে নিজের সাথী করতে চেয়েছিলেন। কংগ্রেসের কার্য্যকলাপে যোগদানের জন্য নরমপন্থীদের আরও একবার সুযোগ দেওয়া উচিত বলে তিনি মনে করেন। কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে গৃহীত প্রস্তাব রচনায় চিত্তরঞ্জনের যথেষ্ট হাত ছিল। এই প্রস্তাবে বলা হয়, "ভারতে দায়িত্বশীল সরকার প্রবর্তনের জন্য ভারত সচিব ও বড়লাটের প্রয়াসের প্রশংসা কংগ্রেস করছে। যদিও কংগ্রেস স্বীকার করে যে তাঁদের প্রস্তাবে অগ্রগতি সূচিত হয়েছে, কংগ্রেসের মতে প্রস্তাবগুলি সামগ্রিকভাবে হতাশকর ও অসন্তোষ-জনক।"

কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশন ১৯১৮ সালের ডিসেম্বর মাসে পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যের সভাপতিত্বে দিল্লীতে অনুষ্ঠিত হয়। স্বায়ত্ব-শাসন বিষয়ে বম্বেতে গৃহীত প্রস্তাবটি দিল্লী অধিবেশনে পুনরায় সমর্থিত হয় এবং ব্রিটিশ ভারতের সকল প্রদেশে অবিলম্বে পূর্ণ দায়িত্বশীল সরকার প্রতিষ্ঠার জন্য ব্রিটিশ সরকারকে বলা হয়। এই প্রস্তাবটি পেশ করেন শ্রী বি. সি. চক্রবর্তী, সমর্থন করেন শ্রীবিঠলভাই প্যাটেল।

শ্রীমতী বেশান্ত, শ্রী শ্রীনিবাস শাস্ত্রী, শ্রী বি. এন. শর্মা এবং আরও কয়েকজন নরমপন্থী নেতা এই অধিবেশনে যোগদান এবং কয়েকটি সংশোধনী প্রস্তাব উত্থাপন করেছিলেন। শ্রী শাস্ত্রী প্রস্তাব করেন যে, মূল প্রস্তাবের বয়ান থেকে "হতাশকর ও অসন্তোষজনক" শব্দ দুটি বাদ দেওয়া হোক। তাছাড়া, কোন সময় বেঁধে দেওয়ার পক্ষপাতী তিনি ছিলেন না। শ্রীমতী বেশান্ত মনে করেন বম্বেতে গৃহীত প্রস্তাবটি পুনরায় গৃহীত হতে পারে কিন্তু তিনিও সময় বেঁধে দেওয়ার বিপক্ষে ছিলেন। ধীরে ধীরে ও সাবধানতার সঙ্গে এগোবার পরামর্শ তিনি দেন। তাড়াহুড়ো কিছু না করার জন্য তিনি সাবধান করে দেন।

কংগ্রেসের এই অধিবেশনে উপস্থিত থাকার জন্য চিত্তরঞ্জন শ্রীমতী বেশান্ত ও শ্রী শাস্ত্রীকে ধন্যবাদ জানান। কিন্তু তিনি বলেন, তাঁদের অভিমত গ্রহণে তিনি অক্ষম। চিত্তরঞ্জন বলেন, ভারত আমলাতন্ত্রের দ্বারা শাসিত হচ্ছে, স্বায়ত্বশাসন প্রবর্তিত হলে এই আমলাতান্ত্রিক শাসনের অবসান ঘটবে। সময় বেঁধে না দিলে ভারতের প্রকৃত শাসক সিভিল সার্ভিস দ্রুত গতিতে স্বায়ত্বশাসন প্রবর্তন করে নিজেদের প্রভুত্ব হারাতে কোনদিনই চাইবে না। "হতাশকর ও অসন্তোষজনক" শব্দ দুটি বাদ দেওয়ার জন্য শ্রী শাস্ত্রীর প্রস্তাবের বিরুদ্ধে চিত্তরঞ্জন আপত্তি জানান। তিনি প্রতিনিধিদের বলেন, "আপনারা বুকে হাত দিয়ে এই প্রশ্নের জবাব দিন, আপনারা অসন্তুষ্ট হয়েছেন না, হতাশ হয়েছেন।"

শ্রী শাস্ত্রীর যুক্তি ছিল, যেহেতু দেশ কার্টিস পরিকল্পনা স্বীকার করে নিয়েছে, স্বায়ত্বশাসনের জন্য চাপ দেওয়া কংগ্রেসের উচিত হবে না। শ্রী দাস জবাব দিলেন, ভারতে কেউই এই পরিকল্পনা অনুমোদন করে নি। প্রতিনিধিগণ প্রবল উল্লাসের সঙ্গে তাঁকে সমর্থন জানান।

এবার শ্রীমতী বেশান্তের যুক্তি খণ্ডন করলেন চিত্তরঞ্জন। শ্রীমতী বেশান্ত আপোষ করার ওপর জোর দিয়েছিলেন। তার জবাবে শ্রী দাস বলেন, "শ্রীমতী বেশান্ত এ মামলার বাইরে। এই চুক্তিতে কোন দল ছিল? নরমপন্থীরা দল হিসেবে কংগ্রেসে যোগ দেন নি। অতএব নরমপন্থীরাই এই চুক্তি ভেঙ্গেছেন। যিনি নিজে চুক্তি ভাঙ্গেন অন্যপক্ষকে চুক্তি রক্ষার নির্দেশ দেওয়ার অধিকার তাঁর নেই। আমি আবার জিজ্ঞাসা করছি —।"

শ্রীমতী বেশান্ত— চুক্তি সম্বন্ধে আমি কিছু বলিনি। আমি আপোষের কথা বলেছিলাম।

শ্রী দাস— আমার ভুল স্বীকার করছি। শ্রীমতী বেশান্ত বলছেন তিনি চুক্তি শব্দটি প্রয়োগ করেন নি, তিনি আপোষ শব্দটি ব্যবহার করেছেন। ভাল কথা। এখন আমার প্রশ্ন, আপোষ কাদের মধ্যে? আপোষ বলতে দুটি দল বোঝায়—নরমপন্থী ও জাতীয়তাবাদী। কয়েকজন নরমপন্থী যদি যোগ দিয়ে থাকেন তাহলে তাঁরা কারা? জনগণের অধিকার বিলিয়ে দেওয়ার অধিকার তাঁদের কে দিল? আমার প্রসঙ্গে বলতে পারি, নরমপন্থীরা সামগ্রিকভাবে আমাদের সঙ্গে যোগ দেবেন, এই আশায় আমার দলের কতগুলি দাবী ছেড়ে দিয়ে আমি ঐ আপোষে যোগ দিয়েছিলাম। নরমপন্থীরা আমাদের সঙ্গে যোগ দেন নি। আমরা কি এখনও সেই আপোষের সর্ত মেনে চলব আর আমাদের জন্মগত অধিকার বিকিয়ে দেব যেহেতু নরমপন্থীরা আমাদের সঙ্গে যোগ দিচ্ছে না? (সমস্বরে 'না' 'না' ধ্বনি)। বম্বেতে কংগ্রেস অধিবেশন অনুষ্ঠিত হওয়ার পর দেশ তার অভিমত ব্যক্ত করেছে বম্বেতে, মাদ্রাজে, যুক্তপ্রদেশে, বাংলাদেশে ও অন্যত্র। একটি স্থায়ী চুক্তি বা আপোষ বা রফা করার ব্যক্তিগত অধিকার কি আপনার আছে? যেহেতু আপনি এই আপোষ করেছেন আপনি কি চিরকাল তার সর্তাধীন থাকতে পারেন? আমি বলছি, এ হল ধ্বংসাত্মক নীতি, আমি তা মানব না। সারা দেশের এই হল দাবী। আপনাদের কর্তব্য করার জন্য আমি আহ্বান জানাচ্ছি, সমস্ত সংশোধনী প্রস্তাব আপনারা পুরোপুরি অগ্রাহ্য করুন—।"

ফলে সমস্ত সংশোধনী প্রস্তাব বাতিল এবং মূল প্রস্তাবটি বিপুল সংখ্যাধিক্যে গৃহীত হয়। শ্রী দাসের বাগ্মিতার ফলেই তা হয়েছিল।

প্রকাশ্য অধিবেশনের আধা অনুষ্ঠিত সাব-কমিটির বৈঠকে আলোচনার নিম্নরূপ বিবরণ দিয়েছেন অধ্যাপক জিতেন্দ্র লাল বন্দ্যোপাধ্যায়—

"কংগ্রেসের দ্বিতীয় দিনের অধিবেশনের পরে বিষয় কমিটির বৈঠক নির্দিষ্ট সময়ে বসে। আলোচনা ও তর্কাতর্কি মাঝরাত পর্য্যন্ত চলে। সমস্ত আলোচনা চলে শাসন সংস্কারের প্রস্তাবকে কেন্দ্র করে। আমাদের নেতা ছিলেন দেশবন্ধু। অন্যপক্ষে ছিলেন বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি—শ্রীমতী বেশান্ত, শ্রীনিবাস শাস্ত্রী এবং সভাপতি পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য স্বয়ং। বিকেলের দিকে চিত্তরঞ্জন উঠে দাঁড়ালেন। তাঁর অপূর্ব বাগ্মিতা দিয়ে তিনি বিরোধীপক্ষের যুক্তি টুকরো টুকরো করে উড়িয়ে দিলেন। এ জয়লাভ তাঁরই। বৈঠকের পরে আমরা যখন বাইরে আসছিলাম ত্রিবাঙ্কুরের প্রবীণ দেওয়ান শ্রী ভি. পি. মাধব রাওয়ের সঙ্গে দেখা হল। তাঁর বার্দ্ধক্য সত্বেও দিল্লীর প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় বাইরের বারান্দায় তিনি দেওয়ালে ঠেস দিয়ে বসেছিলেন। তিনি আমাকে তাঁর কাছে বসতে বললেন। তিনি বললেন, 'শ্রী দাস কি সুন্দর তেজের সঙ্গে বললেন। এরকম দৃশ্য কখনও দেখিনি'।"

কংগ্রেসের সুরে কোন ধরণের পরিবর্তন ঘটেছিল তার আভাস পাওয়া যায়, লণ্ডনে যৌথ পার্লামেণ্টারি কমিটির সামনে ভারতের বক্তব্য পেশ করার জন্য কংগ্রেস কর্তৃক লোকমান্য বাল গঙ্গাধর টিলককে নির্বাচনের মধ্যে—।

ষষ্ঠ অধ্যায়

অমৃতসর কংগ্রেস ও জালিয়ানওয়ালাবাগ

১৯১৯ সালে পরপর একটানা কতগুলি ঘটনা ঘটল যার ফলে ভারতীয় ইতিহাসের মোড় ঘুরে গেল। প্রথম উল্লেখযোগ্য ঘটনা, ১৮ই মার্চ ১৯১৯ তারিখে রাওলাট আইন গৃহীত হল। রাজনৈতিক আন্দোলনের কণ্ঠরোধ ও রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে কার্য্যকলাপ বন্ধ করার জন্য এই আইন ভারত সরকারকে অসাধারণ ক্ষমতা দিল। বিনা বিচারে যে কোন লোককে গ্রেপ্তার ও আটকের অধিকার এই আইনে দেওয়া হয়। তাছাড়া ভারতীয় সাক্ষ্যদান আইন—যাতে পুলিস অফিসারকে প্রদত্ত বিবৃতি সাক্ষ্য হিসেবে আদালতে গৃহীত হত না—বাতিল করা হল রাওলাট আইনে।

রাওলাট বিল গ্রহণের বিরুদ্ধে তীব্র আপত্তি সারা দেশে সোচ্চার হয়ে উঠল। এই বিলের বিরুদ্ধে মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে আন্দোলন শুরু হল। মহাত্মা গান্ধী নির্দেশ দেন যে আইনটি বড়লাট লর্ড চেমসফোর্ডের অনুমোদন লাভের পর দ্বিতীয় রবিবারে ৬ই এপ্রিল সারা দেশে সত্যাগ্রহ পালন করা হবে। মহাত্মা গান্ধীর কাছে সত্যাগ্রহ ছিল আত্মশুদ্ধি ও প্রায়শ্চিত্তের জন্য ধর্মীয় আন্দোলন। তিনি ঘোষণা করলেন, কোন আইন সত্যাগ্রহী বা অসামরিক প্রতিরোধকারীর কাছে অন্যায় মনে হলে তাঁর কর্তব্য হল তা অস্বীকার করা। এজন্য সেই আইন ভঙ্গ করে তাঁর শাস্তি ভোগ করা উচিত।

৬ই এপ্রিল, ১৯১৯ সারা ভারতে হরতাল পালন করা হয়। চিত্তরঞ্জন মহাত্মা গান্ধীর এই আহ্বানের শুধু রাজনৈতিক দিকটা

দেখেই মুগ্ধ হন নি, তিনি গান্ধীজীর মধ্যে আধ্যাত্মিক শক্তির বিমূর্ত রূপ দেখেছিলেন। ৬ই এপ্রিল সন্ধ্যায় কলিকাতায় এক বিরাট জনসমাবেশে ভাষণকালে তিনি বলেন, "সত্যাগ্রহ হল আধ্যাত্মিক শক্তি। এ হল প্রেমের শক্তি। ভালবাসা দিয়ে আত্মাকে জয় করব। আমরা স্বার্থপরতা, ঘৃণা, দ্বেষ ত্যাগ করব, আমরা হব আত্মসংযমী। এ বাণী নিঃসন্দেহে মহাত্মা গান্ধীর কিন্তু এ হল ভারতের কাল-বন্দিত বাণী, এ বাণী প্রহ্লাদের, মীরাবাঈয়ের, বশিষ্ঠের। স্বাধীনতা আন্দোলনে বিরাট বাধা হল এই রাওলাট আইন। এ বাধা না সরালে আমরা স্বাধীনতা পাব না। সেজন্য আমাদের মধ্যে দেশপ্রেম জাগাতে হবে, আমাদের সত্যাগ্রহী হতে হবে, ঘৃণা, দ্বেষ ত্যাগ করতে হবে। ভাইগণ, উঠুন নিজেদের তৈরি করুন, একথা নিশ্চয়ই জানবেন যে, দুর্বল প্রকৃতির লোকদের দ্বারা স্বাধীনতা লাভ করা যায় না।"

তিনি আরও বলেন, "এই বিলগুলি স্বাধীনতা নীতির পরিপন্থী ও ব্যক্তির প্রাথমিক অধিকার লোপ করার জন্য রচিত হয়েছে। এই বিলগুলি যদি আইনের রূপ নেয় তাহলে সেগুলি প্রত্যাহৃত না হওয়া পর্য্যন্ত আমি সেই আইন ও অনুরূপ অন্যান্য আইন মানতে অস্বীকার করব। আমি আরও ঘোষণা করছি যে এই আইন অমান্য আন্দোলনকালে আমি বিশ্বস্ততার সঙ্গে সত্য অনুসরণ করব এবং জীবন, ব্যক্তি ও সম্পত্তির প্রতি কোনরূপ হিংসাত্মক কাজে বিরত থাকব।"

সে সময় মহাত্মা গান্ধী বম্বেতে ছিলেন। লাহোর যাবার উদ্দেশ্যে ৭ই এপ্রিল তিনি দিল্লী অভিমুখে রওনা হন। পাঞ্জাব সরকার তাঁকে রাস্তায় আটকান এবং পাঞ্জাবে তাঁর প্রবেশ নিষিদ্ধ করে দেন। মহাত্মা গান্ধী কর্তৃপক্ষদের জানান যে তিনি আমন্ত্রিত হয়ে পাঞ্জাবে যাচ্ছেন। তিনি তাঁদের আশ্বাস দেন, যে গোলমাল বাধানো তাঁর

উদ্দেশ্য নয়, বরং জনগণকে শান্ত করার জন্যই তিনি সেখানে যাচ্ছেন। সরকার কিন্তু তাঁর কথায় কর্ণপাত করলেন না।

সরকারের এই কাজের ফলে জনতা আরও উত্তেজিত হয়ে উঠল। সরকার দমননীতি প্রয়োগ করলেন যার পরিণতি স্বরূপ জালিয়ানওয়ালা বাগের বীভৎস হত্যাকাণ্ড ও পাঞ্জাবে সামরিক আইন জারী।

তদানীন্তন সরকারের প্রতি ভারতের সাধারণ মানুষের দৃষ্টিভঙ্গীর আমূল পরিবর্তন জালিয়ানওয়ালা বাগ। তার আগে পর্য্যন্ত সরকারের সদিচ্ছায় বেশীর ভাগ লোকেরই আস্থা ছিল। নিরীহ মানুষের হত্যাকাণ্ড তারপর নির্বিচারে বেত্রাঘাত ও অন্যান্য অবমাননাকর ব্যবস্থা সারা জাতিকে স্তম্ভিত করে দেয়। জেনারেল ডায়ার এমন কি রাজভক্ত প্রজাদেরও বর্বর শাস্তি দিতে দ্বিধা করেন নি। পাঞ্জাবের ছোট লাটের কাছ থেকে তিনি তাঁর সকল অমানুষিক কাজের সমর্থন পেয়েছিলেন বলে লোকে আরও ক্ষেপে যায়। এই বর্বর ব্যবস্থায় জনগণের ত্রাস ও তীব্র ঘৃণা প্রকাশ পেল নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির কণ্ঠে। কমিটি এ ব্যাপারে তদন্ত করার জন্য একটি রাজকীয় কমিশন গঠনের দাবী করেন। কিন্তু তার বদলে ভারত সরকার লর্ড হাণ্টারের সভাপতিত্বে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করেন। এই কমিটিতে দুজন ভারতীয় ছিলেন, স্যার চিমনলাল শীতলবাদ ও পণ্ডিত জগৎনারায়ণ।

প্রথমে স্থির হয়েছিল, চিত্তরঞ্জন এই তদন্ত কমিটির অধিবেশনে উপস্থিত থেকে সাক্ষীদের সওয়াল করবেন। পাঞ্জাব সরকার তা অনুমোদন করেন নি। তারপর প্রস্তাব করা হয় লালা হরকিষণ লাল, পণ্ডিত রামভুজ দত্ত, ডাঃ সৈফুদ্দিন কিচলু ও অন্যান্য যাঁরা গ্রেপ্তার হয়েছিলেন তাঁদের সকলকে সাক্ষ্যদানে অনুমতি দিতে হবে।

এটি ন্যায্য অনুরোধ, কারণ স্যার মাইকেল ও'ডায়ার, জেনারেল ডায়ার ও কর্ণেল জনসনকে সাক্ষ্যদানের জন্য আহ্বান জানান হয়েছিল। সরকার এ অনুরোধও রক্ষা করেন নি। চিত্তরঞ্জন ও মতিলাল নেহেরু তারপর প্রস্তাব করেন যে পাঞ্জাবের উক্ত নেতাদের বিবৃতি অন্তত নেওয়া হোক। কিন্তু তাও প্রত্যাখ্যান করা হয়। ভারত সরকার ও ভারত সচিবকে এ বিষয়ে অনুরোধ জানান হলে তাঁরাও অনুমোদন জানান নি। তখন কংগ্রেসী নেতারা স্থির করেন যে, হাণ্টার তদন্ত কমিটি বর্জন করা ছাড়া আর কোন পথ নেই।

এর পরে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে একটি স্বাধীন তদন্ত কমিটি গঠন করেন। এই কমিটিতে সদস্য ছিলেন চিত্তরঞ্জন দাস, মতিলাল নেহেরু, আব্বাস তায়েবজী ও ডাঃ জয়াকর। এই কমিটিতে থাকার জন্য সকল সদস্যকে বিশেষ করে চিত্তরঞ্জন ও মতিলালকে প্রভূত ক্ষতি সহ্য করতে হয়। সাড়ে তিনমাসেরও বেশী সময় তাঁদের দুজনকে ওকালতি বন্ধ রাখতে হয়। শ্রী দাস প্রায় পঞ্চাশ হাজার টাকা খরচ করেন। গান্ধীর ভাষায় তিনি 'রাজার মত' থাকতেন। প্রদত্ত সাক্ষ্য বিশ্লেষণ এবং সামরিক আইনের দোষ ত্রুটি নির্ণয়ে অসামান্য দক্ষতার পরিচয় দেন। তিনি সব বিষয়ে গান্ধীজীর সঙ্গে একমত হন নি কিন্তু প্রকৃত গণতান্ত্রিকের মত তিনি বলেন, "আমি আপনার সঙ্গে সব বিষয়ে একমত নাও হতে পারি কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠের সিদ্ধান্ত নতমস্তকে স্বীকার করে নেব।" জহরলাল নেহেরু শ্রী দাস সম্বন্ধে নিজের মনোভাব ব্যক্ত করতে গিয়ে বলেন, "এই প্রথম তাঁর সঙ্গে এবং তাঁর অধীনে কাজ করবার সুযোগ পেয়েছিলাম। এ অভিজ্ঞতা আমার কাছে বিশেষ মূল্যবান। তাঁর প্রতি আমার শ্রদ্ধা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছিল।"

ঠিক এরপরেই লর্ড সেলবোর্নের সভাপতিত্বে গঠিত যৌথ পার্লামেণ্টারী কমিটির সামনে ভারতের দাবী পেশ করবার জন্য

লণ্ডনে একটি প্রতিনিধি দল পাঠানোর সিদ্ধান্ত কংগ্রেস করে। লোকমান্য টিলক এই প্রতিনিধি দলের অন্যতম সদস্য ছিলেন। ভারতীয় প্রতিনিধি দল মিঃ মণ্টেগু ও অন্যান্য বিশিষ্ট বৃটিশ রাজনৈতিকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। ১৯১৯ সালের ২৪শে ডিসেম্বর ভারতীয় শাসন সংস্কার আইন—মণ্টফোর্ড সংস্কার নামে অধিক সুপরিচিত—গৃহীত হয়। টিলক তখন জাহাজে দেশে ফিরছেন। মিঃ মণ্টেগু জনগণকে এই সংস্কার ব্যবস্থা কার্য্যকর করতে সাহায্য করার জন্য আবেদন জানান। উপযুক্ত আবহাওয়া সৃষ্টির উদ্দেশ্যে সকল রাজনৈতিক বন্দীকে মুক্তি দেবার প্রতিশ্রুতি তিনি দেন।

এই আইন গৃহীত হওয়ার কয়েক দিনের মধ্যেই অমৃতসরে কংগ্রেসের অধিবেশন বসে। সভাপতিত্ব করেন মতিলাল নেহেরু এবং কংগ্রেসের সকল বিশিষ্ট নেতা এই অধিবেশনে যোগদান করেন। সেখানে ছিলেন, টিলক, গান্ধী, দাস ও মদনমোহন মালব্য, ছিলেন আলী ভ্রাতৃদ্বয়, ডাঃ কিচলু, লালা হরকিষণলাল, পণ্ডিত রামভুজ দত্ত এবং অন্যান্য যাঁরা ১৯১৯ সালে ভারত সরকার আইন গৃহীত হবার ফলে ব্যাপক হারে সরকারের ক্ষমালাভ করেছিলেন। সভার প্রারম্ভে মতিলাল নেহেরু নরমপন্থী নেতাদের কংগ্রেসে পুনরায় ফিরে আসবার জন্য আবেদন জানান। তিনি বলেন, বিদীর্ণ হৃদয় পাঞ্জাব তাঁদের ডাকছে। তাঁরা কিন্তু এ ডাকে সাড়া দেন নি। কারন তাঁরা ইতিমধ্যে ঠিক করেছিলেন যে সংস্কার ব্যবস্থাকে কার্য্যকরী করতে তাঁরা সাহায্য করবেন।

চিত্তরঞ্জন এই অধিবেশনে একটি প্রস্তাব আনেন যাতে তিনি সংস্কার ব্যবস্থাকে অসন্তোষজনক, হতাশাব্যঞ্জক ও ভারতের পক্ষে যথেষ্ট নয় বলে ঘোষণা করেন। আত্মনির্দ্ধারণ নীতির ভিত্তিতে ভারতের পূর্ণ দায়িত্বশীল সরকার প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে অনতিবিলম্বে ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য এই প্রস্তাবে পার্লামেণ্টকে আহ্বান

জানানো হয়। টিলক ও বিপিনচন্দ্র পাল প্রস্তাবটি সমর্থন করেন এবং সেটি বিষয় কমিটি কর্তৃক গৃহীত হয়।

প্রকাশ্য অধিবেশনে প্রস্তাবটি পেশ করা হলে মহাত্মা গান্ধী 'হতাশাব্যঞ্জক' শব্দটি সম্বন্ধে আপত্তি করেন। তাঁর যুক্তি হল, সংস্কারব্যবস্থা যদি 'হতাশাব্যঞ্জক' হয়ে থাকে সে সম্বন্ধে আলোচনা করা আদৌ উচিত হবে না। সেজন্য তিনি সংশোধনমূলক এক প্রস্তাবে বলেন, পূর্ণ দায়িত্বশীল সরকারের দ্রুত প্রতিষ্ঠার জন্য জনগণের উচিত সংস্কার ব্যবস্থাকে কার্য্যকরী করা।

চিত্তরঞ্জন গান্ধীজীর এই সংশোধন প্রস্তাবের মধ্যে পিছিয়ে আসার মনোভাব দেখতে পান এবং তার তীব্র প্রতিবাদ করেন। তিনি মনে করেন সংস্কার ব্যবস্থা প্রত্যাখ্যান এবং নতুন কোন আইনের জন্য দাবী করতে হবে। টিলকও সেই একই মত পোষণ করেন। অন্যদিকে, গান্ধীজীকে সমর্থন জানান মদন মোহন মালব্য ও মহম্মদ আলি জিন্না।

দু'দিন ধরে এ বিষয়ে আলোচনা চলে। শেষে একটি মিটমাট হয়। যাতে 'অসন্তোষজনক, হতাশাব্যঞ্জক ও ভারতের পক্ষে যথেষ্ট নয়' শব্দগুলি বজায় থাকে কিন্তু সেই সঙ্গে আরেকটি পংক্তি যোগ করা হয়—"পূর্ণ দায়িত্বশীল সরকার প্রতিষ্ঠা না হওয়া পর্য্যন্ত কংগ্রেস বিশ্বাস করে যে জনগণ সংস্কারব্যবস্থা কার্য্যকরী করতে যতটা সম্ভব সাহায্য করবে যাতে পূর্ণ দায়িত্বশীল সরকার প্রতিষ্ঠা ত্বরান্বিত হয়। এবং সংস্কার ব্যবস্থা প্রণয়নে পরিশ্রম করার জন্য কংগ্রেস স্যার ই. এস. মণ্টেগুকে ধন্যবাদ জানাচ্ছে।"

এই মিটমাট কেমন করে হলো তার নিম্নরূপ বিবরণ গান্ধীজী দিয়েছেন—

"সংস্কারব্যবস্থা ত্রুটিপূর্ণ হলেও অনুমোদন করা যায় বলে আমি মনে করেছিলাম। অন্যদিকে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন এই দৃঢ়মত পোষণ

করেন যে, সংস্কার ব্যবস্থা একেবারে অপর্য্যাপ্ত ও অসন্তোষজনক বলে বর্জন করা উচিত। লোকমান্য মোটামুটি নিরপেক্ষ ছিলেন। আমি আমার প্রস্তাবটি রচনা করে শঙ্কিত হৃদয়ে পেশ করলাম। পণ্ডিত মালব্যজী ও মিঃ জিন্না আমাকে সমর্থন জানান। লক্ষ্য করলাম আমাদের মতভেদের মধ্যে তিক্ততার কিছুমাত্র চিহ্ন নেই এবং আমাদের ভাষণে নিছক যুক্তি ছাড়া আর কিছু না থাকলেও জনগণ এই মতভেদটাই সহ্য করতে পারছিল না। এটি তাদের কাছে বেদনাদায়ক হয়েছিল। তারা ঐক্যমত চাইছিল।"

"আমরা যখন বক্তৃতা করছিলাম তখনই নেতারা আমাদের মধ্যে মিটমাট করার জন্য নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করছিলেন। এই ফাঁক ভরাট করার জন্য মালব্যজী কোনরকম চেষ্টার ত্রুটি করেন নি। ঠিক সেই সময় সিন্ধুদেশের জনৈক প্রতিনিধি জয়রামদাস তাঁর সংশোধনমূলক প্রস্তাবটি আমার হাতে দিয়ে নম্রতার সঙ্গে আমাকে অনুরোধ করলেন এই মতভেদের উভয়সঙ্কট থেকে প্রতিনিধিদলকে বাঁচানর জন্যে। তাঁর সংশোধনমূলক প্রস্তাবটি দেখে আমি মুগ্ধ হলাম। তাই দেখে লোকমান্য বল্লেন, 'চিত্তরঞ্জন যদি ত্রুটি অনুমোদন করেন আমার কোন আপত্তি নেই'। চিত্তরঞ্জন শেষে নরম হলেন এবং শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পালের দিকে তাকালেন অনুমোদনের জন্য। মালব্যজীর হৃদয় আশাপূর্ণ হয়ে উঠল। দেশবন্ধু নিশ্চিত হাঁ বলার আগেই মালব্যজী প্রস্তাবের কাগজটি ছিনিয়ে নিয়ে চীৎকার করে উঠলেন, 'ভাইগণ, আপনারা শুনে আনন্দিত হবেন যে আপোষ হয়েছে। তারপর যা ঘটলো তা বর্ণনা করা সম্ভব নয়। হাততালিতে প্যাণ্ডেল ভেঙ্গে পড়লো। শ্রোতৃবৃন্দের কিছুক্ষণ আগের গম্ভীর মুখগুলি আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠল।"

অমৃতসর কংগ্রেস চিত্তরঞ্জন ও মহাত্মা গান্ধী উভয়েরই বিজয় সূচনা করল। বিধান পরিষদে বাধাদান ও অসহযোগ সম্বন্ধে

শ্রী দাসের অভিমত এই অধিবেশনে স্পষ্ট জানা গেল।

১৯২০ সালের ২০শে ফেব্রুয়ারী বেসরকারী পাঞ্জাব হাঙ্গামা তদন্ত কমিটির বৈঠক বেনারসে অনুষ্ঠিত হয়। কমিটির সকল সদস্য একমত হন যে নারীর উপর বলাৎকার সমেত অমানুষিক অত্যাচার করা হয়েছে। কমিটি দাবী করেন, লর্ড চেমসফোর্ডকে পদত্যাগ করতে হবে, স্যার মাইকেল ও'ডায়ারকে দেশে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে হবে, জেনারেল ডায়ারকে শাস্তি দিতে হবে। আর সামরিক আইন চালু থাকা কালে জরিমানা স্বরূপ যে টাকা আদায় করা হয়েছিল তা ফেরৎ দিতে হবে।

এমন কি সরকারী হান্টার কমিটিও সংশ্লিষ্ট অফিসারদের অপরাধ স্খালন করতে পারে নি। সংখ্যাগরিষ্ঠ তিনজন বৃটিশ সদস্যের রিপোর্টে অপকর্ম হালকা করে দেখান হয়। কিন্তু শীতলবাদ ও জগৎনারায়ণের রিপোর্ট কংগ্রেস তদন্ত কমিটির রিপোর্টের সঙ্গে মিলে যায়।

বৃটেনে কিছুলোক এবং ভারতে বৃটিশদের একটি বড় শাখা জেনারেল ডায়ার ও কর্ণেল জনসনের অনুকূলে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। ভারত সরকার বেসরকারী তদন্ত কমিটির তথ্য এবং হান্টার কমিটির সংখ্যালঘু রিপোর্ট প্রত্যাখ্যান করেন। তার বদলে সংখ্যাগুরু রিপোর্টটি গৃহীত হয় এবং জেনারেল ডায়ার তাঁর বিরুদ্ধে আনীত সমস্ত অভিযোগ থেকে মুক্তি পান। মহাত্মা গান্ধী এতে মর্মাহত হয়ে সরকারকে 'শয়তান' বলে উল্লেখ করেন।

এই সময় আর একটি সমস্যা গান্ধীজীকে বিশেষ উদ্বিগ্ন করে তুলেছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে তুরস্ক মিত্রপক্ষের বিরুদ্ধে জার্মানী ও অষ্ট্রীয়ার হয়ে লড়েছিল। ভারতীয় মুসলমান মিত্রপক্ষকে সমর্থন করেছিলেন একসর্ত্তে যে তুর্কীদের প্রতি কোন অবিচার করা হবে না।

সে প্রতিশ্রুতি রক্ষিত হয় নি। যুদ্ধের পরে তুরস্ককে কয়েক খণ্ডে ভাগ করে ফেলা হয়। রাজধানী কনষ্টানটিনোপলকে সরিয়ে এশিয়ার মাটিতে আনার প্রস্তাব করা হয়। মুসলমানদের বহু পবিত্রস্থান খৃষ্টানদের আধিপত্যে চলে যায়। এ সবের ফলে ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে প্রবল উত্তেজনার সঞ্চার হয়। এবং আলী ভ্রাতৃদ্বয়, মৌলানা আবুল কালাম আজাদ, হাকিম আজমল খাঁ ও অন্যান্যরা খিলাফত আন্দোলন নামে এক আন্দোলন সুরু করেন। ১৯২০ সালের ৩০শে মে অনুষ্ঠিত এক সম্মেলনে সরকারের সঙ্গে অসহযোগিতা করার প্রস্তাব গৃহীত হয়। গান্ধীজী মুসলমানদের এই উদ্দেশ্য সমর্থন করেন এবং তুর্কীদের প্রতি সুবিচার করার ব্যবস্থা করার জন্য বড়লাটকে অনুরোধ জানিয়ে পত্র লেখেন। চিঠিটি উপেক্ষিত হয়। এবং এই অবজ্ঞা অগ্নিতে ঘৃতাহুতি স্বরূপ হল। কংগ্রেসের একটি সাব কমিটি গঠিত হয়। পাঞ্জাবের অত্যাচার ও তুরস্কের প্রতি অবিচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাবার জন্য এ সাব কমিটি সুপারিশ করেন যে, সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও আদালত বর্জন করতে হবে। বিধান পরিষদ বর্জন করার প্রস্তাব সাব কমিটির রিপোর্টে ছিল না। কিন্তু মহাত্মা গান্ধী তা কংগ্রেস কার্য্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত করার জন্য নির্দেশ দেন। এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবার জন্য ১৯২০ সালের ৪ঠা সেপ্টেম্বর কলকাতায় কংগ্রেসের এক বিশেষ অধিবেশন আহ্বান করা হয়।

এই অধিবেশনে সভাপতিত্ব করবার জন্য লালা লাজপত রায়কে আমন্ত্রণ জানানো হয়। চিত্তরঞ্জন দাস ও মতিলাল নেহেরু এই সময় ডুমরাঁও মামলার জন্য আরাতে ছিলেন। শ্রী দাস গোড়া থেকেই বিধান পরিষদ বর্জনের বিপক্ষে ছিলেন। তিনি তার বদলে প্রস্তাব করেন যে ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য একটি ভারতীয় প্রতিনিধি দল পাঠানো হোক। এই প্রতিনিধি দল বাঞ্ছিত ফল লাভে ব্যর্থ হলে কংগ্রেস সমস্ত স্কুল কলেজ ও আদালত বর্জন

করবে। প্রচলিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বর্জন করে জাতীয় স্কুল ও কলেজ প্রতিষ্ঠা করাকে চিত্তরঞ্জন বিশেষ জোরের সঙ্গে সমর্থন করতেন। কিন্তু তিনি মনে করতেন যে বিধান পরিষদ বর্জন জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী হবে।

এই মতবাদের কারণ স্বরূপ চিত্তরঞ্জন বলেন, "এগুলি বৃটিশ সরকারের দান নয়। ব্রিটিশ সরকারের হাত মুচড়ে আমরা সংস্কার ব্যবস্থা আদায় করেছি। আমি পরিষদগুলিকে স্বরাজ লাভের হাতিয়ার করতে চাই। পূর্ণ স্বরাজ লাভের জন্য আপনাদের হাতের এই অস্ত্র প্রয়োগ করুন। পঁয়ত্রিশ বছরের শ্রম ও আন্দোলনের মাধ্যমে আপনারা যা অর্জন করেছেন তা নিজেদের সম্পূর্ণ অবরুদ্ধ রেখে বিসর্জন দেবেন না।"

তিনি জোরের সঙ্গে ঘোষণা করেন, "পূর্ণ স্বায়ত্ত-শাসনের জন্য আমার দাবীতে আমি কারুর কাছে নতি স্বীকার করব না। ১৯১৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে বম্বেতে বিশেষ অধিবেশনে আমি সেই দাবীই করেছিলাম। কিন্তু নরমপন্থীদের আমাদের সঙ্গে থাকার পূর্ণ সুবিধা দেওয়ার উদ্দেশ্যে দাবীর সুর কিছুটা নরম করেছিলাম। নরমপন্থীরা আমাদের ছেড়ে গেলেন। দিল্লীতে দাবীর মাত্রা আরও একটু বাড়ান হল। তারপর পাঞ্জাবের ঘটনা ও খালিফার প্রতি অবিচার। তাহলে আজ দাবীর মাত্রা হ্রাস করা হবে কেন? আমি অন্তত এ বিষয়টি কিছুতেই মানব না।"

জহরলাল নেহেরু এ প্রসঙ্গে লেখেন "এই প্রস্তাবে যে মনোভাব প্রকাশ পেয়েছিল চিত্তরঞ্জন দাস তা অনুমোদন করেন নি বলেই যে তিনি বিরোধীপক্ষের নেতৃত্ব করেছিলেন তা নয়। কারণ তিনিও অতটা এগোতেন, হয়ত আরও এগোতে পারতেন কিন্তু নতুন আইনসভাগুলি বর্জনে আপত্তি থাকার জন্যই প্রধানত তিনি প্রস্তাবটির বিরোধিতা করেছিলেন।"

চিত্তরঞ্জনের বিরোধিতা সত্ত্বেও আইনসভা বর্জনের প্রস্তাবটি বিশেষ অধিবেশনে সাময়িকভাবে গৃহীত হয়। চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নাগপুরে কংগ্রেস অধিবেশনে নেওয়া হবে, স্থির হল। শ্রী দাস বিশেষ উদ্বিগ্ন বোধ করেন। তিনি চেয়েছিলেন প্রত্যক্ষ কার্য্য-কলাপের মাধ্যমে দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতির উন্নয়ন করতে। সেই সঙ্গে তিনি মনে করতেন পরিষদ বর্জন প্রচণ্ড ক্ষতিকর হবে। তিনি বাংলাদেশ ও আসামের বিভিন্ন দলের সঙ্গে কথা বলেন। তিনি পরিষ্কার জানান যে, সরকারকে সাহায্য নয়, ব্যতিব্যস্ত করার উদ্দেশ্যেই বিধান পরিষদে প্রবেশের পক্ষপাতী তিনি। বিশেষ করে পরিষদে এমনভাবে ভোট দিতে হবে যে, সরকারের পক্ষে মন্ত্রী নিয়োগ একেবারে অসম্ভব হয়ে পড়ে।

ইতিমধ্যে ১৯২০ সালের অক্টোবর মাসে বিধান পরিষদে নির্বাচন শেষ হয়েছে। জাতীয়তাবাদীরা প্রতিদ্বন্দ্বিতা না করায় নরমপন্থীরা সকল নির্বাচনে জয়লাভ করেন। শ্রী দাসের মতে এটি হল পরিষদ বর্জন নীতির ক্ষতিকর পরিণাম। আইন সভায় যেসব নরমপন্থী নির্বাচিত হলেন তাঁরা আমলাদের সঙ্গে সহযোগিতা করলেন এবং দেশের চোখে ধূলো দেবার জন্য বললেন, এর পেছনে জনগণের সমর্থন আছে।

চিত্তরঞ্জন এও মনে করতেন যে, অসহযোগের জন্য প্রাথমিক ব্যবস্থা সফল হয়নি। কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশন সেপ্টেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত হয়, কিন্তু নভেম্বর মাসে কোন আইনজীবীই আইন ব্যবসা পরিত্যাগ করেননি। ছাত্রেরাও বিপুল সংখ্যায় স্কুল কলেজ ত্যাগের আহ্বানে সাড়া দেয়নি। আলিগড় কলেজকে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত করার জন্য মৌলানা মহম্মদ আলির প্রয়াস ফলপ্রসূ হয়নি। বেনারস হিন্দু কলেজকে বদলাতে গিয়ে সেই একই অবস্থা হল। এমন কি কলকাতায় মহাত্মা গান্ধী কর্তৃক উদ্ঘাটিত জাতীয় স্কুলে বেশী ছাত্র আসেনি, শেষে সেটি বন্ধ করে দিতে হয়।

৩০শে নভেম্বর ১৯২০ তারিখে শ্রী দাস এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, "অসহযোগ আমাদের একমাত্র উপায়। একদিকে খেতাব ও অবৈতনিক কার্য্যভার ত্যাগ, অন্যদিকে করদানে অস্বীকার করে পূর্ণ অসহযোগের কার্য্যসূচী ন্যূনতম সময়ের মধ্যে কার্য্যকরী করতে হবে। অসহযোগ কার্য্যসূচী একটি সামগ্রিক সংগঠনী কার্য্যসূচী। সবদিকে কাজ একসঙ্গে শুরু করতে হবে যাতে পুরো কার্য্যসূচীটি অত্যল্পকালের মধ্যে বাস্তবে রূপায়ণ করা সম্ভব।

"আমি পরিষদ বর্জনের পক্ষপাতী ছিলাম না কারণ আমি পরিষদের মধ্যে থেকে অসহযোগ নীতি কার্য্যকরী করতে চেয়েছিলাম। কিন্তু কংগ্রেসের প্রস্তাবের প্রতি আনুগত্য স্বীকার করে আমাদের সকল সদস্যকে পরিষদ থেকে প্রত্যাহার করেছি এবং এই বিষয়টির এখন কোন বাস্তব গুরুত্ব নেই।"

এই পটভূমিতে ১৯২০ সালের ডিসেম্বর মাসে নাগপুরে কংগ্রেস অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। অনেকে আশঙ্কা করেছিলেন যে এই অধিবেশনে মহাত্মা গান্ধী ও চিত্তরঞ্জনের মধ্যে শক্তি পরীক্ষা হবে। চিত্তরঞ্জনের সঙ্গে বাংলাদেশ থেকে প্রায় চারশ প্রতিনিধিকে আসতে দেখে এই আশঙ্কা আরও দৃঢ় হয়। মহাত্মা গান্ধী প্রকাশ্য সংঘর্ষ এড়াতে মনস্থ করেন। তাই অধিবেশনের প্রারম্ভে তিনি চিত্তরঞ্জনকে আহ্বান করলেন খোলাখুলি আলোচনা করার জন্য। তিনি এও জানতেন যে চিত্তরঞ্জন তাঁর স্বার্থত্যাগ ও ঐকান্তিক আন্তরিকতা দিয়ে আন্দোলনে তীব্র শক্তি সঞ্চার করতে পারবেন। শুধু পরিষদ বর্জনের প্রশ্নেই তাঁদের মতভেদ। অন্যান্য সব বিষয়ে তাঁরা একমত বা অনুরূপ মত পোষণ করেন।

আলোচনাকালে শ্রী দাস প্রস্তাব করেন যে, অসহযোগ আন্দোলন শুরু করার আগে দেশকে প্রস্তুত হওয়ার জন্য পাঁচ বছরের একটি কার্য্যসূচী গ্রহণ করতে হবে। মহাত্মা গান্ধীর যুক্তি,

বর্তমান হ'ল আন্দোলন শুরু করার মাহেন্দ্রক্ষণ। পাঞ্জাবের অন্যায়, খিলাফত সমস্যা এবং দুটি বিষয়ে কোন কিছু করতে সরকারের অস্বীকৃতি এমন একটা সুযোগ এনে দিয়েছে যা হারান কোন মতেই উচিত হবে না। শ্রী দাসের মতবাদ স্বীকার করার জন্য গান্ধীজী মূল প্রস্তাবে পরিষদ বর্জনের কথাটি বাদ দিতে রাজী হন। তাছাড়া পরিষদের জন্য নির্বাচন আগেই শেষ হয়ে গিয়েছিল। সেটাও হয়ত তাঁর এই সিদ্ধান্তের কারণ। গান্ধীজী ও শ্রী দাসের মধ্যে মিটমাটের জন্য মৌলানা মহম্মদ আলি কঠোর পরিশ্রম করেন। তাঁর নিজের ভাষায় তিনি "এই দুই শক্তিশালী লোকের মধ্যে শাটল্‌ককের মত ছোটাছুটি" করেছিলেন।

মহাত্মা গান্ধী কর্তৃক গৃহীত চিত্তরঞ্জনের খসড়া প্রস্তাবটি কলকাতায় বিশেষ অধিবেশনে গৃহীত প্রস্তাবের চেয়ে অনেক বেশী বাস্তব ও কার্য্যকরী বলে মনে হয়। এতে পরিষদ বর্জন দাবী করা হয়নি। তার বদলে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত নরমপন্থী নেতাদের পদত্যাগ করতে বলা হয়। এ প্রস্তাবে আরও ঘোষণা করা হয় যে স্কুল কলেজ আদালত ক্রমে ক্রমে নয়, অবিলম্বে বর্জন করতে হবে। জনগণকে করদানে বিরত থাকার পরামর্শও এই প্রস্তাবে দেওয়া হয়!

চিত্তরঞ্জন স্বয়ং এই প্রস্তাব পেশ করেন। তিনি ঘোষণা করেন যে, ওকালতি ব্যবসা তিনি পরিত্যাগ করবেন। এতে প্রবল উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়। শ্রোতৃবৃন্দ নতুন মনোভাব, শক্তি ও উৎসাহের পরিচয় দেন। প্রকৃতপক্ষে শুধু নাগপুর নয়, সারা দেশে এক নতুন প্রাণচাঞ্চল্য দেখা দিল।

শ্রী দাসের পেশা ত্যাগ সারা দেশের মন জুড়ে বসল। ১৯২০ সালে তিনি যখন পেশা ত্যাগ করেন তখন তিনি ভারতে আইন ব্যবসার শীর্ষদেশে। তাঁর বিপুল আয়ের ফলে তিনি যে নিজে

আরামে থাকতেন তা নয়, সমাজ জীবনের সকল স্তরে কর্তৃত্ব জারি করতে পারতেন। চিত্তরঞ্জন সাহিত্য আলোচনা ভালবাসতেন, তাঁর বাড়ীতে প্রতিদিন সন্ধ্যায় কীর্তনের আসর বসত। কিন্তু এখন তিনি পুরোপুরি রাজনৈতিক আন্দোলনে আত্মনিয়োগ করেন। আইন ব্যবসার সঙ্গে সঙ্গে ধর্মীয় ও ভক্তিমূলক আসরও তিনি ত্যাগ করেন।

সপ্তম অধ্যায়

দেশবন্ধু

নাগপুর থেকে ফিরে চিত্তরঞ্জন কতগুলি ব্যক্তিগত বিষয়ের নিষ্পত্তি করে রাজনৈতিক আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। নাগপুর প্রস্তাব অনুযায়ী তিনি আইন ব্যবসা পরিত্যাগ করেন। তাঁর বাসগৃহ রূপান্তরিত হল এক রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানে—পরামর্শ, সংগঠন ও প্রচারের স্থান। তখন থেকে শ্রী দাস হলেন 'দেশবন্ধু'। মহাত্মা গান্ধী স্বরাজ লাভের জন্য এক বছর সময় স্থির করেছিলেন। বহু লোকে এর ব্যাখ্যা করেছিলেন যে একবছর পেশা ত্যাগ করলেই হবে। চিত্তরঞ্জনের বন্ধুরাও মনে করেছিলেন যে, এক বছর পরে ১৯২২ সালের জানুয়ারি মাস থেকে তিনি আবার আইন ব্যবসা শুরু করবেন। কিন্তু ফিরে আসার পথ চিত্তরঞ্জন নাগপুরেই বন্ধ করে দিয়েছিলেন। দুটি মামলা ছাড়া—যার ভার অন্য কাউকে দেওয়া অসম্ভব ছিল—চিত্তরঞ্জন তাঁর গৃহীত সমস্ত মামলার নথি ফেরৎ দিলেন। এখন থেকে অনেক টাকা ফী পাওয়ার সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও চিত্তরঞ্জন কোন মামলার ভার নেননি। আইনের সমস্ত বই তিনি জামাতাকে দিয়ে দেন। প্রকৃতপক্ষে যাঁরা শুধু আইন বিষয়ে আলোচনা করতে আসতেন তাঁদের সঙ্গে চিত্তরঞ্জন সাক্ষাৎ পর্য্যন্ত করতেন না।

চিত্তরঞ্জন উপলব্ধি করলেন যে, প্রথমে দেশের তরুণদের মন জয় করা দরকার। ১৯২১ সালের ১০ই ও ১১ই জানুয়ারি কলকাতায় বিরাট জনসমাবেশে চিত্তরঞ্জন বাংলাদেশের ছাত্রদের আবেদন জানালেন, দেশের ডাকে সাড়া দেওয়ার জন্য। বঙ্গবাসী কলেজ

থেকে প্রথম ছাত্রদল বেরিয়ে এল। তারা রিপন কলেজের ছাত্রদের সঙ্গে মিলে সিটি কলেজে গেল। তারপরে বেরিয়ে এল বিদ্যাসাগর কলেজের ছাত্রেরা। কলকাতায় মাত্র দুটি কলেজ অবিচলিত ছিল—প্রেসিডেন্সি কলেজ ও স্কটিশ চার্চ কলেজ।

১৪ই জানুয়ারি ১৯২১ তারিখে ছাত্রদের এক বিরাট সভায় চিত্তরঞ্জন বলেন, ছাত্রদের পড়াশোনা দু এক বছর স্থগিত থাকতে পারে কিন্তু স্বরাজের জন্য সংগ্রামে তাদের অবিলম্বে অবশ্যই যোগ দিতে হবে। আন্দোলন শুরু হয়েছে, শহরে ও গ্রামে সেবার জন্য তরুণদের প্রয়োজন। তিনি বলেন, স্কুল কলেজ ত্যাগই যথেষ্ট নয়। দেশের কাজে ছাত্রদের অবদান নিশ্চিত—নেতিবাচক নয়—হওয়া দরকার। তরুণেরা যদি এগিয়ে আসে তাহলে দেশ অবশ্যই পরাধীনতা থেকে মুক্তি পাবে।

কয়েকজন ছাত্র দাবী করে যে, তাদের লেখাপড়া চালিয়ে যাওয়ার জন্য জাতীয় কলেজ প্রতিষ্ঠা করতে হবে। শ্রী দাস প্রতিশ্রুতি দেন, একমাসের মধ্যে জাতীয় কলেজ প্রতিষ্ঠিত হবে। প্রতিশ্রুতি রক্ষার জন্য চিত্তরঞ্জন একটির পর একটি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করেন। কয়েকজন কর্তৃপক্ষ সোজাসুজি অস্বীকার করেন, বাকীরা নানা অজুহাত দেখাতে থাকেন। চিত্তরঞ্জন স্থির করলেন, তাঁর প্রতিজ্ঞা রাখার জন্য একটি নতুন স্বাধীন প্রতিষ্ঠান স্থাপন করতে হবে। ৩১শে জানুয়ারি ১৯২১ তারিখে এক বৈঠকে ১১নং ওয়েলিংটন স্কোয়ারের বাড়ীটি ভাড়া নেওয়ার সিদ্ধান্ত করা হয়। গৌড়ীয় সর্ব বিদ্যায়তনের (বঙ্গীয় জাতীয় কলেজ) উদ্ঘাটন করলেন মহাত্মা গান্ধী, প্রথম অধ্যক্ষ সুভাষ চন্দ্র বসু। উদ্ঘাটন অনুষ্ঠানে পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু ও মৌলানা আবুল কালাম আজাদ উপস্থিত ছিলেন। এই প্রতিষ্ঠান স্থাপনের জন্য তাঁরা শ্রী দাসকে অভিনন্দন জানান।

ভারতের সর্বত্র শ্রী দাসের কাজের উচ্চ প্রশংসা হয়। পুণার 'মারাঠা' পত্রিকা শ্রী দাসকে অভিনন্দন জানিয়ে লেখে, "কংগ্রেস প্রস্তাবের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে শ্রী দাস যে নির্ভীক স্বার্থত্যাগের পরিচয় দিয়েছেন সেজন্য সারা ভারতের আন্তরিক অভিনন্দন তাঁর প্রাপ্য। নির্ভীক স্বার্থত্যাগ বলার সুস্পষ্ট কারণ আছে। শ্রী দাস বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ ব্যারিষ্টার, তাঁর আয় দেশীয় রাজাদের ঈর্ষার কারণ হতে পারে। দাতব্যের জন্য তিনি অসম্ভব রকম মুক্ত হস্তে অর্থ ব্যয় করেন। বহু দুঃস্থ পরিবারের প্রকৃত উপকারী বন্ধু তিনি। আমরা জানি তাঁর অর্থের ওপর নির্ভরশীল লোকদের কথা ভেবেই তিনি ১৯২০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত কলকাতায় বিশেষ অধিবেশনের পরেও আইন ব্যবসা চালিয়ে যান। দেশ এই লোকটির সেবার প্রশংসা ইতিমধ্যে করেছে কিন্তু এখন তিনি দেশের প্রকৃত সেবক, দেশের কল্যাণ ছাড়া আর কোন দিকে তাঁর লক্ষ্য নেই। মনে হচ্ছে কলকাতায় জাতীয় কলেজ প্রতিষ্ঠা করে তিনি এখন বাংলাদেশে শিক্ষা সমস্যার সমাধানে সর্বশক্তি নিয়োগ করেছেন। তাঁর এই প্রচেষ্টায় সাফল্য কামনা করি। তাঁকে আমরা জানতে চাই যে, তিনি আত্মত্যাগের পথে গিয়েছেন বলে দেশের সহানুভূতি ও প্রশংসা সবসময়ই তাঁর জন্য থাকবে।"

দেশের নানা স্থানে বিশিষ্ট আইনজীবীগণ চিত্তরঞ্জনের পদাঙ্ক অনুসরণ করে পেশা ত্যাগ করেন। নাগপুরের শ্রী অভয়ঙ্কর এক বছরের জন্য আইন ব্যবসা ছেড়ে দেন। শ্রী ধীরেশ চন্দ্র চক্রবর্তী অধ্যাপকের পদ ত্যাগ করেন। কলকাতা টাঁকশালের ডেপুটি অ্যাসে মাস্টার ডাঃ প্রফুল্ল চন্দ্র ঘোষ সরকারী কাজ ছেড়ে দেন। ভারত স্বাধীন হওয়ার পর তিনি পশ্চিমবঙ্গের প্রথম মুখ্যমন্ত্রী হন। তখন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য্য ছিলেন শ্রী নীলরতন সরকার। তিনি এবং স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ছাত্রদের কলেজ ত্যাগে নিবৃত্ত করার জন্য বিশেষ চেষ্টা করেন। তাঁদের

চেষ্টা সত্বেও প্রায় ত্রিশ হাজার ছাত্র অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেয়। সকলেই স্বীকার করেন যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বর্জনের কংগ্রেস কার্য্যসূচী অন্য যে কোন রাজ্যের তুলনায় বাংলাদেশে বেশী সফল হয়েছে।

কলকাতায় আন্দোলন শুরু হওয়ার পর চিত্তরঞ্জন ১১ই ফেব্রুয়ারি ১৯২১ তারিখে পাটনায় যান। চম্পারণে গান্ধীজী যে কাজ করেন তাতে ক্ষেত্র আগে থেকে তৈরি ছিল। বিহার চিত্তরঞ্জনের ডাকে বিশেষভাবে সাড়া দেয়।

তারপর শ্রী দাস পূর্ববঙ্গে ব্যাপক সফর শুরু করেন। প্রথমে তিনি যান নারায়ণগঞ্জে। সেখানে তাঁর আবেদনে জনগণের মনে সাড়া লাগে।

নারায়ণগঞ্জ থেকে চিত্তরঞ্জন যান ঢাকায়। সেখানে তাঁর ডাকে আরও বেশী লোকে সাড়া দেয়। গ্রাম সেবার জন্য দলে দলে স্বেচ্ছাসেবক আসতে থাকে। তিনি তিনমাসের জন্য এক কার্য্যসূচী রচনা করে বিশিষ্ট আইনজীবী ও অন্যান্যদের প্রত্যেক গ্রামে কংগ্রেস কমিটি গঠনের নির্দেশ দেন। জেলার কয়েকজন বিশিষ্ট আইনজীবী ব্যবসা পরিত্যাগ করেন।

২রা মার্চ ১৯২১ তারিখে চিত্তরঞ্জন মৈমনসিংহে পোঁছলে তাঁকে প্রবল উদ্দীপনার সঙ্গে স্বাগত জানান হয়। ষ্টেশনে অভূতপূর্ব জনসমাগম দেখে জেলা কর্তৃপক্ষ শঙ্কিত হয়ে পড়েন। শহরে চিত্তরঞ্জনের প্রবেশ নিষেধ করে অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট নিম্নরূপ আদেশ জারী করেন—

"বেআইনী মিছিল বের করতে উৎসাহ দান এবং পরীক্ষা গ্রহণের বৈধ কার্য্যে রত ব্যক্তিদের বাধা দেওয়ার চেষ্টা করে

মৈমনসিংহ শহরের শান্তি ক্ষুণ্ণ করতে আপনি পারেন বলে ফৌজদারি বিধির ১৪৪ ধারা অনুসারে আমি আপনাকে শহরে প্রবেশ করতে নিষেধ করছি।"

চিত্তরঞ্জন প্রথমে মনে করেন আদেশ অমান্য করে কারাবরণ করবেন—বিশেষত তাঁর দুজন সঙ্গী মনোমোহন নিয়োগী ও মৌলবী তায়েবুদ্দীনকেও অনুরূপ আদেশ দেওয়া হয়েছিল। তাঁরা এবং অন্যান্যেরা চিত্তরঞ্জনকে বোঝালেন যে কংগ্রেস এ ধরণের আদেশ অমান্য করার জন্য জনগণকে এখনও আহ্বান জানায় নি। তাছাড়া এই মুহূর্তে তাঁর কারাবাসে জাতির স্বার্থ বিপন্ন হবে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র হেমন্ত সরকার—যিনি অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেওয়ার জন্য অধ্যাপকের পদ ত্যাগ করেছিলেন—চিত্তরঞ্জনকে অনেক বুঝিয়ে ম্যাজিষ্ট্রেটের আদেশ মানতে প্ররোচিত করেন।

মৈমনসিংহ ত্যাগের আগে ষ্টেশনে জমায়েত জনতার উদ্দেশ্যে চিত্তরঞ্জন বলেন, "এতদিন আমি অন্তরে যা উপলব্ধি করেছিলাম এখন তা চোখের সামনে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। তা হল, আমলারা নিজেদের ইচ্ছেমত যে কোন আইন ভাঙ্গতে পারে। প্রকৃতপক্ষে সংস্কার ব্যবস্থা আমাদের কি দিয়েছে? ম্যাজিষ্ট্রেট যখন যা খুশী তাই করতে পারে তখন এটাই পরিষ্কার হয়ে ওঠে যে, সংস্কার ব্যবস্থায় আমরা কিছুই পাইনি। আজ নিজের ইচ্ছের বিরুদ্ধে বেআইনা আদেশ মানলাম। আমি দেখব যাতে কংগ্রেস শীঘ্রই জনগণকে আহ্বান জানায় এই ধরণের আদেশ অমান্য করার জন্য। আজ একথা স্পষ্ট যে স্বরাজ না পেলে কোনরূপ প্রকৃত অগ্রগতি বা লাভ সম্ভব নয়। আজ আমরা নিজেদের দেশে পরবাসী। স্বরাজ বিনা জীবন অসহ্য।"

শ্রী দাসের প্রতি এই অন্যায় আদেশের ফলে সারা বাংলাদেশে বিক্ষোভের ঝড় উঠল। মৈমনসিংহ শহরে স্বতঃস্ফূর্তভাবে হরতাল

অনুষ্ঠিত হল। কেউ কেউ সাতদিনব্যাপী হরতাল পালনের ইচ্ছা জানায়। কলকাতাতেও প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হল। মহাত্মা গান্ধী শ্রী দাসকে তারবার্তা পাঠালেন, "স্বেচ্ছায় বাধ্যতা স্বীকারের মনোভাব আমাদের মধ্যে বজায় রাখতে এবং আইন অমান্যের শক্তি জাগ্রত করতে হবে।"

মৈমনসিংহের দুজন বিশিষ্ট আইনজীবী সূর্য্যকুমার সোম ও মনোমোহন নিয়োগী আগেই আইন ব্যবসা ত্যাগ করেছিলেন। এখন থেকে বাংলাদেশে কংগ্রেসের বিশিষ্ট কেন্দ্র হয়ে দাঁড়াল মৈমনসিংহ।

চিত্তরঞ্জন এর পরে যান টাঙ্গাইলে। কারাতিয়ার জমিদার ওয়াজিদ আলি খাঁ পানি—চাঁদ মিয়া নামে অধিকতর সুপরিচিত—চিত্তরঞ্জনকে স্বাগত জানান। চাঁদ মিয়া নিজেকে বাংলাদেশের বার ভুঁইয়ার—যাঁরা মোগল সম্রাট আকবরের প্রভুত্ব অমান্য করেছিলেন—অন্যতম ঈশা খাঁর বংশধর বলে দাবী করতেন। চাঁদ মিয়া শুধু যে এ আন্দোলনে যোগ দিয়ে কারাবরণ করেছিলেন তা নয়, চিত্তরঞ্জনের অনুপ্রেরণায় স্বগৃহে জাতীয় স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন।

চিত্তরঞ্জন টাঙ্গাইল থেকে আসেন চাঁদপুরে। এখানেও বিপুল সংখ্যক লোক তাঁকে স্বাগত জানাতে আসে। জনতার মধ্যে তিনি এমন উদ্দীপনার সঞ্চার করেন যে বহু জেলে তাঁকে মাছ উপহার দিতে আসে। এত বেশী নৌকা এসেছিল যে ষ্টীমারের পাইলট ষ্টীমার থামাতে বাধ্য হয়। শ্রী সত্যেন্দ্র চন্দ্র মিত্র যিনি পরে বঙ্গীয় বিধান পরিষদের সভাপতি হন—চাঁদপুরে শ্রী দাসের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। শ্রী দাসের প্রভাবে তিনি আইন ব্যবসা পরিত্যাগ করে তাঁর প্রাইভেট সেক্রেটারি হন।

চিত্তরঞ্জন চাঁদপুর থেকে আসামে গিয়েছিলেন। এই যাত্রাপথের নিম্নরূপ বিবরণ দিয়েছেন হেমন্তকুমার সরকার—"আমাদের পথে প্রত্যেক ষ্টেশনে প্রচণ্ড ভীড় ও হুড়োহুড়ি হয়েছিল। একদিন ভোর চারটের সময় হঠাৎ এক তাগড়া শিখ ভাই আমাদের কামরায় ঢুকে জিজ্ঞাসা করলেন—'দেশবন্ধু কোথায়?' সেই কামরাতে শ্রীযুক্তা বাসন্তী দেবীও ছিলেন। আমরা সবাই হকচকিয়ে গিয়েছিলাম। দেশবন্ধু ওপরের বার্থে ঘুমোচ্ছিলেন। আমাদের নতুন পাওয়া পাঞ্জাবি বন্ধু বললেন—'আমি সাতদিন ধরে হেঁটেছি এবং গত দুদিন ধরে প্রায় অনাহারে এই ষ্টেশনে পড়ে আছি শুধু দেশবন্ধুকে দেখবার জন্য, আমি তাঁকে দেখবই'। আমি তাঁকে অনেক বোঝাবার চেষ্টা করলাম কিন্তু কোন ফলই হল না। তিনি দেশবন্ধুকে ওপরের বার্থ থেকে টেনে নামালেন, তাঁকে জড়িয়ে ধরলেন এবং উল্লাসের সঙ্গে সকলকে দেখাতে লাগলেন। হঠাৎ ঘুম ভাঙ্গানতে দেশবন্ধু প্রথমে ভেবেছিলেন যে ট্রেন দুর্ঘটনা হয়েছে। কিন্তু আমরা প্রকৃত ঘটনা বলাতে—তিনি হো হো করে হেসে উঠলেন।"

নিখিল বঙ্গ ও আসাম খিলাফৎ সম্মেলন শ্রীহট্টের মৌলবী বাজারে অনুষ্ঠিত হয়। লক্ষাধিক লোকের এক সমাবেশে—তখন পর্য্যন্ত ভারতে অন্যতম বৃহৎ জনসমাবেশ—চিত্তরঞ্জন দুঘণ্টা ধরে ভাষণ দেন। জনগণ মুগ্ধ বিস্ময়ে তাঁর কথা শোনে। প্রাচীনকাল থেকে ভারতীয় সভ্যতার অগ্রগতি দ্রুত পর্য্যালোচনা করে শ্রী দাস বলেন—"আজ হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায় উপলব্ধি করেছেন যে তাঁদেরই স্বার্থে ঐক্যবদ্ধ হওয়া প্রয়োজন কিন্তু বৃটেনের স্বার্থ হলো তাঁদের মধ্যে বিভেদ বজায় রাখা। আপনারা কি ভেবে দেখেছেন কেন হিন্দুরা এই খিলাফৎ আন্দোলনে মুসলমানের সাথে যোগ দিয়েছেন? কারণ প্রকৃত হিন্দুর আসল ধর্ম হল সর্বপ্রেম। তার কাছে সকল ধর্মই ভাল। প্রকৃত হিন্দু কখনও অন্য ধর্মের প্রতি, তা সে যাই হোক না কেন, অত্যাচার, অবিচার সহ্য করতে

পারে না। প্রকৃত ধার্মিক লোকের কাছে হিন্দু অহিন্দুর মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। তার মতভেদ বা বিতর্ক হলো অধর্মের সঙ্গে অবিচার ও অত্যাচারের সঙ্গে। তাই কোন ধর্ম সম্প্রদায় নয়, অধর্মের বিরুদ্ধেই আমাদের অভিযোগ বলে আমরা নতুন জীবন গঠন করতে পারবো। আর সেই জীবনে অরুণোদয় আমি দেখতে পাচ্ছি। ভগবান আমাদের আশীর্ব্বাদ করুন যাতে আমরা হিন্দু মুসলমান সকল অত্যাচার কারাদণ্ড এমন কি মৃত্যু জয় করে আমাদের লক্ষ্যে পৌঁছতে পারি।"

তিনি তাঁর ভাষণ শেষ করেন এমন এক বাণী দিয়ে যা তাঁর কালের মত এখনও সত্য—"সকল জাতের মধ্যে ঐক্য বিধানের দায়িত্ব ভারতের এখনও শেষ হয়নি। নতুন করে তার সুরু হয়েছে। সকল জাতিকে দেবার মত ভারতের একটা শাশ্বত বাণী আছে।"

শ্রীহট্ট থেকে চট্রগ্রামে যাবার পথে চিত্তরঞ্জন কুমিল্লায় থেমেছিলেন। সারা রাস্তায় তিনি নরনারীর প্রবল উদ্দীপনা লক্ষ্য করেন। এবং বহু বিশিষ্ট আইনজীবীকে পেশা ত্যাগ করে অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিতে প্ররোচিত করেন। চট্টগ্রামে শ্রী যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত চিত্তরঞ্জনের সঙ্গে যোগ দেন এবং কালে তাঁর অন্যতম বিশ্বস্ত সহকারী হয়ে ওঠেন। ভারতে এবং বিদেশ থেকে বহু তরুণ চিত্তরঞ্জনকে চিঠি লেখেন দেশের কাজে নিজেদের উৎসর্গ করার অভিপ্রায় জানিয়ে। তাঁদের মধ্যে ছিলেন, কেমব্রিজের একটি তরুণ ছাত্র যিনি পরে নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসু নামে জগৎ বিখ্যাত হয়েছিলেন। ১৬ই ফেব্রুয়ারী, ১৯২১ তারিখে লেখা সুভাষ বসুর চিঠিটি নীচে দেওয়া হল। এ থেকে বোঝা যাবে চিত্তরঞ্জনের আহ্বান কেমন করে তরুণদের মনে আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল। সুভাষ চন্দ্র লেখেন—

"আমি হয়তো আপনার পরিচিত নই কিন্তু একটু চিন্তা করলে আমাকে হয়তো চিনতে পারবেন। একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কথা

আমি আপনাকে বলতে চাই। কিন্তু তার আগে আমি আমার আন্তরিকতার প্রমাণ দেব।

"আমার পিতা বাবু জানকীনাথ বসু কটকে ওকালতি করেন। কয়েক বছর আগে তিনি সেখানে সরকারী উকিল ছিলেন। আমার দাদাদের মধ্যে বাবু শরৎ চন্দ্র বসু কলকাতা হাইকোর্টের ব্যারিষ্টার। আপনি হয়তো আমার বাবাকে চেনেন না কিন্তু দাদাকে নিশ্চয়ই চেনেন।

"পাঁচ বছর আগে আমি প্রেসিডেন্সী কলেজে পড়তাম। কোন একটা গোলমালের জন্য ১৯১৬ সালে আমি কলেজ থেকে বহিষ্কৃত হই। দু বছর নষ্ট হওয়ার পর কোন একটি কলেজে অধ্যয়ন করার অনুমতি দেওয়া হয়। ১৯১৯ সালে বি. এ. পরীক্ষায় অনার্স নিয়ে আমি প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হই।

"ঐ বছর অক্টোবর মাসে আমি ইংল্যাণ্ডে আসি। গত আগষ্ট মাসে (১৯২০) আমি সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় চতুর্থ স্থান অধিকার করি। আগামী জুন মাসে নীতি শাস্ত্রে ট্রাইপসের জন্য আমি পরীক্ষা দেব। এবং আশা করি কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্র্যাজুয়েট হতে পারব।

"সরকারের সেবা করবার বিন্দুমাত্র ইচ্ছে আমার নেই। আমি আমার বাবা ও ভাইকে চিঠি লিখে জানিয়েছি যে সরকারী চাকরী আমি ত্যাগ করতে চাই। তাঁদের কাছ থেকে অনুমতি পাওয়ার আগে আমি দেখতে চাই চাকরী ছাড়ার পর আসল কাজ আমি কি করবো। আমি অবশ্য জানি চাকরী ছাড়ার পর আমি যদি দেশসেবা করতে চাই আমার করার মত অনেক কাজ আছে। যেমন জাতীয় কলেজে আমি পড়াতে পারি কিংবা পত্রিকার সম্পাদনা ও প্রকাশ করতে পারি। কিংবা জনগণের মধ্যে শিক্ষার প্রসার করতে পারি। আমি যদি জনগণকে বলি প্রকৃত কাজ আমি কি করবো তাহলে আমি হয়তো তাঁদের অনুমতি পেতেও পারি। তাঁদের মত

নিয়ে আমি যদি সিভিল সার্ভিস থেকে পদত্যাগ করি তাহলে অন্যান্য বিষয়ে তাঁদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে যাবার প্রয়োজন হবে না।

"দেশের অবস্থা আপনার সবচেয়ে ভাল জানা আছে। আমি জানতে পেরেছি যে আপনি ঢাকা এবং কলকাতা উভয়স্থানে জাতীয় কলেজ প্রতিষ্ঠা করেছেন। এবং ইংরেজী ও বাংলা উভয় ভাষাতেই 'স্বরাজ' পত্রিকা প্রকাশ করতে চান। আমি এও শুনেছি, দেশের বহু স্থানে পল্লী সম্প্রদায় গঠন করা হয়েছে।

"আমি জানতে চাই মাতৃভূমির সেবায় আমাকে কি কাজ দিতে পারেন। শিক্ষা বা অভিজ্ঞতা আমার বেশী নেই। কিন্তু তরুণের কর্মশক্তি আমার আছে। আমি অবিবাহিত। লেখাপড়া সম্বন্ধে আমি বলতে পারি দর্শনের কিছুটা আমি পড়েছি। কলকাতায় এ বিষয়ে অনার্স আমার ছিল এবং এখানে ট্রাইপসের জন্য আমি তা পড়েছি। সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার জন্য আমাকে পড়তে হয়েছিল অর্থনীতি, রাষ্ট্র বিজ্ঞান, ইংরেজী ও ইউরোপীয় ইতিহাস, ইংরেজের আইনকানুন, সংস্কৃত ও ভূগোল।

"আমার বিশ্বাস আমি রাজনীতিতে যোগ দিলে আরও দু'একজন বাঙ্গালী বন্ধু আমাকে অনুসরণ করবে। কিন্তু আমি নিজে রাজনীতিক্ষেত্রে না আসা পর্য্যন্ত আর কাউকে আনতে পারি না। কোন ক্ষেত্রে আমার কাজের সুবিধা আছে তা এতদূর থেকে আমার পক্ষে বোঝা সম্ভব নয়। আশা করি ভারতে ফেরার পর কোন কলেজে অধ্যাপনা এবং পত্রিকা প্রকাশে আমি নিজেকে উৎসর্গ করতে পারব। অন্যদিকে নির্দ্দিষ্ট পরিকল্পনা পেলে সিভিল সার্ভিস ত্যাগ করাই আমার অভিপ্রায়। তাহলে বিচার বিবেচনাতে অযথা সময় নষ্ট হবেনা। বাংলাদেশে মাতৃভূমির আপনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সেবক। সেজন্য আপনাকেই এই চিঠি লিখছি।

"ভারতে দেশপ্রেমের যে তরঙ্গ আপনি তুলেছেন তা বৃটেনেও পৌঁছেছে। এখানেও মাতৃভূমির ডাক শোনা গেছে। অক্সফোর্ডের জনৈক মাদ্রাজী ছাত্র বর্ত্তমানে তার অধ্যয়ন বন্ধ রেখেছে। সে ভারতে ফিরে যাচ্ছে কাজ করার জন্য। কেমব্রিজে অসহযোগ আন্দোলন নিয়ে অনেক আলোচনা হওয়া সত্বেও এখানে কিছুই হয়নি। আমার বিশ্বাস কেউ পথ দেখালে অন্যেরা তাকে অনুসরণ করবেই। মাতৃভূমির বেদীতে সেবা ও স্বার্থত্যাগের আপনিই প্রধান ব্যক্তি। অল্প বিদ্যা, বুদ্ধি, শক্তি, উৎসাহ আমার যেটুকু সম্বল আছে তাই নিয়ে আপনার কাছে নিজেকে নিবেদন করছি। আমার দেহ ও মন ছাড়া মাতৃভূমির চরণে নিবেদন করার মত আর কিছু নেই।

"আপনাকে চিঠি লেখার উদ্দেশ্য হল আমি জানতে চাই দেশের স্বার্থে এই মহান কাজে আপনি আমাকে কিভাবে ব্যবহার করতে চান? যে কাজে বিরাট স্বার্থত্যাগ দরকার তাতে আমাকে কেমন করে নিয়োগ করবেন? দয়া করে যদি একটা ধারণা দেন তাহলে আমি আমার ভাই ও বাবাকে লিখে জানাতে পারি এবং সেই সঙ্গে নিজের মনও তৈরী করতে পারি।

"আমি এখন প্রকৃতপক্ষে সরকারী ভৃত্য। কারণ আমি শিক্ষানবিস আই. সি. এস অফিসার। চিঠি সেন্সর হতে পারে বলে আমি আপনাকে সোজাসুজি লিখছি না। আমার এক বিশেষ বন্ধু শ্রী প্রমথনাথ সরকারকে চিঠিটা পাঠাচ্ছি। সে আপনাকে দিয়ে দেবে। আপনাকে যখনই চিঠি লিখব এই পন্থাতে পাঠাব। আপনি আমাকে অনায়াসেই লিখতে পারেন। কারণ এখানে চিঠি সেন্সর করার সম্ভাবনা নেই। আমি এখানে আর কাউকে আমার ইচ্ছের কথা জানাইনি। আমি শুধু বাবা ও ভাইকে চিঠি লিখে জানিয়েছি। আমি যেহেতু এখন সরকারী ভৃত্য, আমি চাকরী

না ছাড়া পর্য্যন্ত আশা করি আপনি দয়া করে এ সম্বন্ধে আর কাউকে জানাবেন না।

"আপনি যদি 'স্বরাজ' পত্রিকা ইংরেজীতে প্রকাশ করেন তাহলে আমার মনে হয় আমাকে সাব-এডিটর হিসেবে নেওয়া যেতে পারে। তাছাড়া জাতীয় কলেজে নীচু শ্রেণীতে আমি পড়াতে পারি। কংগ্রেস সম্বন্ধে কাজের একটা পরিকল্পনা আমার আছে। আমার মনে হয় কংগ্রেসের নিজস্ব একটা ভবন থাকা দরকার। সেখানে বেশ কয়েকজন গবেষক ছাত্র থাকবে যারা দেশের বিভিন্ন সমস্যা সম্বন্ধে তথ্য আহরণ করবে। আমি যতদূর জানি ভারতীয় মুদ্রা ও বিনিময় হার সম্বন্ধে কংগ্রেসের নির্দ্দিষ্ট কোন নীতি নেই। ভারতে দেশীয় রাজ্যগুলি সম্বন্ধে কি নীতি গ্রহণ করা হবে তা এখনও স্থির হয়নি। নরনারীর ভোটাধিকার সম্বন্ধেও কংগ্রেস নিজ অভিমত এখনও ব্যক্ত করেনি। অনুন্নত শ্রেণীর প্রতি কংগ্রেস তার কর্ত্তব্য করেনি। মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সীতে এই অবহেলা অব্রাহ্মণদের সরকারমুখী ও জাতীয়তা বিরোধী করে তুলেছে।

"আমার মতে কংগ্রেসের স্থায়ী কর্মচারী গোষ্ঠী থাকা দরকার। এই কর্মীরা বিভিন্ন সমস্যা সম্বন্ধে গবেষণা চালাবেন। প্রত্যেক কর্মচারী হাল আমলের সমস্ত তথ্য সংগ্রহ করবেন। যার ভিত্তিতে কংগ্রেস কমিটি প্রত্যেক বিষয়ে নিজস্ব নীতি স্থির করতে পারবেন। সঙ্কোচের সঙ্গে জানাচ্ছি এখনও পর্য্যন্ত দেশের বিভিন্ন সমস্যা সম্বন্ধে কংগ্রেসের কোন নির্দিষ্ট নীতি নেই। এজন্য কংগ্রেসের গবেষক ছাত্রদের জন্য একটি ভবনের কথা আমি উল্লেখ করেছি।

"সেই সঙ্গে কংগ্রেসের একটা সংবাদ বিভাগও থাকা উচিত। হাল আমলের সকল তথ্য ও সংখ্যা সংগ্রহ করতে হবে। প্রচার বিভাগ থেকে প্রত্যেক প্রাদেশিক ভাষায় পুস্তক প্রকাশ করে

জনগণের মধ্যে বিতরণ করতে হবে। বিভিন্ন সমস্যা সম্বন্ধেও এই বিভাগ পুস্তক প্রকাশ করবে। এইসব বইতে কংগ্রেসের নীতি এবং সেই নীতি গ্রহণের কারণ ব্যাখ্যা করা হবে।

"আমি অনেক কিছু লিখে ফেললাম, কিন্তু এ সমস্ত বিষয়ই আপনার ভালভাবেই জানা আছে। কিন্তু আমার কাছে এগুলি নতুন বলে আমি নিজেকে সংযত রাখতে পারিনি। আমার মনে হয় কংগ্রেসের সামনে বিরাট কর্মক্ষেত্র রয়েছে। আপনি যদি আমাকে নিয়োগ করেন তাহলে আমিও আপনার কিছুটা কাজে লাগাতে পারি।

"আমি আপনার মতের অপেক্ষায় রয়েছি। এবং আমাকে কিভাবে কাজে লাগাবেন তাহা জানার জন্য উদ্বিগ্ন রইলাম। আপনি যদি ইচ্ছে করেন যে কেউ ইংলণ্ডে এসে সাংবাদিকতায় শিক্ষালাভ করুক তাহলে আমি সে কাজ করতে পারি। তাতে যাতায়াত রাহাখরচ বেঁচে যাবে। আমাকে অবশ্য একাজ নেওয়ার আগে চাকরী ছাড়তে হবে। আপনি অবশ্য আমার থাকা খাওয়ার খরচ দেবেন। কারণ চাকরী ছেড়ে দেবার পর বাড়ী থেকে টাকা নেওয়া উচিত হবেনা।

"আমার ইচ্ছে সিভিল সার্ভিস থেকে পদত্যাগ করা। সেক্ষেত্রে জুন মাসে আমি বাড়ী রওনা হব। কিন্তু আপনার প্রয়োজনবোধে আমি আমার ইচ্ছে বিসর্জন দিয়ে আপনার ইচ্ছেমত কাজ করবো।"

অষ্টম অধ্যায়

ইংলণ্ডের যুবরাজের ভারত আগমন

ঝড়ের বেগে পূর্ব বঙ্গ ও আসাম সফর করে চিত্তরঞ্জন ২৩শে মার্চ ১৯২১ কলকাতায় ফিরে এলেন। মহাত্মা গান্ধীও উড়িষ্যা যাবার পথে সেদিন কলকাতায় পৌঁছেছিলেন। সেদিন সন্ধ্যায় চিত্তরঞ্জন বরিশাল—যেখানে বিপিন চন্দ্র পালের সভাপতিত্বে প্রাদেশিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হচ্ছিল—অভিমুখে রওনা হন। স্মরণীয় যে, ১৯০৬ সালে বরিশালে অনুষ্ঠিত সম্মেলনের অধিবেশন আমাদের জাতীয়তাবাদের ইতিহাসে এক বিশিষ্ট অধ্যায়ের সূচনা করেছিল। ১৯২১ সালের বরিশাল সম্মেলনও অনুরূপ গুরুত্বপূর্ণ ছিল। অভ্যর্থনা কমিটির সভাপতি শ্রী অশ্বিনী কুমার দত্ত ছিলেন এই দুই অধিবেশনের মধ্যে যোগসেতু।

সভাপতির ভাষণে স্বরাজের সংজ্ঞা নির্দেশ করতে গিয়ে বিপিন চন্দ্র পাল বলেন, স্বরাজ হল গণতান্ত্রিক স্বায়ত্বশাসন আর অসহযোগ হল ১৯০৫ সালের নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের আর এক ধাপ। তিনি বলেন, "অসহযোগের ভিত্তি ঘৃণা নয়। ইংরেজদের ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করার কোন অভিপ্রায় আমাদের নেই। সকল জাতিই উন্নয়ন ও সমৃদ্ধি লাভ করবে—অন্য কোন জাতিকে অনুরূপ উন্নয়ন লাভে বঞ্চিত না করে। স্বরাজের জন্য স্বার্থত্যাগ প্রয়োজন। স্বরাজ লাভের জন্য আমাদের সব কিছু ত্যাগ করতে প্রস্তুত থাকতে হবে। বর্তমান সংগ্রাম আমাদের বাঁচার সংগ্রাম। আমাদের এই প্রয়াসে যদি আমরা বিফল হই, জাতি হিসেবে আমাদের মৃত্যু ঘটবে। অহিংস যুদ্ধ আমাদের একমাত্র হাতিয়ার।

আমরা যদি এর মাধ্যমে স্বরাজ লাভ করতে পারি তাহলে ভাবীকালের কাছে ভারতের নাম অবিনশ্বর ঐতিহ্য হয়ে থাকবে। পাশ্চাত্যের সাংস্কৃতিক অভিযানের বিরুদ্ধে আমাদের অবশ্যই রুখে দাঁড়াতে এবং আমাদের প্রাচীন সত্তা ফিরে পেতে হবে। এই সব উদ্দেশ্য সাধনের জন্য আমাদের ক্ষমতায় যা কিছু সম্ভব তা আমরা করব। তা যদি না করি তাহলে ভগবানের কাছে অপরাধী হব আমরা। আর স্বরাজ লাভের জন্য যা কিছু করা সম্ভব তা যদি করি তাহলে ঈশ্বরের আশীর্বাদে আমরা জয় লাভ করব।"

বরিশাল সম্মেলনে আর একটি প্রস্তাবে আইনজীবীদের অন্তত তিনমাসের জন্য আইনব্যবসা স্থগিত রাখতে আহ্বান জানান হয়।

এর পরেই বেজওয়াড়ায় (বর্তমানে বিজয়ওয়াড়া) ৩১শে মার্চ ও ১লা এপ্রিল নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। এই অধিবেশনে টিলক স্বরাজ তহবিলের জন্য এক কোটি টাকা সংগ্রহের প্রস্তাব গৃহীত হয়। চিত্তরঞ্জন বাংলা দেশ থেকে যত বেশী সম্ভব অর্থ সংগ্রহে আত্মনিয়োগ করলেন। অর্থদান ছাড়াও মেয়েরা বিনা দ্বিধায় তাদের অলঙ্কার দান করে। কংগ্রেস আরও সিদ্ধান্ত করে যে এক কোটি সদস্য সংগ্রহ এবং গ্রামে গ্রামে কুড়ি লক্ষ চরখা চালু করতে হবে। ফিরে এসে শ্রী দাস ও তাঁর সহকর্মীরা সারা বাংলায় জেলা কংগ্রেস কমিটি গঠন করতে শুরু করেন। ৩০শে এপ্রিল গঠিত দক্ষিণ কলকাতা জেলা কংগ্রেস কমিটির সভাপতি হন চিত্তরঞ্জন স্বয়ং। চাঁদা সংগ্রহের জন্য রাস্তায় রাস্তায় মিছিল বের করা হয়, বাড়ী বাড়ী গিয়ে কংগ্রেসের সদস্য যোগাড় করা হয়। সেই সঙ্গে চিত্তরঞ্জনের বাংলা দেশ সফর বজায় থাকে। ৯ই মে তিনি কলকাতা থেকে মালদহ যান, পথে লালগোলা ঘাটে জনসভায় বক্তৃতা দেন। তারপর যান রাজসাহী ও বগুড়ায়। সমস্ত জায়গাতেই প্রচুর অর্থ সংগৃহীত হয় এবং বহু আইনজীবী তাঁদের

ব্যবসা স্থগিত রাখেন। বগুড়ায় আদালতের বাইরে মামলা নিষ্পত্তির জন্য একটি জাতীয় সালিসি আদালত গঠিত হয়। মিউনিসিপ্যালিটি ও অন্যান্য সমিতি তাঁকে মানপত্র দেয়। টিলক তহবিলে অর্থদানের জন্য জনগণের বিভিন্ন শাখার মধ্যে প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে যায়। দেশের কাজে যারা এতদিন কোন অংশ নেয় নি তাদের মধ্যে অভূতপূর্ব উদ্দীপনা দেখা গেল। মেথর ও ঝাড়ুদারেরা এতদিন সমাজের সীমার বাইরে ছিলেল। এবার তাঁদেরই একজন বগুড়ায় জাতীয় সালিসি আদালতের সদস্য নির্বাচিত হলেন। বগুড়া ও দিনাজপুর দু জায়গাতেই মেথরদের পক্ষ থেকে ঘোষণা করা হয় যে তাঁরা মদ্য পান বন্ধ করবেন।

অনুরূপ উদ্দীপনা দেখা যায় জলপাইগুড়িতেও। প্রায় পঁচিশ হাজার লোকের এক সভায় শ্রী দাস ভাষণ দেন। স্বরাজ তহবিলে প্রচুর অর্থ সংগৃহীত হয় এবং আইনজীবীগণ ব্যবসা স্থগিত রাখেন। এই সভায় এক মর্মস্পর্শী দৃশ্য দেখা যায়। দুজন অন্ধ ভিক্ষুক প্রত্যেকে চার আনা পয়সা দান করে। আর একটি নতুন সূচনা হল নারীদের মধ্যে উত্তরোত্তর উদ্দীপনা। জলপাইগুড়িতে মহিলা সমিতি শ্রীমতী দাসকে মানপত্র দান করে।

উত্তরবঙ্গের একাধিক জনসভায় শ্রী দাস বক্তৃতা করেন। চাঁদপুর থেকে অখিলচন্দ্র দত্তের তারবার্তা পেয়ে তিনি সফর বাতিল করে চাঁদপুরে চলে যান। চা বাগানের বহু শ্রমিক ধর্মঘট করে চাঁদপুরে জমায়েত হয়েছিল।

বাংলাদেশের ও আসামের বৃহৎ শিল্প হল চা। ভারতের সকল জায়গা থেকে লোকে আসত আসামের শ্রীহট্ট, হবিগঞ্জ, ও অন্যান্য চা বাগানে কাজ করবার জন্য। নানা অসুবিধার মধ্যে তাদের কাজ করতে হত। এবং ক্রীতদাসের অবস্থা থেকে কোন অংশে তারা

ভাল ছিল না। জাতীয় চেতনার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তারাও নিজের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠে। এবং নিজেদের কাজের কতকগুলি সুবিধা তারা দাবী করে। সেই দাবী প্রত্যাখ্যাত হলে তারা সাধারণ ধর্মঘট ঘোষণা করে। এবং চা বাগান ছেড়ে দলে দলে চলে আসে চাঁদপুরে। অধিকাংশেরই পক্ষে চাঁদপুরই ছিল আসামে প্রবেশের পথ। শেষ গুরুত্বপূর্ণ রেলষ্টেশন এবং ষ্টীমার সার্ভিসের জংসন এই চাঁদপুর। সেখানে পৌঁছে শ্রমিকেরা দেখল তাদের দেখাশোনা করার কোন ব্যবস্থা সেখানে হয় নি। রাস্তায় ও রেলওয়ে প্লাটফর্মে তারা দিন কাটাচ্ছিল। .সেখানেই তাদের কষ্টের শেষ নয়, একরাতে পুলিশ ও সৈন্য এসে তাদের উপর অমানুষিক মারধোর করে এবং বহুলোক তাতে আহত হয়।

হয়তো কর্ত্তৃপক্ষেরা মনে করেছিলেন এই অত্যাচারমূলক ব্যবস্থায় শ্রমিকদের নৈতিক শক্তি ভেঙ্গে দেওয়া যাবে এবং তারা চা বাগানে ফিরে যেতে বাধ্য হবে। কিন্তু ফল হলো বিপরীত। রেল ও ষ্টীমারের কুলিরা চা বাগানের শ্রমিকদের সহানুভূতি জানাবার জন্য প্রতিবাদ ধর্মঘট করে বসলো। কয়েকদিন পরে আসাম বেঙ্গল রেলওয়ের এঞ্জিন ড্রাইভার ও কেরাণীরাও সেই ধর্মঘটে যোগ দিল। শ্রী যতীন্দ্র মোহন সেনগুপ্ত এই ধর্মঘটের নেতৃত্ব করেন। তিনি এই গুরুতর পরিস্থিতির কথা চিত্তরঞ্জনকে জানান।

চিত্তরঞ্জনের পক্ষে চাঁদপুর পৌঁছান সহজ ছিল না। ধর্মঘটের ফলে ষ্টীমার সার্ভিস বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। তখন ঝড়ের সময়। দেশীয় নৌকায় পদ্মা ও মেঘনার মত ভয়াল নদী অতিক্রম করার সাহস কেউ করত না। শেষ পর্য্যন্ত চিত্তরঞ্জন চাঁদপুরে পৌঁছান। তাঁকে দেখে শ্রমিকেরা আত্মহারা হয়ে যায়। শ্রী দাস শ্রমিকদের পক্ষে লড়বার প্রতিশ্রুতি দেন এবং ঘোষণা করেন যে এই ধর্মঘট শুধুমাত্র শ্রমিকদের দাবী দাওয়ার জন্যই করা হয় নি, এ হল

দেশব্যাপী জাতীয় আন্দোলনেরই অঙ্গ। শ্রমিকদের ত্রাণকার্য্য স্বয়ং তত্ত্বাবধান এবং তাদের মধ্যে নতুন উদ্দীপনা সঞ্চার করে চিত্তরঞ্জন চট্টগ্রাম অভিমুখে রওনা হন। সেখানে রেভারেণ্ড মিঃ সি. এফ. এণ্ডরুজ ও অন্যান্য বন্ধুগণ তাঁর সঙ্গে যোগ দেন।

চট্টগ্রাম থেকে ফেরার পথে চিত্তরঞ্জন মাদারীপুরে থেমেছিলেন। সেখানে কয়েকজন বিশিষ্ট উকিল সরকারী খেতাব ত্যাগ করেন ও আইন ব্যবসা স্থগিত রাখেন। চিত্তরঞ্জন কলকাতায় ফিরলেন। ৩০শে জুনের মধ্যে টিলক স্বরাজ তহবিলে বাংলার দেয় পনের লক্ষ টাকা তিনি সংগ্রহ করেন। তাঁর এই কৃতিত্বের উল্লেখযোগ্য দিক হল যে নিম্নতম থেকে উচ্চতম সকল শ্রেণীর লোক এই তহবিলে অর্থ দান করে।

সরকার পাল্টা আঘাত হানল। শ্রী যতীন্দ্র মোহন এবং চিত্তরঞ্জনের অন্যান্য সহকারীকে গ্রেপ্তার করে। ষ্টীমার ধর্মঘটে যাঁরা নেতৃত্ব করেছিলেন তাঁদেরকেও গ্রেপ্তার করা হলো। এই সব ক্ষতি অবশ্য পূরণ হলো সুভাষচন্দ্র বসুর আগমনে। সিভিল সার্ভিস থেকে তাঁর পদত্যাগের কথা আগেই বলা হয়েছে।

১৬ই জুলাই ১৯২১ তারিখে সুভাষচন্দ্র বম্বে পৌঁছান। তিনি মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে কতকগুলি প্রশ্ন করেন। একটি প্রশ্ন ছিল—এক বছরের মধ্যে স্বরাজ লাভের জন্য প্রস্তাবিত পন্থা সম্বন্ধে। সুভাষচন্দ্র মনে করেন এ বিষয়ে গান্ধীজীর উত্তর পরিস্কার নয়। এবং তিনি হতাশ হয়ে চলে আসেন। তারপর তিনি স্থির করেন মহাত্মা গান্ধীর পরামর্শ মত চিত্তরঞ্জনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন। কলকাতায় পৌঁছে সুভাষচন্দ্র ষ্টেশন থেকে সোজা চিত্তরঞ্জনের বাড়ী যান। কিন্তু চিত্তরঞ্জন তখন সফরে কলকাতার বাইরে ছিলেন। তবে কয়েকদিনের মধ্যেই তাঁদের সাক্ষাৎ হয়। সেই ঐতিহাসিক সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সুভাষচন্দ্রের বিবরণী নীচে দেওয়া হল—

"ভগ্নোদ্যম ও হতাশ হয়ে আমি ভাবছিলাম কি করবো। মহাত্মা গান্ধী আমাকে পরামর্শ দেন কলকাতায় গিয়ে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য। কেম্‌ব্রিজ থেকে চিত্তরঞ্জনকে আগেই লিখেছিলাম যে ভারতীয় সিভিল সার্ভিস থেকে আমি পদত্যাগ এবং রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগদানে মনস্থ করেছি। আমি শুনতে পেয়েছিলাম যে চিত্তরঞ্জন তাঁর ব্যারিষ্টারী জীবনের রাজকীয় আয় ত্যাগ করে রাজনৈতিক কাজে নিজেকে উৎসর্গ করেছেন এবং নিজের সমস্ত সম্পত্তি দেশকে দান করেছেন। এই মহান ব্যক্তিকে দর্শনের অধীর আগ্রহে আমি মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎকারের হতাশা জয় করতে পেরেছি এবং যে উত্তেজনা ও উৎসাহ নিয়ে আমি বম্বেতে এসেছিলাম অনুরূপ উত্তেজনা ও উৎসাহের সঙ্গে কলকাতা রওনা হলাম। কলকাতা পৌঁছে আমি সোজা দেশবন্ধু দাসের বাড়ী গিয়েছিলাম। আবার হতাশ হলাম। তিনি তখন বাংলাদেশে লম্বা সফর করছিলেন তাই তাঁর ফেরা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করা ছাড়া আর কোন উপায় ছিল না। তাঁর ফেরার খবর পেয়ে আমি আবার দেখা করতে যাই। এবারেও তিনি বাইরে ছিলেন। কিন্তু তাঁর স্ত্রী শ্রীযুক্তা বাসন্তী দেবী অত্যন্ত স্নেহের সঙ্গে আমাকে আপ্যায়ন করেন। চিত্তরঞ্জনের জন্য বেশীক্ষণ অপেক্ষা করতে হয় নি। আজও আমি মনশ্চক্ষে দেখতে পাই সেই বিরাট পুরুষ আমার দিকে এগিয়ে আসছেন। একদিন আমি—রাজনৈতিক কারণে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কৃত ছাত্র—পরামর্শের জন্য কলকাতার অন্যতম বিশিষ্ট ব্যারিষ্টার যে মিঃ দাসের সঙ্গে দেখা করেছিলাম ইনি সেই দাস নন। ইনি সেই দাস নন, যিনি দিনে হাজার হাজার টাকা উপার্জন করতেন এবং ঘণ্টায় হাজার হাজার টাকা খরচ করতেন। যদিও আগের মত তিনি প্রাসাদে বাস করছিলেন না তিনি ছিলেন সেই দাস যিনি চিরকাল তরুণদের বন্ধু, তাদের আশা আকাঙ্খা যিনি উপলব্ধি করতে পারতেন, আর তাদের দুঃখ দুর্দশার প্রতি যাঁর

ছিল বিরাট সহানুভূতি। তাঁর সঙ্গে কথা বলতে বলতে আমি বুঝতে পারলাম ইনিই সেই লোক যাঁর নিজের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা আছে, যিনি নিজের সবকিছু দিতে পারেন এবং অন্যের কাছ থেকে সবকিছু দাবী করতেও পারেন—ইনিই সেই লোক যাঁর কাছে তারুণ্য কোন ত্রুটি নয় বরং একটি গুণ বিশেষ। আমাদের কথা শেষ হবার আগেই আমি মনস্থির করে ফেলেছিলাম। উপলব্ধি করলাম আমি আমার নেতাকে পেয়েছি এবং তাঁকে অনুসরণ করব।"

সুভাষ বসু যোগ দেওয়াতে চিত্তরঞ্জন বিশেষ উৎসাহ বোধ করেন। কয়েকদিন পরে তিনি আরেকজন উল্লেখযোগ্য কর্মী পান। তিনি হলেন কিরণ শঙ্কর রায়। চিত্তরঞ্জন কংগ্রেসের কাজ নানা শাখায় ভাগ করে তা পরিচালনার জন্য এক একজন সহকারী নিয়োগ করেন। বীরেন্দ্রনাথ শাসমল প্রাদেশিক খিলাফত কমিটির কর্মসচিব হন। সুভাষ চন্দ্র বসু জাতীয় কলেজের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন এবং প্রচার কাজের ভারও তাঁকে দেওয়া হয়।

২৮শে জুলাই থেকে ৩রা আগষ্ট বম্বেতে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি ও কার্য্যকরী কমিটির বৈঠক বসে। এই অধিবেশনে দুটি গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব গৃহীত হয়। গান্ধীজী ও শ্রী দাস মিলেমিশে কাজ করেন। প্রথম প্রস্তাবে ইংলণ্ডের যুবরাজের আসন্ন ভারত পরিদর্শনকালে তাঁকে স্বাগত জানাতে জনগণকে নিষেধ করা হয়। প্রস্তাবটি ছিল নিম্নরূপ—

"জনগণের দাবী স্বীকার করতে সরকারের ব্যর্থতার ফলে দেশে যে উত্তেজনা ও অসন্তোষ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে তারই পরিপ্রেক্ষিতে কমিটি মনে করে যে এই ধরণের ব্যবস্থা—তা যতই বেদনাদায়ক হোক না কেন, কারণ বৃটেনের যুবরাজের বিরুদ্ধে কমিটির কোন অভিযোগ বা বিরূপ মনোভাব নেই—অবলম্বন করা তার কর্ত্তব্য

কারণ কমিটির মতে জাতীয় আন্দোলনের বিরুদ্ধে এ হল একটা রাজনৈতিক চাল। এবং পাঞ্জাব ও খিলাফৎ অন্যায়কারী আমলাতন্ত্রকে—যা ভারতকে তার জন্মগত অধিকার স্বরাজ থেকে দীর্ঘকাল দূরে রেখেছে—নৈতিক সমর্থন জানাবার উদ্দেশ্যে যুবরাজের ভারত আগমন হচ্ছে।"

অন্য প্রস্তাবে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি দেশের জনগণকে বেজওয়াড়া কার্য্যসূচী সাফল্যের সঙ্গে রূপায়িত করার জন্য অভিনন্দন এবং ৩০শে সেপ্টেম্বর থেকে বিলিতি কাপড় সম্পূর্ণ বর্জন করার জন্য আহ্বান জানান। বিলিতি কাপড় একত্র করে প্রকাশ্যে জ্বালাবার জন্য সুপারিশও করেন কংগ্রেস কমিটি। ব্যবসায়ীদের বলা হয় বিলিতি কাপড় ও তন্তু আমদানী বন্ধ করে বস্ত্রের দিক থেকে দেশকে স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে সাহায্য করার জন্য।

মহাত্মা গান্ধী মৌলানা মহম্মদ আলী ও অন্যান্য কয়েকজন নেতার সঙ্গে কলকাতায় এসে পৌঁছান ৪ঠা সেপ্টেম্বর, ১৯২১ তারিখে। ৮ই সেপ্টেম্বর হরিশ পার্কে অনুষ্ঠিত এক জনসভায় শ্রী দাস শ্রোতৃবৃন্দকে আবেদন জানান, তাঁদের বিলিতি কাপড় পোড়াবার জন্য মহাত্মা গান্ধীকে দিতে। প্রথমে কোন সাড়া পাওয়া যায় নি। কিন্তু চিত্তরঞ্জন দ্বিতীয়বার আবেদন জানাইতেই বিলিতি কাপড়ের পাহাড় জমে গেল এবং মহাত্মা গান্ধী স্বয়ং তাতে আগুন লাগান।

এই সময় চিত্তরঞ্জন আইন ব্যবসা পরিত্যাগ করা সত্ত্বেও তার নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটান পূর্ববঙ্গের সুপরিচিত নেতা পীর বাদশা মিয়াকে বাঁচাবার জন্য। ফৌজদারী দণ্ডবিধির ১০৮ ধারা অনুযায়ী পীর বাদশা মিয়াকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। আরেকজন ব্যক্তিকেও গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। তিনি হলেন ডাঃ সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—যিনি পরে অভয় আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন এবং একজন বিশিষ্ট শ্রমিক

নেতা হন। পীর বাদশা মিয়ার মামলা উপলক্ষে চিত্তরঞ্জন ফরিদপুরে গিয়েছিলেন।

রাজনৈতিক কাজের ফাঁকে ফাঁকে চিত্তরঞ্জন সাপ্তাহিক পত্রিকা 'বাংলার কথা'য় নিজের কাজ ও নীতি ব্যাখ্যা করতেন। পত্রিকাটি আত্মপ্রকাশ করে ৩০শে সেপ্টেম্বর ১৯২১ তারিখে মহাত্মা গান্ধীর ৫২তম জন্মতিথি উপলক্ষে। ১৯১৭ সালে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনে চিত্তরঞ্জন তাঁর সভাপতির ভাষণের যে শিরোনামা দিয়েছিলেন সেই অনুসারে পত্রিকার নামকরণ হয়েছিল। প্রথম সংখ্যায় পত্রিকাটির নীতি ও কার্য্যসূচী ঘোষণা করা হয়। দ্বিতীয় সংখ্যার নাম দেওয়া হয়েছিল 'স্বরাজসাধনা' এবং তৃতীয় সংখ্যার নাম দেওয়া হয়েছিল 'বস্ত্রযজ্ঞ'।

১৯২১ সালে লর্ড রিডিং ভারতের গভর্ণর জেনারেল ও বড়লাট রূপে কার্যভার গ্রহণ করেন। পণ্ডিত মদন মোহন মালব্য মহাত্মা গান্ধী ও বড়লাটের মধ্যে এক সাক্ষাৎকারের আয়োজন করেন। আলোচ্য বিষয়ের মধ্যে মৌলানা মহম্মদ আলি ও মৌলানা শওকত আলির কয়েকটি ভাষণের উল্লেখ ছিল। আলি ভ্রাতৃদ্বয়ের বক্তৃতায় সরকার ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন এবং বড়লাট জানান যে তাঁরা হিংসাত্মক কার্য্যে লিপ্ত হওয়ার জন্য জনগণকে প্ররোচিত করেছেন। ইতিমধ্যে করাচীতে খিলাফৎ সম্মেলনে সভাপতির ভাষণ দেওয়ার জন্য মহম্মদ আলিকে ওয়ালটেয়ারে গ্রেপ্তার করা হয়। আলি ভ্রাতৃদ্বয়ের ভাষণে হিংসাত্মক কার্য্যের জন্য প্রচ্ছন্ন উস্কানি আছে বলে সেগুলি ব্যাখ্যা করা যেতে পারে, এ বিষয়ে গান্ধীজী একমত হন এবং আলি ভ্রাতৃদ্বয়কে এজন্য দুঃখ প্রকাশ করতে বলেন। তারফলে কংগ্রেসীদের মধ্যে মতভেদ দেখা দেয়। কেউ কেউ আলি ভ্রাতৃদ্বয়ের কাজের নিন্দা করেন আবার কেউ কেউ এ বিষয়ে গান্ধীজীর ভূমিকারও বিরূপ সমালোচনা করেন। দেশবন্ধু দাস ও পণ্ডিত মদন

মোহন মালব্য পরবর্তী দলে ছিলেন। বেশীর ভাগ লোকের ধারণা তাঁরা দুজনেই গান্ধীজীর কাজের প্রতিবাদ করে তাঁকে চিঠি দিয়েছিলেন।

৫ই অক্টোবর বম্বেতে কংগ্রেস কার্য্যকরী কমিটির বৈঠকে এই অভিমত প্রকাশ করা হয় যে, মহম্মদ আলির ভাষণে ১৯২০ সালে কলকাতায় অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে গৃহীত প্রস্তাবের অংশ বিশেষের পুনরুল্লেখ ঘটেছে মাত্র। এই বৈঠকে আরও বলা হয় যে, "প্রত্যেক সরকারী কর্মচারীর—সামরিক ও অসামরিক—কর্তব্য হল সরকারী কাজ পরিত্যাগ করা। তবে তাঁকে কংগ্রেসের সাহায্য বিনা জীবিকা নির্বাহে সক্ষম হতে হবে।" কার্য্যকরী কমিটির নির্দেশে প্রস্তাবটি হাজার হাজার মঞ্চ থেকে ঘোষণা করা হয়।

সরকার প্রস্তাবটিকে প্রকাশ্য রাজদ্রোহ বলে মনে করেন। মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে সঙ্গে দেশবন্ধু দাস, পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু, লালা লাজপত রায় প্রমুখ করেকজন নেতা এই প্রস্তাবটি অনুমোদন করেন। সারা দেশে একটা নতুন উত্তেজনা পরিলক্ষিত হয়। আবহাওয়া যাতে অহিংস ও শান্তিপূর্ণ থাকে সেজন্য শ্রী দাস বিশেষ যত্ন নেন। তিনি ঘোষণা করেন, ১৭ই নভেম্বর ইংলণ্ডের যুবরাজের বম্বেতে অবতরণ করার দিনই হবে আসল পরীক্ষা। মহাত্মা গান্ধী সেদিন বম্বেতে ছিলেন। কিন্তু তা সত্বেও অবস্থার দ্রুত অবনতি ঘটে এবং সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা শুরু হয়ে যায়। বিপুল সংখ্যক হিন্দু মুসলমান যুবরাজকে স্বাগত জানাতে অস্বীকার করে কিন্তু কিছু খৃষ্টান ও পার্শী এই বর্জনের বিরোধিতা করে।

চিত্তরঞ্জন কলকাতায় ছিলেন। যুবরাজের আগমনে যাতে কেউ সাড়া না দেয় এবং আবহাওয়া যাতে শান্ত থাকে সেজন্য তিনি সর্ব প্রকার ব্যবস্থা অবলম্বন করেন। কলকাতা এক পরিত্যক্ত শহরের রূপ নেয়। সমস্ত বাজার, দোকান বন্ধ ছিল। স্কুল বন্ধ, আদালতে

কাজ বন্ধ। যে সব গাড়ীতে 'জাতীয় সেবায়' লেবেল ছিল সেগুলি ছাড়া অন্য কোন গাড়ী রাস্তায় চলাচল করতে পারে নি।

কলকাতায় হরতাল এত সফল হয়েছিল যে 'দি ইংলিশ ম্যান' ও 'দি ষ্টেটসম্যান' পত্রিকা দুটি, শহরের ভার কংগ্রেসী স্বেচ্ছাসেবকদের হাতে তুলে দিয়ে নিজেরা চুপ করে বসে থাকার জন্য সরকারকে তিরস্কার করে। ১৮ই নভেম্বর কলকাতায় গভর্ণমেণ্ট হাউসে পরামর্শ সভা বসে। তারপরেই ব্রিটিশ ব্যবসায়ীদের প্রতিষ্ঠান বেঙ্গল চেম্বার অফ্ কমার্স আদালতে নালিশ করে যে, হরতালের সময় লোকেদের ওপর বলপ্রয়োগ ও ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছে। অভিযোগটি সত্য নয়, তবু সরকার তারই ভিত্তিতে আঘাত হানতে মনস্থ করলেন। ১৯শে নভেম্বর সকালে শহরের লোক স্তম্ভিত হল একটা খবরে— পুলিশ মাঝ রাতে শহরের প্রায় সমস্ত কংগ্রেস ও খিলাফৎ অফিসে হানা দিয়েছে। 'দি ষ্টেটসম্যান' ও 'দি ইংলিশম্যান' চাঞ্চল্যকর খবর দিল যে কলকাতা ও শহরতলীতে কংগ্রেস ও খিলাফতের সকল স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানকে বে-আইনী ঘোষণা করা হবে। জনসভা নিষিদ্ধ এবং ফৌজদারী বিধি সংশোধনী আইন পুনরুজ্জীবিত করা হয়।

শ্রী দাস তখন সুরাটে কংগ্রেস কার্য্যকরী কমিটির বৈঠকে যোগদানের জন্য রওনা হচ্ছিলেন। তিনি সহকর্মীদের বললেন, হরতাল সফল হয়েছে বলেই সরকারের এই আক্রমণ। আরও অত্যাচার হতে পারে এবং শাসমল, সুভাষচন্দ্র ও মুজিবর গ্রেপ্তার হবেন বলে তিনি শঙ্কা প্রকাশ করেন। আগেই বলেছি, বীরেন্দ্রনাথ শাসমল ছিলেন কংগ্রেস কমিটির কর্মসচিব, সুভাষ বসু প্রচার সভার কর্মসচিব এবং মুজিবর রহমান খিলাফৎ কমিটির কর্মসচিব। শ্রী দাস সুরাট থেকে না ফেরা পর্য্যন্ত সহকারীদের অপেক্ষা করতে বলেন। তিনি জানান, মহাত্মা গান্ধী ও অন্যান্য সহকর্মীদের সঙ্গে আলোচনা করে নিজ কর্মপন্থা স্থির করবেন। শ্রী দাস কলকাতা

ছাড়ার পরেই কলকাতার পুলিশ কমিশনার এক বিজ্ঞপ্তি দ্বারা তিন মাসের জন্য জনসভা অনুষ্ঠান, বিক্ষোভ প্রদর্শন ও মিছিল নিষিদ্ধ করে দেন।

২২শে নভেম্বর সুরাটে কংগ্রেস কার্য্যকরী কমিটির বৈঠক অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল। ১৭ই নভেম্বর বম্বেতে গুরুতর গোলযোগ দেখা দিল। মহাত্মা গান্ধী প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ অনশন শুরু করলেন এবং বম্বেতে বৈঠক অনুষ্ঠানের পরামর্শ দিলেন। ২২শে ও ২৩শে নভেম্বর কার্য্যকরী কমিটির বৈঠক বসে। আলাপ আলোচনার ফলে প্রত্যেক প্রদেশকে আইন অমান্য আন্দোলন করার অনুমতি দেওয়া হয়। তবে কথায় ও কাজে সম্পূর্ণ অহিংস থাকতে হবে।

বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির বৈঠক বসে ২৭শে নভেম্বর। এই বৈঠকে আইন অমান্য আন্দোলন পরিচালনার জন্য দেশবন্ধুকে সকল ক্ষমতা দেওয়া হয়। স্থির হয়, স্বেচ্ছাসেবকরা ৩রা ডিসেম্বর রাস্তায় রাস্তায় খাদি বিক্রয় করবেন। প্রত্যেক দলে পাঁচজন করে স্বেচ্ছাসেবক থাকবেন। তাঁদের কোন ব্যাজ থাকবে না কিন্তু তাঁরা খাদি পরবেন। পাঁচজন ছাড়া আর একজন স্বেচ্ছাসেবক চরের কাজ করবেন। তিনি দূর থেকে দলের ওপর নজর রাখবেন, যাতে দলটি গ্রেপ্তার হলে সদর কার্য্যালয় তৎক্ষণাৎ খবর পেতে পারে।

২৪শে ডিসেম্বর—যেদিন যুবরাজের কলকাতায় আসার কথা—হরতাল ঘোষণা করা হয়।

৩রা ও ৪ঠা ডিসেম্বর দশটি স্বেচ্ছাসেবক দল পাঠান হয় কিন্তু কাউকেই গ্রেপ্তার করা হয় নি। শ্রী দাস এই কার্য্যসূচী আরও জোরদার করার সিদ্ধান্ত করেন। সেই সঙ্গে নিজেও কারাজীবনের কষ্টের জন্য তৈরী হতে শুরু করেন। শক্ত বিছানায় শয়ন এবং

বাড়ীর লোকের আপত্তি সত্বেও জেলের বরাদ্দ মত আহার্য্য গ্রহণ করতে লাগলেন। তিনি তাঁদের বোঝালেন যে কারাজীবনের জন্য এখন থেকে তৈরি হওয়া ভাল কারণ যে কোন মুহূর্ত্তে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হতে পারে।

লালা লাজপত রায়কে পাঞ্জাব রাজদ্রোহমূলক সভা আইন অনুসারে গ্রেপ্তার করা হয়। শ্রী দাস বলেন যে তিনি এ ধরণের সোজাসুজি আক্রমণ পছন্দ করেন। তিনি জনগণকে তাদের কাজে কর্মে পূর্ণ অহিংস থাকার আবেদন জানান। বম্বেতে যা ঘটেছে সেদিকে নজর রেখে সকলকে চিন্তায় ও কাজে অহিংস হতে হবে। কলকাতায় প্রায় পাঁচ হাজার লোক স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে নাম লিখিয়েছিলেন। কিন্তু অনেকেই আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণের কোন অভিপ্রায় না থাকা সত্বেও শপথে স্বাক্ষর দিয়েছিলেন। শ্রী দাস উপলব্ধি করলেন যে বেশী সংখ্যক লোক সত্যাগ্রহ করার জন্য এগিয়ে না আসার ফলে জনগণের উৎসাহে ভাটা পড়েছে। এই সময় তাঁর নিজের ছেলে একদল সত্যাগ্রহীর নেতৃত্ব করার জন্য এগিয়ে আসেন। তাঁকে গ্রেপ্তার করে কারাগারে পাঠান হয়। শ্রী দাসের কয়েকজন বন্ধু তাঁর ছেলের জন্য কারাগারে বিশেষ খাদ্য ও শয্যা নিয়ে যেতে চাইলে চিত্তরঞ্জন জানান, তাঁর কোন আপত্তি নেই তবে তাঁর ছেলের সঙ্গে ধৃত সকল সত্যাগ্রহীর জন্যই বিশেষ শয্যা ও আহার্য্যের ব্যবস্থা করতে হবে।

৭ই ডিসেম্বর ১৯২১ তারিখে সকালে আর একটি নতুন ঘটনা ঘটল। দেশবন্ধুর স্ত্রী বাসন্তী দেবী ও বোন ঊর্মিলাদেবী খাদি বিক্রিতে নেতৃত্ব করতে মনস্থ করেন। তাঁরা যখন তা করছিলেন জনৈক পুলিশ সার্জেণ্ট এগিয়ে এসে বাসন্তী দেবীকে জিজ্ঞাসা করল, "আপনি কি করছেন?" বাসন্তী দেবী জানালেন, তিনি খাদি বিক্রি করছেন ও জনগণকে ২৪শে

ডিসেম্বর হরতাল পালনের অনুরোধ জানাচ্ছেন। তখন সার্জেন্ট বলল যে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে এবং থানায় যেতে তাঁকে অনুরোধ করে। বাসন্তী দেবী বিনা আপত্তিতে থানায় যান। বাসন্তী দেবীর গ্রেপ্তারে জনগণের মধ্যে বৈদ্যুতিক তরঙ্গ খেলে গেল। অবিলম্বে হাজারের বেশী তরুণ এগিয়ে এল গ্রেপ্তার হওয়ার জন্য। তারা এক নতুন জঙ্গী কৌশল অবলম্বন করেছিল। ম্যাজিষ্ট্রেট তাঁদের বিবৃতি দিতে বললে তারা জানায়, তারা দেশসেবা করতে এসেছে, কোন অপরাধ করেছে বলে তারা মনে করে না। এই সময় যাঁরা কারাবরণ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন মহাত্মা গান্ধীর জ্যেষ্ঠ পুত্র হীরালাল গান্ধী।

প্রকৃতপক্ষে বাসন্তী দেবীর গ্রেপ্তারে সারা বাংলাদেশ নড়ে উঠল। হাজারে হাজারে হিন্দু মুসলমান জাতীয় আন্দোলনে যোগ দিল। এমন কি পুলিশের হৃদয় বিচলিত হল। বাসন্তী দেবী ও তাঁর সঙ্গীদের কারাগারে নিয়ে যাওয়ার সময় বেশ কয়েকজন পুলিশ কনষ্টেবল তাঁদের অভিবাদন জানায় ও চাকুরী ত্যাগ করার শপথ নেয়। কারখানার শ্রমিকেরাও স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে যোগ দেয় ও গ্রেপ্তার বরণের জন্য এগিয়ে আসে। এই নতুন পরিস্থিতিতে সরকার বিচলিত হয়ে পড়েন। অবিলম্বে পুলিশদের বেতন বৃদ্ধি করার জন্য আদেশ জারী করা হয়।

বাসন্তী দেবীর গ্রেপ্তারের খবর চিত্তরঞ্জন শান্ত মনে গ্রহণ করেন। তিনি কংগ্রেস কর্মীদের আরও দৃঢ়তার সঙ্গে জাতীয় কর্মসূচী রূপায়ণের উপদেশ দেন। ভারতীয় নারীদের সাহস ও স্বার্থত্যাগের মনোভাবের এই প্রমাণ পেয়ে তাঁর অন্তর উৎফুল্ল হয়ে উঠল। তিনি তাঁর কয়েকজন বন্ধুকে বলেন যে, সরকারের ভিত্তি যে নড়ে উঠেছে সে বিষয়ে তিনি নিশ্চিত। সরকারের অবশ্য এইসব

মহিলাদের কারাগারে রাখার কোন অভিপ্রায় ছিল না। গভীর রাত্রে তাঁদের মুক্তি দিয়ে বাড়ী পাঠিয়ে দেওয়া হয়। দেশবন্ধু এতে অপমান বোধ করেন এবং আন্দোলন চালিয়ে যেতে বদ্ধপরিকর হন।

পরদিন সকালে বাসন্তী দেবী ও তাঁর সঙ্গীরা আবার বেরোলেন। শহরের বিভিন্ন স্থানে সৈন্য মোতায়েন করা হয়। বহু নিরীহ পথচারী তাদের হাতে প্রহৃত হন। এই অকারণ আক্রমণের বলি হলেন অধ্যক্ষ হেরম্ব চন্দ্র মৈত্র—শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক এবং তদানীন্তন সরকারের প্রতি তাঁর প্রশ্নাতীত আনুগত্য ছিল। তবে বাসন্তী দেবী ও তাঁর সঙ্গীদের কাজে কোন বাধা দেওয়া হয়নি।

কয়েকদিন আগে বাংলাদেশের তদানীন্তন লাট লর্ড রোনাল্ডশে এক জনসভায় দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের প্রতি নিম্নরূপ শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেন—

"বিরাট যোগ্যতা এবং ভগবান দত্ত উচ্চ বুদ্ধিমত্তার অধিকারী বাংলাদেশের জনৈক ভদ্রলোক শীঘ্রই একটি সংস্থার--যা এখনও ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস বলে নিজেকে দাবী করে বলে আমার বিশ্বাস - অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন—তিনি যদি শুভেচ্ছা ধর্মের ধারক ও পূজারীরূপে এগিয়ে আসেন তাহলে যশের মন্দিরে কি সুন্দর স্থান তিনি পাবেন, ইতিহাসের পাতায় তাঁর নাম জ্বলজ্বল করবে! তিনি কি তাই করবেন? তাঁর ওপর বিরাট দায়িত্ব। তিনি যদি তাঁর শিষ্যদের বিপ্লবের পিছল পথে এগিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দেন তাহলে ক্ষুদ্রতম বুদ্ধির লোকের কাছে এটি স্পষ্ট হবে যে এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করা ছাড়া সরকারের অন্য উপায় নেই।"

ঘটনার গতিতে বিচলিত হয়ে লর্ড রোনাল্ডশে স্থির করেন যে, চিত্তরঞ্জনের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করে মীমাংসার ভিত্তি নিরূপণে

চেষ্টা করবেন। ৮ই ডিসেম্বর তাঁরা সাক্ষাৎ করেন এবং এক ঘণ্টার বেশী বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করেন।

যুবরাজের পরিদর্শন উপলক্ষ্যে হরতাল না করার জন্য শ্রী দাসকে রোনাল্ডশে অনুরোধ জানালে, তিনি বলেন, এ ব্যাপারে তাঁর কোন হাত নেই। তিনি নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির নির্দেশ মানছেন মাত্র। তারপর লর্ড রোনাল্ডশে স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানগুলির উল্লেখ করেন কিন্তু দেশবন্ধু বলেন, স্বেচ্ছাসেবকরা শান্তিপূর্ণভাবে নিজেদের কর্তব্য করছেন এবং তাঁদের গ্রেপ্তার করার কোন সঙ্গত কারণ সরকারের নেই। লর্ড রোনাল্ডশে এ পরিস্থিতি মেনে নিতে অসম্মত হন। তিনি বলেন যে আইনভঙ্গের কয়েকটি নজির আছে এবং সরকার আইন ও শৃঙ্খলা বজায় রাখতে বাধ্য। দেশবন্ধু বলেন, মাঝে মাঝে অহিংসা থেকে বিচ্যুতি ঘটলেও বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে স্বেচ্ছাসেবকেরা শান্তিপূর্ণভাবে কাজ করছেন এবং বাংলাদেশের সমস্ত স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানকে হিংসা ও রাজদ্রোহের অপরাধে দোষী সাব্যস্ত করা ঠিক নয়।

লর্ড রোনাল্ডশে জবাব দেন, আইনসভায় জনগণের প্রতিনিধিদের পরামর্শ মত সরকার কাজ করছেন। শ্রী দাস প্রতিবাদ জানিয়ে বলেন, আইনসভার সদস্যেরা জনপ্রতিনিধি নন। লর্ড রোনাল্ডশের পাল্টা জবাব, কংগ্রেস নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করেনি অতএব উক্ত সদস্যদের নির্বাচন চ্যালেঞ্জ করার অধিকার তার নেই। শ্রী দাস নিজেই আইনসভা বর্জন করা ভুল হয়েছে বলে মনে করতেন বলে এ বিষয়ে আর তর্কাতর্কি করেননি।

চিত্তরঞ্জন স্বেচ্ছাসেবকদের কথা আবার তোলেন। তিনি বলেন বহুক্ষেত্রে পুলিশ স্বেচ্ছাসেবকদের মারপিট করে পয়সা ছিনিয়ে নিয়েছে। প্রকৃতপক্ষে আইন রক্ষকেরা নিজেরাই যথেচ্ছ আইনভঙ্গ

করছে। কিন্তু লর্ড রোনাল্ডশে বলেন, এ ধরণের কোন খবর তিনি পাননি।

লর্ড রোনাল্ডশে স্বেচ্ছাসেবকদের কার্য্যকলাপ বন্ধ করার জন্য আবার শ্রী দাসের ওপর চাপ দেন। শ্রী দাস জবাব দেন যে, স্বেচ্ছাসেবকেরা তাঁদের কর্তব্য পালন করছেন মাত্র। এটি তাঁদের কাছে ধর্মের অঙ্গবিশেষ। অতএব তিনি তাঁদের নিবৃত্ত হতে বলতে পারেন না।

লর্ড রোনাল্ডশে বলেন, সরকারের দৃষ্টিভঙ্গীতে স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানগুলির কার্য্যকলাপ অবাঞ্ছনীয় এবং আইন ও শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য তাঁকে সকল প্রকার ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে। শ্রী দাস জবাব দেন, তিনি বৃদ্ধ হচ্ছেন কিন্তু জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্য্যন্ত দেশে বর্তমান কানুনবিহীন কানুনের বিরুদ্ধে কাজ করে যাবেন।

বাসন্তী দেবীকে গ্রেপ্তারের জন্য লর্ড রোনাল্ডশে দুঃখ প্রকাশ করে বলেন, বন্ধুভাবে আপোষ নিষ্পত্তির সম্ভাবনা যখন নেই তখন আন্দোলন দমনের জন্য সরকার সকল প্রকার ব্যবস্থাই অবলম্বন করবেন। এই সাক্ষাৎকারের পর শ্রী দাস স্পষ্ট বুঝতে পারলেন যে তাঁকে শীঘ্রই গ্রেপ্তার করা হবে। তাঁর অবর্তমানে কাজকর্ম কিভাবে চলবে তারই নির্দেশ দিলেন কয়েকদিন ধরে।

১০ই ডিসেম্বর ১৯২১ তারিখে বিকেল ৪টের সময় শ্রী দাস কন্যাদের সঙ্গে চা পান করেছিলেন, এমন সময় একগাড়ী পুলিশ এল। মেয়েদের মধ্যে একজন চীৎকার করে উঠল, সার্জেণ্ট এসেছে। শ্রী দাস এক টুকরো কাগজে স্বদেশবাসীর উদ্দেশ্যে সংক্ষিপ্ত বাণী লিখে মেয়ের হাতে দিলেন।

বীরেন্দ্রনাথ শাসমল তখন একতলার ড্রইংরুমে বসেছিলেন। জনৈক পুলিশ অফিসার ড্রইংরুমে ঢুকে তাঁর নাম জিজ্ঞাসা করলেন।

শাসমল তাঁর নাম বলামাত্র তাঁকে জানান হল যে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। দুজন ডেপুটি পুলিশ কমিশনার দোতলায় গেলে দেশবন্ধু তাঁদের জিজ্ঞাসা করেন, "আপনারা কি আমায় গ্রেপ্তার করতে এসেছেন?" তাঁরা হাঁ জানালে তিনি গ্রেপ্তারি পরোয়ানা দেখতে চান। একজন অফিসার বললেন, পরোয়ানাটি ফেলে এসেছেন তবে ফৌজদারী বিধি সংশোধনী আইন অনুসারে চিত্তরঞ্জনকে গ্রেপ্তার করা হচ্ছে। শ্রী দাসের মন্তব্য, "ও সেই পচা আইনটা, যার সাহায্যে আমার ছেলেদের আপনারা গ্রেপ্তার করছেন।"

দেশবন্ধুকে নিয়ে যাওয়ার সময় তিনি মেয়েদের নিষেধ করলেন বাড়ী থেকে কোন খাবার তাঁর জন্য পাঠাতে। শ্রী দাস চিরকাল ভাল খাদ্য খেয়েছেন তাই স্বভাবত মেয়েরা উদ্বিগ্ন হয়। কিন্তু তিনি স্পষ্ট জানালেন অন্যান্য বন্দীদের যা খেতে দেওয়া হচ্ছে এখন থেকে তিনি তাই খাবেন। তাঁর ছেলে ও অন্যান্যেরা—যাঁদের চারদিন আগে গ্রেপ্তার করা হয়েছে—যা খেতে পাচ্ছে না তিনি তা কিছুতেই খাবেন না।

পুলিশের গাড়ীতে ওঠার আগে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন সমবেত জনতার উদ্দেশ্যে বলেন, "আমাদের লক্ষ্য যদি মহান হয় তাহলে পরিণামের জন্য দুশ্চিন্তা করবেন না। দেশে যে আগুন আজ জ্বলেছে তা নিভবে না। ফল ভগবানের হাতে। আপনাদের কাজে সম্পূর্ণ অহিংস থাকুন, আপনাদের লক্ষ্য নিশ্চয়ই সাধিত হবে।

"ভারতের নরনারী আপনাদের প্রতি এই আমার বাণী। কষ্টভোগের মধ্যে দিয়ে জয়লাভে আপনারা যদি প্রস্তুত থাকেন তাহলে তা আমাদের দৃষ্টিগোচরে আসবেই আসবে।"

শঙ্খধ্বনি ও পুষ্প বর্ষণের মধ্যে শ্রী দাসের গাড়ী এগিয়ে গেল।

নবম অধ্যায়

বিচার ও বন্দীজীবন

১০ই ডিসেম্বর ১৯২১ তারিখে দেশবন্ধুকে প্রেসিডেন্সী জেলে স্থানান্তরিত করা হয়। ১২ই ডিসেম্বর অন্যতম ডেপুটি কমিশনার মিঃ কিড তাঁর সঙ্গে জেলে দেখা করতে আসেন। দেশবন্ধু আবার গ্রেপ্তারি পরোয়ানাটি দেখতে চান। মিঃ কিড এবার জানান যে তাঁকে কোন পরোয়ানার সাহায্যে গ্রেপ্তার করা হয়নি, ফৌজদারী দণ্ডবিধির ৫৪ ধারা অনুসারে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

তখন শ্রী দাস জানতে চান, তিনি আইন ব্যবসা ত্যাগ করার পর উক্ত আইনটির কোন সংশোধন করা হয়েছে কিনা। অবাক হয়ে কিড জানতে চাইলেন এ প্রশ্নের কারণ কি। দেশবন্ধু উত্তর দিলেন ফৌজদারী দণ্ড বিধির ৫৪নং ধারা শুধুমাত্র বোধগম্য অপরাধের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট লোকদের এই ধারা অনুযায়ী গ্রেপ্তার করা যেতে পারে না। মিঃ কিড দ্রুত পলায়ন করতে বাধ্য হলেন।

সেদিনই চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে দেশবন্ধুকে হাজির করা হয়। ২০শে জানুয়ারি ১৯২২ তারিখ পর্য্যন্ত মামলা স্থগিত থাকে। আদালতে অভূতপূর্ব ভীড় হওয়ার ফলে ম্যাজিস্ট্রেট জেল অভ্যন্তরে বিচার নির্বাহের নির্দেশ দেন। আদালতে ভীড় নিয়ন্ত্রণ করা পুলিশের পক্ষে শক্ত হয়ে পড়েছিল। জনতার সঙ্গে রূঢ় ব্যবহার করলেই সংঘর্ষ বাধছিল।

শ্রী দাসের গ্রেপ্তারের কয়েকদিন পরে সরকারের পক্ষ থেকে একটি প্রস্তাব করা হয়। তা যদি ঠিকমত কাজে লাগান যেত তাহলে ভারতের ইতিহাসের মোড় ঘূরে যেত। কলকাতায় হরতালের সাফল্য সরকারকে অভিভূত করেছিল। স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানগুলি যেভাবে কাজ করে এবং তা থেকে বড় কথা, পুলিশের মধ্যে অসন্তোষ দেখে সরকারী আমলারা ঘাবড়ে যায়। অন্যদিকে দেশবন্ধুর শক্তিশালী নেতৃত্বে দেশে নতুন আশা ও শক্তির সঞ্চার হয়েছিল। ২৪শে ডিসেম্বর—সেদিন কলকাতায় যুবরাজের আসার কথা—হরতাল এড়াবার জন্য সরকার বিশেষ উদ্বিগ্ন ছিলেন।

যুবরাজের আগমনের প্রায় এক সপ্তাহ আগে লর্ড রিডিং কলকাতায় গিয়েছিলেন। তিনি হয়তো মনে করেছিলেন কংগ্রেসের সঙ্গে মিটমাটের জন্য আরেকবার চেষ্টা করা দরকার যাতে যুবরাজের ভারত পরিদর্শন বিনা গোলমালে সমাপ্ত হতে পারে। পণ্ডিত মদন মোহন মালব্য সেণ্ট্রাল প্রেসিডেন্সী জেলে গিয়ে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস ও মৌলানা আবুল কালাম আজাদের সঙ্গে কয়েকবার আলোচনা করেন। শ্রী দাস যাতে তাঁর সহকর্মীদের, বিশেষ করে, মহাত্মা গান্ধীর সাথে আলোচনা করতে পারেন সেজন্য তাঁকে টেলিফোন ব্যবহারের সুবিধা দেওয়া হয়েছিল। ১৯শে ডিসেম্বর ১৯২১ তারিখে দেশবন্ধু দাস ও মৌলানা আজাদ সরকারের সঙ্গে একটা সাময়িক আপোষ করতে রাজী হন এই সর্তে—কংগ্রেস ২৪শে ডিসেম্বর হরতাল বাতিল করবেন এবং পিকেটিং ও বর্জনের জন্য স্বেচ্ছা-সেবকদলও পাঠাবে না। অন্যদিকে সরকার ফৌজদারী বিধি সংশোধনী আইন বা রাজদ্রোহমূলক সভা আইন বলে ধৃত সকল বন্দীকে মুক্তি দেবেন। তারপর এক গোলটেবিল বৈঠক আহ্বান করা হবে যাতে স্বরাজ, খিলাফৎ ও পাঞ্জাবের অন্যায় প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা করা হবে।

দেশবন্ধু দাস ও মহাত্মা গান্ধীর মধ্যে তার বিনিময় হয়। চিত্তরঞ্জন সরকারের সঙ্গে নিষ্পত্তির এইসব চুক্তিতে গান্ধীজীর অনুমোদন প্রার্থনা করেন। মহাত্মা গান্ধী গোলটেবিল বৈঠকের তারিখ এবং কাদের নিয়ে বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে জানতে চান। তিনি আরও দাবী করেন যে আলী ভ্রাতৃদ্বয় ও অন্যান্য ফতোয়া বন্দীদেরও মুক্তি দিতে হবে। দেশবন্ধু দাস জানান গোলটেবিল বৈঠক ১৯২২ সালের জানুয়ারী মাসে অনুষ্ঠিত হবে এবং মহাত্মা গান্ধী, দেশবন্ধু দাস, আলী ভ্রাতৃদ্বয়, পণ্ডিত মতিলাল নেহরু ও মৌলানা আজাদসহ কংগ্রেসের বিশজন প্রতিনিধি এই বৈঠকে যোগ দেবেন। ফতোয়া বন্দীদের সম্বন্ধে জানান তাঁরা সময়মত মুক্তি পাবেন।

মহাত্মা গান্ধী প্রথমে রাজী হননি এবং দুই নেতার মধ্যে তার বিনিময় হতে থাকে। অবশেষে তিনি যখন তাঁর মত দিলেন তখন অনেক দেরী হয়ে গেছে। তাঁর শেষ টেলিগ্রাম এমন সময় পৌঁছাল যখন বড়লাট কলকাতা ছেড়ে চলে গেছেন এবং তাঁদের পরিষদের বৈঠক কলকাতায় শেষ হয়ে গেছে। যুবরাজ কলকাতায় পৌঁছালে তাঁকে পূর্ণ হরতালের মাধ্যমে অভিনন্দন জানানো হয়। এই বর্জনের সাফল্যে দেশবন্ধু দাস আনন্দিত হলেও তিনি উপলব্ধি করলেন যে সরকারের সঙ্গে আপোষ নিষ্পত্তি করার সুবর্ণ সুযোগ হারানো হয়েছে।

২০শে জানুয়ারী ১৯২২ তারিখে জেল অভ্যন্তরে বিচার শুরু হয়। শুধু জনসাধারণ নয় সাংবাদিকদেরও সেখানে প্রবেশ করতে দেওয়া হয়নি। কেবল উকিলেরা জেলের ভেতরে যেতে পারতেন। এমন কি তাদেরকেও এজন্য বেগ পেতে হত। বিচার শুরু হলে দেশবন্ধু দাস ম্যাজিষ্ট্রেটকে প্রশ্ন করেন এই বিচার কি প্রকাশ্যে না

গোপনে হচ্ছে ? ম্যাজিষ্ট্রেট জবাব দেন এটি প্রকাশ্য বিচার হচ্ছে। কিন্তু শ্রী দাস যখন উল্লেখ করেন যে ব্যারিষ্টারদেরও পর্য্যন্ত এ আদালতে উপস্থিত থাকার অনুমতি দেওয়া হচ্ছে না, ম্যাজিষ্ট্রেট তখন কোন জবাব দিতে পারেন নি। চিত্তরঞ্জনের বিরুদ্ধে ফৌজদারী বিধি সংশোধনী আইনের ১৭ (২) ধারা অনুযায়ী অভিযোগ দায়ের করা হয়। স্থির হয় যে শুনানীর পরদিন বিচার প্রকাশ্য আদালতে অনুষ্ঠিত হবে। ২৪শে জানুয়ারী দেশবন্ধু দাসের ইনফ্লুয়েঞ্জা হয়। কয়েকদিন পরে জ্বর ছেড়ে যায় কিন্তু তিনি ক্রমাগত দুর্বল ও রোগা হতে থাকেন। অবশেষে ৭ই ফেব্রুয়ারি চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের সামনে দেশবন্ধুকে উপস্থিত করা হয়। বিচার চলাকালে দেশবন্ধু কোনরূপ বিবৃতি দিতে বা সাক্ষীদের জেরা করতে বা আত্মপক্ষ সমর্থনে কোন প্রমাণ দাখিল করতে অস্বীকার করেন। তখন ম্যাজিষ্ট্রেট তাঁকে ছয় মাস বিনাশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেন। আদালতে উপস্থিত সকলের হৃদয় আবেগপূর্ণ হলেও চিত্তরঞ্জন সম্পূর্ণ অবিচলিত ছিলেন। ম্যাজিষ্ট্রেট রায় দেবার পর এক বিবৃতিতে তিনি বলেন, এই পরিস্থিতিতে নিজেকে বাঁচাবার চেষ্টা করা একদম বৃথা। তিনি উল্লেখ করেন, যে তিনটি স্বাক্ষরের জন্য তাঁকে দণ্ডিত করা হল সেগুলি তাঁর নয়। যদিও ফতোয়াগুলি তাঁরই নির্দ্দেশে প্রচার করা হয়েছিল। হস্তলিপি বিশারদ শপথ গ্রহণ করে সাক্ষ্যদানকালে বলেন যে স্বাক্ষরগুলি চিত্তরঞ্জনের। চিত্তরঞ্জন সেকথা অগ্রাহ্য করে বলেন এতে শুধু এই প্রমাণিত হয় যে সরকারী আমলারা যাকে খুশী তাকে জেলে পাঠাতে পারেন।

দেশবন্ধুদাসকে সেণ্ট্রাল জেলে স্থানান্তরিত করা হয়। সেখানে বহু বন্ধু ও অনুগামীর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। তাঁর পুত্র চিররঞ্জন দাস সেখানে আগেই ছিলেন। সেই সঙ্গে ছিলেন সুভাষচন্দ্র বসু,

হেমন্ত সরকার ও বীরেন্দ্রনাথ শাসমল। মৌলানা আবুল কালাম আজাদও ঐ জেলে ছিলেন এবং চিত্তরঞ্জনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসেন। দেশবন্ধু দাস অসুখে ও অনিদ্রায় ভুগতে সুরু করলেন। ১৫ই মার্চ সরকার তাঁর স্বাস্থ্য সম্বন্ধে এক বিবৃতিতে বলেন, প্রতিদিন বিকেলে তাঁর জ্বর হচ্ছে তাছাড়া আর কোন জটিলতা নেই। তদানীন্তন কার্যনির্বাহক পরিষদের সদস্য স্যার আব্দুল রহিম এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করেন এবং দেশবন্ধুকে বাড়ীর তৈরী খাবার দেবার এবং কলকাতার বিখ্যাত হোমিওপ্যাথ চিকিৎসক শ্রী ডি. এন. রায় কর্তৃক তাঁর চিকিৎসার ব্যবস্থা করার আদেশ দেন। তা সত্বেও ওজন কমতে থাকে এবং বহুমূত্ররোগের লক্ষণ দেখা যায়।

আমেদাবাদে আসন্ন কংগ্রেস অধিবেশনের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন দেশবন্ধু। তিনি জেলে থাকায় তাঁর ভাষণ তিনি ভগিনী উর্মিলা দেবীর হাতে পাঠিয়ে দেন। বাসন্তী দেবীও একটি সংক্ষিপ্ত ও মর্মস্পর্শী বাণী পাঠান। প্রকাশ্য অধিবেশনে চিত্তরঞ্জনের ভাষণ পাঠ করেন শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু। এবং তাঁর অনুপস্থিতিতে সভাপতিত্ব করেন হাকিম আজমল খাঁ।

কংগ্রেস অধিবেশনের পর মহাত্মা গান্ধী গুজরাতে বার্দোলিতে আইন অমান্য আন্দোলন করার প্রস্তাব করেন। এই কার্য্যসূচীতে ভূমিশুল্ক ও অন্যান্য কর দিতে বিরত থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়। এই আন্দোলন সুরু হবার আগেই গোরক্ষপুর জেলায় চৌরীচৌরাতে এক শোচনীয় ঘটনা ঘটে যাতে বেশ কয়েকজন পুলিশ নিহত হয়। মহাত্মা গান্ধী অবিলম্বে কার্য্যকরী কমিটির বৈঠক আহ্বান করেন এবং বারদৌলীতে প্রস্তাবিত আইন অমান্য আন্দোলন অনির্দিষ্ট কালের জন্য স্থগিত রাখেন। তিনি সমস্ত প্রদেশ কংগ্রেসকে স্বেচ্ছা-

সেবকদের কার্য্যকলাপ বন্ধ এবং সমস্ত জনসভা ও মিছিল বন্ধ রাখার নির্দেশ দেন। এ সমস্ত কাজ বন্ধ করে কংগ্রেসের সকল সদস্যকে চরখা চালাবার সুপারিশ করেন।

গান্ধীজীর এই সিদ্ধান্তে চিত্তরঞ্জন অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়েন। তিনি তাঁর সহকারীদের বলেন, "বার্দোলিতে গণ আইন অমান্য আন্দোলন বন্ধ রাখার জন্য মহাত্মাজীর যে কোন যুক্তি থাক না কেন, বাংলাদেশে স্বেচ্ছাসেবকদের কাজ—যার ফলে সরকারের কাজকর্ম প্রায় বন্ধ হয়ে এসেছে—থামিয়ে দেওয়ার কোন যুক্তি তাঁর নেই। এই দ্বিতীয়বার মহাত্মাজী পরিস্থিতি কাজে লাগাতে ব্যর্থ হলেন।"

সুভাষচন্দ্রও দেশবন্ধুর ক্ষোভের কথা লিপিবদ্ধ করেছেন— "মহাত্মাজী বার বার ভুল করাতে রাগে দুঃখে দেশবন্ধু আত্মহারা হয়ে পড়েন। বার্দৌলি থেকে পশ্চাদপসরণ, এক প্রচণ্ড আঘাতের মত।"

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন ছাড়াও কংগ্রেসের অন্যান্য নেতারা মহাত্মা গান্ধীর এই সিদ্ধান্তে অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন। মৌলানা আবুল কালাম আজাদ বর্তমান লেখককে বলেন যে, সারা ভারত অহিংস থাকবে তা আশা করা অন্যায়। তিনি মন্তব্য করেন, কোন এক বিশেষ গ্রামের অন্যায়ের জন্য সারা প্রদেশকে শাস্তি দান, অত্যন্ত বাড়াবাড়ি হচ্ছে।

পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু ও লালা লাজপত রায় তীব্রতর ভাষায় প্রতিবাদ জানান। লালা লাজপত রায় সত্তর-পৃষ্ঠা ব্যাপী এক পত্রে বলেন, "সারা দেশকে শাস্তি দেওয়া হয়েছে। কন্যাকুমারিকার অধিবাসীদের অন্যায়ের জন্য হিমালয় সীমান্তবাসীদের শাস্তিদান করা কি উচিত?"

কংগ্রেসের নীতির এই আকস্মিক পশ্চাদ্গতিতে সারা দেশের নৈতিক শক্তি ভেঙ্গে পড়ে। সরকার এবার গান্ধীর ওপর আঘাত হানার মত যথেষ্ট শক্তি নিজের আছে বলে মনে করেন। 'ইয়ং ইণ্ডিয়া' পত্রিকায় কয়েকটি প্রবন্ধ প্রকাশের দায়ে মহাত্মা গান্ধীকে ১০ই মার্চ ১৯২২ তারিখে গ্রেপ্তার করা হয়। বিচারে তাঁর ছ'বছর বিনাশ্রম কারাদণ্ড হয়। দেশের পরিস্থিতি সহজেই কল্পনা করা যায়। সম্প্রতি কালের উদ্দাম উৎসাহ থেকে দেশ হতাশা ও বিষাদের গভীর অন্ধকারে নিমজ্জিত হল।

দেশবন্ধুকে শাস্তির আদেশ দেওয়ার পর জেলর তাঁকে প্রশ্ন করেন, তিনি কি ইউরোপীয় বন্দীর শ্রেণীভূক্ত হতে চান? প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, তখন ইউরোপীয় শ্রেণীভূক্ত বন্দীদের কয়েকটি বিশেষ সুবিধে দেওয়া হত। শ্রী দাস বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করে জানান, তিনি নিছক ভারতীয় হিসাবে গণ্য হতে চান।

কারাগারে তিনি সময় অতিবাহিত করতেন পড়া লেখা ও বন্ধুদের সঙ্গে বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করে। তাঁর পাঠ্য বিষয়ের মধ্যে ছিল ইতিহাস, রাজনীতি, দর্শন ও অর্থনীতি। সকালে তিনি ভারতীয় জাতীয়তাবাদের ইতিহাস ও দর্শন সম্বন্ধে একটা বই লিখতেন।

কারাগারে তাঁর অবসর বিনোদনের আর একটি উপায় ছিল, নাটক ও মঞ্চ সম্বন্ধে কথা বলা। লণ্ডনে স্যার হেনরী আরভিং ও এলেন টেরির অভিনয় দেখে আনন্দ পাওয়ার কথা তিনি উল্লেখ করতেন। অন্যান্য বন্দীদের নাটক অভিনয় করার জন্য তিনি বলেন। বিখ্যাত নাট্যকার গিরিশ চন্দ্র ঘোষের "প্রফুল্ল" নাটকটি নির্বাচিত হয়। মহড়া ও তোড়জোড়ে সকল বন্দীই ব্যস্ত ছিলেন।

তারপর একদিন নাটকটি মঞ্চস্থ হল। এই প্রথম ভারতীয় জেলের অভ্যন্তরে নাটক অভিনীত হল।

একদিন আইন সভায় প্রবেশ সম্বন্ধে কংগ্রেসের মনোভাব নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল। জনৈক কর্মী বললেন, পরিষদে যোগ দিলে অসহযোগ আন্দোলন ব্যাহত হবে। দেশবন্ধু তা মানতে অস্বীকার করেন। তিনি বলেন, আইন সভার বাইরে ও ভেতর থেকেও অসহযোগ করা যায়। প্রকৃতপক্ষে আইন সভার ভেতরে থেকে বিরোধিতা করে সংস্কার ব্যবস্থা অধিকতর সাফল্যের সঙ্গে বানচাল করা যেত। এবং তাতে আমলারা অসহায় বোধ করত।

আইনসভার ভেতরে কংগ্রেসের কার্য্যসূচী কি হবে, প্রশ্ন করা হলে দেশবন্ধু উত্তর দেন, কংগ্রেসীরা সরকারের প্রত্যেক কাজে বাধা দেবেন। তাঁরা সারা দেশ ও বহির্বিশ্বকে দেখিয়ে দেবেন যে সংস্কার ব্যবস্থায় আদৌ কোন সুফল হয় নি। বর্তমান সংবিধান তাঁরা সংশোধন বা খতম করবেন।

জনৈক সমালোচক সংস্কার ব্যবস্থাকে একটি ছল বলে উল্লেখ করলে শ্রী দাস জবাব দেন, ওকথা এখন বলা নিষ্প্রয়োজন। আমলাতন্ত্র যা খুশী তাই করছে অথচ তাদের সমস্ত কাজের পেছনে আইনসভার অনুমোদন আছে। সমস্ত বিধান পরিষদগুলিতে যত দমনাত্মক আইন গৃহীত হচ্ছে। তিনি তারপর লর্ড রোনাল্ডশের একটি উক্তির উল্লেখ করেন। লর্ড রোনাল্ডশে বলেছিলেন, সরকার জনগণের প্রতিনিধিদের পরামর্শ মত কাজ করছেন অতএব এ সমস্ত ব্যবস্থার জন্য ব্রিটিশ দায়ী নয়। দেশবন্ধু দাস বলেন, পরিষদের বর্ত্তমান সদস্যগণ যে জনগণের প্রকৃত প্রতিনিধি নন, তা জানান দরকার।

সমালোচকদের মনে তখনও প্রশ্ন থেকে যায়। তাঁরা জানতে চান কংগ্রেস দেশের সমস্ত বিধান পরিষদ দখল করলে সকল প্রকার দমনাত্মক কাজ কি বন্ধ হবে।

দেশবন্ধু দাস বলেন, এ ধরণের অবস্থা আশা করা বাড়াবাড়ি হবে। তবে এর ফলে সরকারের সকল কাজে আর জন সমর্থনের ছাপ পড়বে না। আইন সভায় দুটি দল থাকবে—সরকারী দল ও জনতার দল। আমলারা তখনও হয়ত নিজেদের ইচ্ছামত কাজ করবে কিন্তু তাদের তা করতে হবে নিজেদের দায়িত্বে। এতে জনগণকে জাগান এবং জাতীয় আন্দোলন চালিয়ে যাওয়া সহজ হবে।

জনৈক কর্মী জানতে চান পরিষদে প্রবেশ ধর্মবিরুদ্ধ হবে কিনা। দেশবন্ধু এ প্রশ্নে মজা পান। তিনি জবাব দেন, আইন অমান্য যেমন ধর্মবিরুদ্ধ নয়, তেমনি আইনসভায় প্রবেশও ধর্মবিরুদ্ধ নয়।

আর একজন কর্মী বলেন, আইন সভায় যোগ দিলে দেশ ইতিমধ্যে যা কিছু লাভ করেছে তা সবই সরকার কেড়ে নেবেন। শ্রী দাস জবাব দেন, সরকার প্রকৃতপক্ষে কিছুই দেন নি। আমলাতন্ত্রের কাছ থেকে যথার্থ কল্যাণ কিছুতেই আসতে পারে না। প্রকৃতপক্ষে, দ্বৈত শাসন ব্যবস্থায় আমলারা মন্ত্রীদের আদৌ বিশ্বাস করেন নি। সামান্য যা কিছু দেওয়া হয়েছে তা দেওয়া ছাড়া সরকারের গত্যন্তর ছিল না।

জনৈক প্রশ্নকারী জানতে চান, দেশবন্ধু কি সরকারের ভাল মন্দ সব ব্যবস্থারই বিরোধিতা করার পক্ষপাতী? তার জবাবে শ্রী দাস জানান যে, আমলাতন্ত্র প্রকৃত কল্যাণসাধন করতে পারে বলে তিনি বিশ্বাস করেন না। তিনি স্বীকার করেন যে, দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপনের মত কতগুলি সাময়িক উপকার করা হয়েছে কিন্তু তাতে

জনগণের প্রকৃত সেবা হতে পারে না, স্বরাজ ত কোনমতেই আসতে পারে না।

তিনি মন্ত্রীত্ব গ্রহণ করবেন কিনা প্রশ্ন করা হলে শ্রী দাস জোরের সঙ্গে জানান, না। তিনি বলেন, সরকারী কার্য্যভার গ্রহণ হবে সহযোগিতার নামান্তর। তবে সমস্ত বিভাগ জনগণের নিয়ন্ত্রণে আনা হলে তিনি কার্য্যভার নিতে ইচ্ছুক হতে পারেন। বাস্তববোধ সম্পন্ন রাজনৈতিক হওয়ার জন্য তিনি মনে করতেন যে, দেশকে স্বরাজ লাভের জন্য প্রাদেশিক স্বায়ত্বশাসন দিয়ে শুরু করতে হতে পারে।

আইনসভায় প্রবেশের ফলে স্বরাজ লাভ কি করা যাবে, প্রশ্ন করা হলে শ্রী দাস বলেন, জনপ্রিয় দল আইনসভা দখল করে প্রত্যেক ক্ষেত্রে যদি জনগণের মনোভাব ব্যক্ত করে তাহলে আপোষ নিষ্পত্তি করতে ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট অবশ্যই বাধ্য হবে। তাহলে আইন অমান্য আন্দোলন না করেও আমাদের লক্ষ্য সাধন করা যাবে।

দেশবন্ধুর এই উক্তিতে কেউ কেউ বিস্ময়বোধ করেন। তাঁরা জানতে চান, তাঁর এই উক্তির অর্থ কি এই যে তিনি আইন অমান্য আন্দোলনের পক্ষপাতী নন। শ্রী দাস উল্লেখ করেন, তাঁর গত দু এক বছরের কার্য্যকলাপ প্রমাণ করে দিয়েছে যে এ প্রশ্ন অবান্তর। তাঁর মূল উদ্দেশ্য হল জনগণের জন্য স্বরাজ অর্জন, আইন অমান্য আন্দোলন একটা হাতিয়ার মাত্র। গণ আইন অমান্য আন্দোলন শুরু করার আগে কয়েকটি বিশেষ আইন প্রতিরোধ করে শক্তি অর্জন করা দরকার। তিনি আরও বলেন, যদি জনগণের সমর্থনের মাধ্যমে আইনসভার মারফৎ প্রাদেশিক স্বায়ত্বশাসন লাভ করা যায় তাহলে তিনি অন্তত গণ আইন অমান্য আন্দোলন—যা হল শেষ হাতিয়ার—চালিয়ে যেতে চাইবেন না।

জনৈক কর্মী প্রশ্ন করেন, দেশবন্ধু বিধান পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হলে আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করবেন কি না। শ্রী দাস জানান, তাতে আপত্তির কোন কারণ তিনি দেখছেন না। যাঁরা অসহযোগে বিশ্বাস করেন তাঁরাও ত সরকারের ডাকটিকিট ব্যবহার করছেন ও সরকারী কাজের ফলে প্রাপ্ত নানা সুবিধা ভোগ করছেন। তিনি মনে করেন আসল উদ্দেশ্য হল, দেশে আমলাতান্ত্রিক শাসনের অবসান ঘটিয়ে শাসন ব্যবস্থার পরিবর্তন সাধন। তাঁর মতে রাজা বা পার্লামেন্টের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করার কোন বাধ্যবাধকতা নেই। সেক্ষেত্রে রাজার নামে শপথ গ্রহণে কোন আপত্তি থাকা উচিত নয়।

তাঁর এই জবাবে কয়েকজন চরমপন্থী খুশী হননি। তাঁরা দেশবন্ধুকে প্রশ্ন করেন, তিনি ব্রিটিশ কমনওয়েলথের বাইরে পূর্ণ স্বাধীনতা চান কি না। উত্তরে শ্রী দাস বলেন, তিনি স্বাধীনতা চান, সেই স্বাধীনতার রূপ নিয়ে তাঁর মাথা ব্যথা নেই। ভারতীয় জনগণকে তাদের ভাগ্য বিধানের পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়ার জন্যই স্বরাজ চান তিনি। ব্রিটিশ কমনওয়েলথের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করার প্রশ্নটি এখনও ততো গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠেনি কিন্তু কংগ্রেস যদি এ ধরনের সিদ্ধান্ত নেয় তাহলে চিত্তরঞ্জন কংগ্রেসের পক্ষে সংগ্রাম করবেন।

সে বছর বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলন শ্রীমতী বাসন্তী দেবীর সভাপতিত্বে চট্টগ্রামে অনুষ্ঠিত হয়। তাঁর ভাষণে তিনি বিধান পরিষদে প্রবেশের কথা উল্লেখ করে বলেন, কংগ্রেসকে হয়ত কৌশল বদলাবার কথা চিন্তা এবং আইনসভার ভেতর থেকে অসহযোগ আন্দোলন চালাবার নীতি গ্রহণ করতে হতে পারে। তাঁর ভাষণকে চিত্তরঞ্জনের নিজস্ব মতবাদ বলে অভিহিত করা হয় এবং তা নিয়ে জেলের ভেতরে ও বাইরে তিক্ত বাকবিতণ্ডা শুরু হয়। দেশবন্ধুর বহু বন্ধু ও শিষ্যের মধ্যেও তীব্র বিরূপতা দেখা যায় এবং তাঁরা এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন।

দশম অধ্যায়

গয়া কংগ্রেস

কারাবাসকালে চিত্তরঞ্জনের স্বাস্থ্যহানি ঘটে। মুক্তি লাভের পর তাঁর বিশ্রামের প্রয়োজন ছিল। কিন্তু কতগুলি জন অনুষ্ঠানে তাঁকে যোগ দিতেই হয়। কলকাতায় বিভিন্ন স্থানে তাঁর সম্মানে অনুষ্ঠিত জনসভায় যেতে আপত্তি করা সম্ভব ছিল না। স্যার প্রফুল্ল চন্দ্র রায়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এক সভায় শ্রী দাস জাতীয় কারণে ছাত্রদের কষ্টভোগ ও স্বার্থত্যাগের উল্লেখ করেন। তিনি ঘোষণা করেন, তাঁর এই ধারণাই দৃঢ় হয়েছে যে সত্য ও অহিংসার মাধ্যমেই স্বাধীনতা জয় করা যাবে কারণ সত্য ছাড়া অন্য কোন পথ নেই।

দেশ আইন অমান্য আন্দোলনের জন্য তৈরি হয়েছে কি না সে বিষয়ে অনুসন্ধান করে রিপোর্ট পেশ করার জন্য নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি একটি সাব-কমিটি গঠন করেন। এই সাব-কমিটির বৈঠক তখন পাটনায় অনুষ্ঠিত হচ্ছিল। দেশবন্ধু কমিটির সদস্যদের সঙ্গে আলোচনা করতে চান। স্যার সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের দৌহিত্র শ্রীভাস্কর মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে নিজের মেয়ের বিয়ে উপলক্ষে তিনি উক্ত কমিটির সদস্যদের কলকাতায় আমন্ত্রণ করেন। এই আলোচনা চলাকালে পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু রিপোর্ট প্রকাশ না হওয়া পর্যন্ত এ বিষয়ে কোন মন্তব্য না করতে শ্রী দাসকে অনুরোধ করেন।

আগষ্ট মাসের শেষাশেষি চিত্তরঞ্জন দার্জিলিং-এ যান। কিন্তু বায়ু পরিবর্তনেও তাঁর স্বাস্থ্যের উন্নতি হল না। স্বাস্থ্যোদ্ধারের

জন্য তিনি কিছুকাল কাশ্মীরে কাটাবার মনস্থ করেন। তাঁর কাশ্মীর যাত্রার মধ্যে নানা প্রচ্ছন্ন উদ্দেশ্যের সন্ধান অনেকে পেয়েছিলেন। কেউ কেউ সোজাসুজি তাঁকে প্রশ্ন করেন, তিনি কাশ্মীরে যাচ্ছেন স্বাস্থ্যের জন্য, না, রাজনৈতিক কারণে। কাশ্মীর সীমান্তে পৌঁছালে পুলিশ তাঁর কাছে প্রতিশ্রুতি চায় যে রাজনৈতিক বিষয় নিয়ে নিয়ে তিনি কিছু বলবেন না। প্রকৃতপক্ষে তাঁকে বলা হয়েছিল লিখিতভাবে এ প্রতিশ্রুতি না দিলে তাঁকে কাশ্মীরে প্রবেশ করতে দেওয়া হবে না।

দেশবন্ধু এতে অপমানিত বোধ করেন। তিনি পুলিশ অফিসারকে বলেন, "আমি জানি আপনি চুরি করবেন না, কিন্তু আমি যদি আপনাকে বলি লিখিতভাবে জানাতে যে আপনি চুরি করবেন না, তাহলে আপনি কি সে ধরণের প্রতিশ্রুতি দিতে প্রস্তুত আছেন?"

অফিসার দেশবন্ধুর অনুভূতির প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে বলেন যে, তিনি কাশ্মীরের মহারাজার আদেশ অনুসারে কাজ করছেন। দেশবন্ধু বলেন যে, মহারাজা অনায়াসেই ও ধরণের আদেশ জারী করতে পারেন কিন্তু তিনি অন্তত তা কিছুতেই পালন করবেন না। তিনি কাশ্মীরে যাওয়ার পরিকল্পনা ত্যাগ করে মারিতে গেলেন। সেখানে প্রায় একমাস কাটান চিত্তরঞ্জন।

সেবছর যুক্তপ্রদেশ রাজনৈতিক সম্মেলন দেরাদূনে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। শ্রী দাসকে সভাপতিত্ব করার জন্য আমন্ত্রণ জানান হয়। তাঁর ভাষণে চিত্তরঞ্জন ৬ই এপ্রিল ১৯১৯ তারিখে সত্যাগ্রহ আন্দোলন শুরু হওয়ার পর থেকে রাজনৈতিক আন্দোলনের বিশদ ইতিহাস বর্ণনা করেন। তিনি ঘোষণা করেন, "আমি শুধুমাত্র

মধ্যবিত্ত সমাজের উপকারের জন্য স্বরাজ চাই না। আমি চাই স্বরাজ জনগণের জন্য, শ্রেণী বিশেষের জন্য নয়।"

এই বোধহয় প্রথম দেশবন্ধুর মত খ্যাতিসম্পন্ন কোন নেতা রাজনৈতিক মঞ্চ থেকে ঘোষণা করেন যে কংগ্রেসের বাঞ্ছিত স্বরাজ জনগণের জন্য, মুষ্ঠিমেয় সুবিধাভোগী শ্রেণীর জন্য নয়। পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু ও শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু এই সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা শ্রী দাসকে এই নির্ভীক ঘোষণার জন্য অভিনন্দন জানান।

আইন অমান্য আন্দোলন তদন্ত কমিটি ততদিনে নিজেদের রিপোর্ট পেশ করে জানিয়েছেন যে দেশ গণ আইন অমান্য আন্দোলনের জন্য প্রস্তুত নয়। তবে প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি-গুলিকে সীমায়িতভাবে আইন অমান্য আন্দোলন করার স্বাধীনতা দেওয়া যেতে পারে—যদি তাঁরা মনে করেন যে নিজেদের প্রদেশে প্রয়োজনীয় সর্ত পূরণ করা হয়েছে। এই কমিটি প্রস্তাব করেন যে, আইন অমান্য আন্দোলনের কর্মসূচী কোন বিশেষ আইন বা আদেশ ভঙ্গ বা বিশেষ কোন কর না দেওয়ার মধ্যে সীমিত থাকতে পারে।

আইন সভায় প্রবেশ সম্বন্ধে কমিটির মধ্যে মতভেদ দেখা দেয়। কমিটির সভাপতি হাকিম আজমল খাঁ বিধান পরিষদে প্রবেশের পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁকে সমর্থন জানান পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু ও বিঠলভাই প্যাটেল। ডাঃ আনসারি, সি. রাজাগোপালাচারি ও কস্তুরি রঙ্গ আয়েঙ্গার এর বিরুদ্ধে ছিলেন।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে দেশবন্ধু পণ্ডিত মতিলাল নেহেরকে কথা দিয়েছিলেন যে তদন্ত কমিটি রিপোর্ট পেশ না করা পর্যন্ত

তিনি বিধান পরিষদে প্রবেশ সম্বন্ধে কোন মন্তব্য করবেন না। রিপোর্টটি যখন প্রকাশিত হয় তখন তিনি অমরাবতীতে। ৭ই নভেম্বর তিনি নিম্নরূপ বিবৃতি দেন—

"শাসন সংস্কারের ফলে গঠিত বিধান পরিষদ প্রকৃতপক্ষে আমলাদের মুখোশ। আমি মনে করি ওইসব মুখোশ তাদের মুখ থেকে টেনে খুলে দেওয়াই আমাদের সুস্পষ্ট কর্তব্য। এই পরিষদগুলি খতম করাই হবে সফলতম বর্জন। আমরা যদি সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করতে পারি তাহলে তা করা আমাদের পক্ষে সম্ভব হবে। আমরা যদি ১৯২৩ সালের গোড়ার দিকে নির্বাচনে দাঁড়াই তাহলে নির্বাচনের ফল এটাই প্রমাণ করবে যে আমরা তথ্য, অনুমান নয়, সম্বল করেই এগিয়েছিলাম। আমাদের মনোনীত লোকেরা যে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করবেন সে বিষয়ে আমি নিশ্চিত।"

চিত্তরঞ্জন ১০ই নভেম্বর কলকাতায় পৌঁছালে হাওড়া ষ্টেশনে বিপুল জনতা তাঁকে স্বতঃস্ফূর্ত অভিনন্দন জানায়। তিনি তা আশা করেন নি। বিধান পরিষদে প্রবেশ সম্বন্ধে তাঁর মত সকলের সমর্থন লাভ করেন। প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি, কার্য্যকরী কমিটি ১৮ই ও ১৯শে নভেম্বর এক বৈঠকে মিলিত হয়ে একটি প্রস্তাব গ্রহণ করেন। এই প্রস্তাবে পাঞ্জাব ও খিলাফত অন্যায়ের প্রতিকার এবং অবিলম্বে স্বরাজলাভের দাবীর ভিত্তিতে কংগ্রেস কর্মীদের নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার নির্দেশ দেওয়া হয়। নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির বৈঠক বসে ২০শে নভেম্বর এবং সে বৈঠকের সভাপতিত্ব করেন দেশবন্ধু।

পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু, হাকিম আজমল খাঁ, বিঠলভাই প্যাটেল, এন. সি. কেলকার, এম. আর. জয়াকর, বি. এস. মুঞ্জে,

অভয়ঙ্কর, ডাঃ আলাম শেরওয়ানী, অনুগ্রহ নারায়ণ সিংহ, এস. সত্যমূর্তি, রামস্বামী আয়েঙ্গার, আম্বালার লালা ছুনীচাঁদ, শ্রীমতী লজ্জাবতী দেবী, যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত, বীরেন্দ্রনাথ শাসমল এবং আরও অনেকে বিধান পরিষদে প্রবেশের পক্ষে বক্তৃতা করেন। প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন রাজাগোপালাচারি, রাজেন্দ্র প্রসাদ, বল্লভভাই প্যাটেল, শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু, ডাঃ আনসারী, মৌলভী আব্বাস তায়েবজী, টি, প্রকাশম্, লাহোরের লালা ছুনীচাঁদ, জগৎগুরু শঙ্করাচার্য্য, গঙ্গাধর দেশপাণ্ডে এবং অন্যেরা।

বিরোধীদলের মধ্যে সব থেকে উৎসাহী বক্তা ছিলেন ডাঃ পট্টভী সীতারামায়া। তিনি মনে করেন কোন পরিস্থিতিতেই পরিষদে প্রবেশ করা অসততার পরিচায়ক হবে। ঐক্য ভাল কিন্তু সততা আরও ভাল।

স্মরণীয় যে, আমেদাবাদ কংগ্রেস অধিবেশনে সভাপতিত্ব করার জন্য দেশবন্ধু নির্বাচিত হয়েছিলেন কিন্তু কারাবাসের জন্য উক্ত অধিবেশনে সভাপতিত্ব করতে পারেন নি। তিনি আবার কংগ্রেস সভাপতি নির্বাচিত হন। কংগ্রেসের পরবর্তী অধিবেশন গয়াতে অনুষ্ঠিত হবে স্থির হয়। কংগ্রেস অধিবেশন অনুষ্ঠিত হবার আগে দেশবন্ধু বিধান পরিষদে প্রবেশের অনুকূলে জনমত গঠনে ব্যস্ত থাকেন। তাঁকে বিরাট বাধার সম্মুখীন হতে হয়। কারণ তাঁর আর্থিক সঙ্গতি ছিলনা এবং বহু পুরানো কর্মী তাঁর বিরুদ্ধে গিয়েছিলেন। নিজের দায় দায়িত্বের ওপরেও কংগ্রেস অফিসের বাকী ভাড়া তাঁর ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া হয়। তাঁর স্বাস্থ্য খারাপ ছিল। প্রায় প্রত্যেক সংবাদপত্রই বিধান পরিষদে প্রবেশের বিরোধিতা করছিল। প্রতিবাদ সভারও আয়োজন করা হয়েছিল। মাঝে মাঝে এইসব সভায় ব্যক্তিগত আক্রমণও করা হত। বন্ধুরা

শত্রু হয়ে দাঁড়ালো। এমন কি কয়েকটি বিপ্লবীদল তাঁকে গুলি করে হত্যার ভয় দেখায়। এমন কথাও বলা হয়েছিল যে পরিষদে প্রবেশের তাঁর এই আগ্রহের একমাত্র কারণ, তিনি মন্ত্রী হতে চান। এইসব লোকেরা ভুলে গিয়েছিল যে দেশবন্ধু জাতির সেবায় রাজকীয় সম্পদ ত্যাগ করে স্বেচ্ছায় দারিদ্র্য বরণ করেছিলেন। তবে ভীতি প্রদর্শন, প্ররোচনা, গালাগালি ও নিন্দাবাদ কোন কিছুই চিত্তরঞ্জনকে বিচলিত করতে পারেনি।

গয়া কংগ্রেসে দেশবন্ধুর ভাষণ এক মহান প্রয়াসের নজির। কিন্তু বিধান পরিষদে প্রবেশ সম্বন্ধে তাঁর-সমর্থিত প্রস্তাব ৩১শে ডিসেম্বর ১৯২২ তারিখে ১৭৪৮—৮৯০ ভোটে বাতিল হয়। তিনি তৎক্ষণাৎ নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সভাপতির পদত্যাগ করেন। পণ্ডিত মতিলাল নেহেরুও কংগ্রেসের সাধারণ কর্মসচিবের পদ ত্যাগ করেন। তাঁর বিদায়ী ভাষণে দেশবন্ধু বলেন সংখ্যাগরিষ্ঠদল তাঁর থেকে ভিন্ন মত পোষণ করলেও, তাঁর দৃঢ়বিশ্বাস, তাঁরা শীঘ্রই তাঁকে সমর্থন করবেন। ১লা জানুয়ারী ১৯২৩ তারিখে তাঁরা পদত্যাগ করার একদিন পরে দেশবন্ধু ও পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু স্বরাজ্য দল গঠন করেন। দেশবন্ধুর ভাষণটি তাঁর অন্যতম প্রধান ভাষণ বলে পরিশিষ্টে তা পুরোপুরি দেওয়া হল। অসহযোগ নীতি এবং নির্বাচন বর্জনের ব্যর্থতা নিয়ে তিনি বিশদ আলোচনা করেন। শুধু ভারত নয়, সারা এশিয়ার সমস্যার উল্লেখ করেন তিনি। এশীয় জনগণের একটি সংঘ গঠনের উল্লেখ তিনি করেন। তাঁর মতে বিশ্ব শান্তির জন্য তা প্রয়োজন। কংগ্রেস মঞ্চ থেকে সম্ভবতঃ এই প্রথম এশীয় সঙ্ঘের ধারণা তুলে ধরা হয়। অতএব এ বিষয়ে চিত্তরঞ্জনের নিজের কথা উদ্ধৃতি করাই উপযুক্ত হবে—

"এ থেকেও আরও গুরুত্বপূর্ণ হল বৃহৎ এশীয় সংঘে—যা গঠিত হতে চলেছে, দেখতে পাচ্ছি—ভারতের অংশগ্রহণ। সর্ব-ইসলাম

আন্দোলন কিছুটা সঙ্কীর্ণ ভিত্তিতে শুরু হলেও তা এশিয়ার সমস্ত মানুষের বৃহৎ সংঘ গঠনের জন্য পথ ছেড়ে দিয়েছে বা দিতে চলেছে সে বিষয়ে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। এ সংঘ এশিয়ার অত্যাচারিত জাতিগুলির সংঘ। ভারত কি এই সংঘের বাইরে থাকবে? স্বীকার করি, আমাদের স্বাধীনতা আমাদেরকেই অর্জন করতে হবে কিন্তু ভারত ও এশিয়ার বাকী অংশই নয় অধিকন্তু ভারত ও বিশ্বের সমস্ত স্বাধীনতা অনুরাগী মানুষের মধ্যে এই ধরণের বন্ধুত্ব ও প্রেম, সহানুভুতি ও সহযোগিতার বন্ধন বিশ্ব শান্তি আনবেই। বিশ্ব শান্তি বলতে আমি বুঝি, প্রত্যেক জাতির স্বাধীনতা। আর এক ধাপ এগিয়ে আমি বলতে পারি, অন্যান্য জাতি দাসত্ব শৃঙ্খলে আবদ্ধ থাকলে বিশ্বের কোন জাতিই প্রকৃত স্বাধীন থাকতে পারে না। যে নীতি আমরা এ পর্য্যন্ত অনুসরণ করে এসেছি তা আমাদের কাজের—যা করবার দায়িত্ব আমরা নিয়েছিলাম—এরজন্য একান্ত প্রয়োজন ছিল এবং আমি সর্বান্তঃকরণে সেই নীতি সমর্থন করেছিলাম। স্বরাজ লাভ বা এক বছরের মধ্যে স্বরাজ লাভের নির্ভরযোগ্য ভিত্তি স্থাপনের আশাতেই এ ধরণের শক্তি সমাবেশের একান্ত প্রয়োজন হয়েছিল। আজ সেই কাজের জন্যই চাই উদারতর সহানুভূতি ও ব্যাপক দৃষ্টিভঙ্গী।”

একাদশ অধ্যায়

স্বরাজ্য দল

দেশবন্ধু ও পণ্ডিত মতিলাল যে নতুন দল গঠন করলেন, প্রথমে তার নাম ছিল 'কংগ্রেস খিলাফৎ স্বরাজ্য দল'। কিন্তু অনতিকাল পরে কংগ্রেস ও খিলাফৎ শব্দ দুইটি বর্জন করে স্বরাজ্য দল নামে তা সর্বভারতীয় মর্য্যাদা পায়।

দেশবন্ধু ও পণ্ডিত মতিলাল উভয়েই বাস্তববাদী ছিলেন। তাঁরা গয়া কংগ্রেসে বাস্তববোধের অভাব অনুভব করেন। সকলেই জানত যে বিধান পরিষদ, আদালত ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বর্জন কার্য্যসূচী ব্যর্থ হয়েছে। এ সমস্ত প্রতিষ্ঠানে আগের মত কাজকর্ম জোরের সঙ্গে চলেছে। তা সত্ত্বেও গয়া কংগ্রেসে সেগুলি বর্জনের পুরান শ্লোগানের পুনরুচ্চার হয়। তাছাড়া, গয়া কংগ্রেস সত্যাগ্রহ বা আইন অমান্য আন্দোলন আঁকড়ে ধরে যদিও কংগ্রেস নিযুক্ত তদন্ত কমিটি আগেই জানিয়ে দিয়েছে দেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে এ ধরণের আন্দোলন সম্ভব নয়। লোকে 'মহাত্মা গান্ধী কি জয়' ধ্বনি উচ্চারণ করছে এবং বলছে কারারুদ্ধ মহাত্মা স্বাধীন মহাত্মা অপেক্ষা আরও শক্তিশালী কিন্তু কেউই তাঁর প্রচারিত আদর্শ অনুসরণ করছিল না। ফলে জনগণের মধ্যে বিভ্রান্তি ও হতাশা দেখা দিয়েছিল। বুদ্ধিজীবীরা কংগ্রেসের আদর্শ ও কার্য্যসূচী সম্বন্ধে ক্রমেই অবিশ্বাসী হয়ে উঠেছিলেন।

কংগ্রেসের সৌভাগ্যবশত গয়া অধিবেশনের কিছুদিন পরেই মৌলানা আবুল কালাম আজাদ ছাড়া পান। তিনি দেশবন্ধুর—যাঁর

প্রতি তাঁর বিশেষ শ্রদ্ধা ছিল—সঙ্গে বেশ কয়েকবার সাক্ষাৎ করেন। স্বরাজ্য দলের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট না হয়েও তিনি তার সাফল্যলাভে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেন। তিনি দেশবন্ধুকে ৩০শে এপ্রিল ১৯২৩ তারিখ পর্য্যন্ত অপেক্ষা করার জন্য অনুরোধ করেন। তিনি আশ্বাস দেন, ততোদিনে গোঁড়া কংগ্রেসীরা গণ সত্যাগ্রহ যদি শুরু না করেন তাহলে তিনি পরিষদে প্রবেশ অনুমোদনের জন্য কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশন অবশ্যই আহ্বান করবেন।

দেশবন্ধু মৌলানা আজাদের এই প্রস্তাবে রাজী হন। কংগ্রেস কার্য্যকরী কমিটিও প্রস্তাবটি অনুমোদন করেন। ২৭শে ফেব্রুয়ারী ১৯২৩ নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির বৈঠক এলাহাবাদে অনুষ্ঠিত হয়। এই অধিবেশনে দেশবন্ধু, পণ্ডিত মতিলাল ও অন্যান্য স্বরাজবাদীরা উপস্থিত ছিলেন। সর্বসম্মতিক্রমে দেশবন্ধু এই অধিবেশনে সভাপতি নির্বাচিত হন। স্বরাজ্য দল ও পরিবর্তন বিরোধীদের মধ্যে আপোষের জন্য নিম্নরূপ সর্ত স্থির হয়—

(১) পরিষদ সম্বন্ধে প্রচার উভয় পক্ষই ৩০শে এপ্রিল ১৯২৩ তারিখ পর্য্যন্ত স্থগিত রাখবে।

(২) অন্তর্বর্তীকালে নিজেদের কার্য্যসূচীর অন্যান্য বিষয়গুলি রূপায়িত করার স্বাধীনতা উভয় পক্ষেরই থাকবে এবং কেউ কারুর ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করবে না।

(৩) সংগঠনী কাজের জন্য অর্থ সংগ্রহে সংখ্যালঘু দল সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের সঙ্গে সহযোগিতা করবে।

এই আপোষ বিধানে মৌলানা আজাদ ছাড়া জহরলাল নেহরুও বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করেন। সমস্ত আপোষের মত এতেও কোন

দলই পুরোপুরি সন্তুষ্ট হতে পারে নি কিন্তু প্রত্যেক দলই মনে করে যে প্রয়োজনীয় বিষয়ে তার লাভ হয়েছে। বিধান পরিষদে প্রবেশের বিরুদ্ধে পরিবর্তন বিরোধীরা প্রচারকার্য্য চালাতে পারবে না জেনে স্বরাজ্য দল খুশী হয়েছিল। আবার পরিবর্তন বিরোধীদের আনন্দের কারণ হল, স্বরাজ্য দল তাদের দাবীর পক্ষে প্রচারকার্য্য চালাতে পারবে না এবং আসন্ন নির্বাচনের আগে মূল্যবান সময় হারাবে।

২৪শে এপ্রিল দিল্লীতে দু দলের নেতাদের বৈঠক বসে—একটি সাধারণ কর্মসূচী স্থির করার উদ্দেশ্যে। জনগণের সামনে একটি ঐক্যবদ্ধ কর্মসূচী উপস্থাপিত করার উদ্দেশ্যে দেশবন্ধু, পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু, ডাঃ আনসারি, রাজাগোপালাচারি, হাকিম আজমল খাঁ ও শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু কয়েকদিন ধরে আলাপ আলোচনা করেন। কিন্তু পরিবর্তন বিরোধীরা কোন বিষয়েই নতি স্বীকার করতে প্রস্তুত ছিলেন না এবং দেশবন্ধুকে অনিচ্ছার সঙ্গে ঘোষণা করতে হয় যে কংগ্রেসের দু শাখার মধ্যে মিটমাটের শেষ চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। পরিষদের জন্য নির্বাচনের দিন এগিয়ে আসছিল বলে চিত্তরঞ্জন ব্যাপক প্রচার চালাবার জন্য স্বরাজ্য দলের সদস্যদের নির্দেশ দিতে বাধ্য হন।

স্বরাজ্যদল কংগ্রেসের কার্য্যসূচী পরিবর্তিত করতে চাইছিলেন। এর কারণ জনগণকে বোঝান স্বভাবতই প্রয়োজন হয়। শ্রী দাস কলকাতায় ও বাংলাদেশের অন্যান্য স্থানে বহু জনসভায় বক্তৃতা করেন। ১৩ই মে বরিশালে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনে চিত্তরঞ্জন তাঁর বক্তব্য এমন ভাবে পেশ করেন যে কমিটি তাঁর মতবাদ সমর্থন করে। তারপর স্বরাজবাদীদের বক্তব্য জনসাধারণের সামনে তুলে ধরার জন্য তিনি গ্রামাঞ্চলে সফর শুরু

করেন। ২৫শে থেকে ২৮শে মে, ১৯২৩ বম্বেতে অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির বৈঠকে চিত্তরঞ্জন আবার সর্বসম্মতিক্রমে সভাপতি নির্বাচিত হন।

এই বৈঠকে চিত্তরঞ্জন উল্লেখ করেন যে দেশের কোথাও সত্যাগ্রহ বা গণ আইন অমান্য আন্দোলনের চিহ্নমাত্র নেই। প্রকৃতপক্ষে, এলাহাবাদে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনের পরে এ ধরণের আন্দোলনের অনুকূল পরিবেশের অভাব ঘটেছিল। পাঞ্জাব ও যুক্তপ্রদেশের নানা স্থানে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা লেগেছিল। এই পরিস্থিতিতে সত্যাগ্রহ বা গণ আইন আন্দোলন শুরু করা বিপজ্জনক হত। শ্রী পুরুষোত্তমদাস ট্যাণ্ডন কর্তৃক উথাপিত এবং জহরলাল নেহেরু সমর্থিত একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। এ প্রস্তাবে বলা হয় কংগ্রেস কর্মীরা দলাদলি বন্ধ করে ঐক্যবদ্ধ হবেন। গয়া অধিবেশনে গৃহীত প্রস্তাব অনুযায়ী ভোট দাতাদের মধ্যে কোনরূপ প্রচারকার্য্য না চালাবার নির্দেশ কংগ্রেস দেয়।

এই প্রস্তাবের ফলে স্বরাজ্য দলের পক্ষে আর এক ধাপ এগিয়ে যাওয়া সম্ভব হলো কারণ তার দাবীর বিরুদ্ধে সমস্ত প্রচারকার্য্যই বন্ধ হয়ে গেলো। ভোট দাতাদের নিজেদের মনোনীত প্রার্থীকে ভোট দেবার স্বাধীনতা দেওয়া হলেও স্বরাজ্য দল তাতে পুরোপুরি খুশী হতে পারে নি। কারণ কংগ্রেসের নাম করে এই নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবার অনুমতি কংগ্রেস কর্মীদের দেওয়া হয়নি। সারা দেশে প্রচারকার্য্য চালানর দিকে শ্রী দাসের দৃষ্টি এবারে আকৃষ্ট হলো। তাছাড়া নিজের দৃষ্টিভঙ্গীর অনুকূলে কংগ্রেস কর্মীদের আনা প্রয়োজন ছিল।

বম্বেতে অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির এই বৈঠক কংগ্রেস ইতিহাসের এক অধ্যায়ের সমাপ্তি সূচনা করলো। গয়া

অধিবেশনে দেশবন্ধু ও মতিলাল নেহেরু পদত্যাগ করলেও তাঁদের পদত্যাগ পত্র গৃহীত হয় নি। মধ্যবর্ত্তী কংগ্রেসীদের বিরোধিতা সত্ত্বেও দেশবন্ধু তাঁর পদত্যাগ পত্র গ্রহণ এবং একমত বিশিষ্ট কার্য্যকরী গঠনের ওপর জোর দেন। ফলে বহু প্রবীণ ও বিশিষ্ট কংগ্রেস কর্মী কার্য্যকরী কমিটি ত্যাগ করেন।

দেশবন্ধু ঝড়ের বেগে একপ্রান্ত থেকে অপরপ্রান্ত সফর করে বেড়াতে লাগলেন। মহারাষ্ট্র প্রাদেশিক সম্মেলনে যোগদানের জন্য তিনি প্রথমে বুলদানায় যান। সেখানে প্রকাশ্যে তিনি প্রথম ঘোষণা করেন যে ১৯২১ সালের ডিসেম্বর মাসে বড়লাটের আপোষ প্রস্তাব গ্রহণ না করা ভুল হয়েছিল। তখন পরিস্থিতিকে ঠিকমত কাজে লাগান এবং পরিচালিত করা যায় নি এবং কংগ্রেস নতুন কার্য্যসূচী গ্রহণ না করলে আরও ভুল ও গোলমাল হবে। আইন সভার ভেতরে জাতির দাবীর জন্য চাপ দেবার উদ্দেশ্যে বিধান পরিষদে প্রবেশের কার্য্যসূচী সমর্থনের জন্য দেশবন্ধু সকল কংগ্রেস কর্মীর কাছে আবেদন জানান।

তারপর দেশবন্ধু মাদ্রাজে যান এবং বহু শহরে ভাষণ দেন। তাঁর বাগ্মিতা, একাগ্রতা ও যুক্তি জনগণের মনে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। এক মাসের মধ্যে মাদ্রাজের জনগণ তাঁর বিধান পরিষদ প্রবেশ কার্য্যসূচীর জোরালো সমর্থক হয়ে পড়েন। উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে পরিবেশের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে কৌশল পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তার কথা তিনি সর্বত্র বলেন। তিনি উল্লেখ করেন যে দেশে যে অবসাদ ও হতাশার ভাব দেখা দিয়েছে তার মূলে রয়েছে ১৯২১ সালের ডিসেম্বর মাসের আপোষ প্রস্তাব বর্জন। তিনি বলেন, যাঁরা পরিষদ প্রবেশ কার্য্যসূচী সমর্থনের পক্ষপাতী নন তাঁরা কোন বিকল্প ব্যবস্থার প্রস্তাব করেন নি। গণ আইন অমান্য

আন্দোলন প্রত্যাহার করা হয়েছে এবং নতুন কোন সংগ্রাম সুরু করবার সম্ভাবনা নেই। এই পরিস্থিতিতে শ্রেষ্ঠ পন্থা হল অহিংস অসহযোগ নীতি বজায় রেখে বৃহৎ সংখ্যায় আইন সভায় যোগদান এবং সেখানে জাতীয় দাবী মেটাবার জন্য চাপ দেওয়া। সরকার যদি দাবী মেনে নেন তবে বিরাট জয়লাভ। সরকার যদি অস্বীকার করেন—যা সম্ভবত হবে—তাহলে জনগণের মনোভাব আরও প্রবল হবে এবং আইন সভার ভেতরে ও বাইরে নতুন উদ্দীপনা দেখা দেবে। দেশবন্ধু বলেন তাঁর পরামর্শ গ্রহণ করলেই গণ আইন অমান্য আন্দোলন সম্ভব। তিনি স্পষ্ট জানান নীতির জন্যই তিনি কংগ্রেসের সভাপতি পদ ত্যাগ করেছেন। কংগ্রেস তাঁর মতবাদ সমর্থন না করলে নির্বাচন অভিযানে তিনি কখনই কংগ্রেসের নাম নেবেন না। সর্বত্র শ্রোতাদের কাছে তাঁর যুক্তি অখণ্ডনীয় এবং তাঁর গতিবেগ দুর্বার বলে মনে হয়।

চিত্তরঞ্জনের ভাষণে মাদ্রাজের জনগণ কিরূপ অভিভূত হয়েছিল তা একটি বিশিষ্ট পত্রিকার বিবরণ থেকে বোঝা যাবে—

"মাদ্রাজ অধীর আগ্রহে দেশবন্ধু দাসের প্রথম পরিদর্শনের প্রতীক্ষা করছিল। দেশবন্ধুর প্রথম ভাষণেই মাদ্রাজের প্রত্যাশার পাত্র উপছে পড়েছিল। প্রধানত সংবাদপত্রের বিরূপতার জন্য তাঁর নীতি ও কর্মসূচী সম্বন্ধে নানাস্থানে অমূলক আশঙ্কা ও ভুল বোঝাবুঝি দেখা দিয়েছিল। কিন্তু শ্রী দাস পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে জানেন। তাঁর স্বরে ক্ষমা প্রার্থনার সুর নেই বা ব্যবহারে সঙ্কোচের ভাব নেই বা নিজের নেতৃত্ব সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ নেই। দেশের জন্য তিনি সর্বস্ব ত্যাগ করেছেন যা আর কেউ করেন নি। তিনি জানেন তাঁর কার্য্যসূচী দেশের সামনে একমাত্র বাস্তব কার্য্যসূচী। তিনি জানেন কংগ্রেসের মধ্যে অধিকাংশ লোকই

অর্থহীন মন্ত্র জপ করে চলেছেন। সর্বোপরি তিনি জানেন যে কংগ্রেসের নিষ্ক্রিয়তার ফলে আমলাতন্ত্র উত্তরোত্তর শক্তিলাভ করছে আর জনগণ ক্ষমতা হারাচ্ছে। জাতির নিধনকর এই পদ্ধতি বন্ধ করার জন্য তিনি দৃঢ় সঙ্কল্প। যতটা ক্ষমতা তাকে দেওয়া হবে তারই সাহায্যে তিনি জনগণকে জাগিয়ে দার্শনিক গবেষণা ও পুরুষত্বহীন বীরপূজার বদ্ধ জলা থেকে তাদের নিয়ে যাবেন স্বরাজের রাজপথে। তাঁর ভাষণে শোনা গেছে এই তুর্য্যনাদ। তিনি বলেন, কংগ্রেস-বিদ্রোহী বা অমিতব্যয়ী পুত্র তিনি কোনটাই নন কিন্তু তাঁকে এ নামে অভিহিত করলেও তিনি কিছু মনে করেন না। কারণ তাঁর যুক্তি হলো 'আমি কংগ্রেসকে কম ভালবাসিনা কিন্তু দেশকে ভালবাসি আরও বেশী'। বিধান পরিষদে প্রবেশের কার্য্যসূচী তিনি বিশদভাবে সমর্থন করেন এবং এজন্য বিশ্বাসজনকভাবে যুক্তি প্রদর্শন করেন। দেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে গণ আইন অমান্য আন্দোলন কেন সম্ভব নয় এবং কেমন করে সংখ্যাগুরু দল তা দিনের পর দিন মুলতুবী রাখছেন এসব তিনি ব্যাখ্যা করেন।

"পরিষদে প্রবেশ কি অসহযোগের বিরুদ্ধে? না, এটি একই কার্য্যকলাপের ভিন্ন রূপমাত্র। পরিষদ বর্জন কি এমনই পবিত্র জিনিষ যে তা স্পর্শ করা যায় না? শ্রী দাস তার উত্তরে বলেন, 'আমি আপনাদের জানাচ্ছি আরেকটা জিনিষ আছে যা কংগ্রেসের থেকেও পবিত্র, তা হলো ভারতীয় জনগণের স্বাধীনতা।

"শ্রোতৃবৃন্দের ওপর তাঁর বক্তৃতা বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। মুষ্টিমেয় কয়েকজন যাঁরা বিদ্রূপ করতে এসেছিলেন তাঁরা প্রার্থনা করবার জন্য রয়ে গেলেন।"

দাক্ষিণাত্য অভিযানকালে দেশবন্ধু একটি ভাষণে বলেন, "আমি কি বিদ্রোহী! স্বরাজের দাবী মেটাবার জন্যে প্রয়োজন হলে কংগ্রেস

ও ভারতের যে কোন প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে আমি বিদ্রোহ করব। আমি স্বরাজ চাই। আমি আমার স্বাধীনতা চাই। আমি সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত। জীবনে কোন সময়ই কাপুরুষতা আমি দেখাইনি। আমি আমার জীবন দিতে প্রস্তুত। আজই সুরু করুন, আমাকে পরীক্ষা করুন। আমি আপনাদের মান অনুযায়ী হতে পারি কিনা তার প্রমাণ আমি দেব।"

দ্বাদশ অধ্যায়
দিল্লী কংগ্রেস

মাদ্রাজ সফরের পর—যারফলে বহু কংগ্রেস কর্মী স্বরাজ্য দলের মতবাদ গ্রহণ করেন—চিত্তরঞ্জন নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির বৈঠকে যোগ দেবার জন্য নাগপুরে যান। বম্বেতে ডাঃ আনসারির সভাপতিত্বে গঠিত নতুন কার্য্যকরী কমিটি নাগপুরের বৈঠকে পদত্যাগ করেন। দুটি প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সিদ্ধান্ত অগ্রাহ্য করায় এবং সে বিষয়ে কার্য্যকরী কমিটি কিছু করতে অসমর্থ হওয়ায় তাঁরা পদত্যাগে বাধ্য হন। পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু তাঁর 'আত্মজীবনী'তে ঘটনাটির নিম্নরূপ বর্ণনা দিয়েছেন—

"শৃঙ্খলাভঙ্গের অপরাধে গুজরাতকে তিরস্কার করতে ব্যর্থ হওয়ার ফলে আমাদের পদত্যাগ করতে হয়। দল পরিচালনার এই স্বল্প অভিজ্ঞতাই আমার পক্ষে অসহনীয় হয়ে পড়েছিল। কয়েকজন বিশিষ্ট কংগ্রেস কর্মীকে যেভাবে প্যাঁচ কষতে দেখলাম তাতে আমি মর্মাহত হয়েছি।"

কোণ্ডা বেঙ্কটাপ্পায়ার সভাপতিত্বে একটি নতুন কার্য্যকরী কমিটি নির্বাচিত হয়। এই বৈঠকে স্থির হয়, কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশন মৌলানা আবুল কালাম আজাদের সভাপতিত্বে বম্বেতে অনুষ্ঠিত হবে পরিস্থিতি পর্য্যালোচনা ও সমস্ত বাধা বিপত্তির অবসান ঘটাবার জন্য।

বিশেষ অধিবেশন কিন্তু বম্বেতে না হয়ে দিল্লীতে ১৯২৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত হয়। অভ্যর্থনা কমিটির সভাপতি ডাঃ আনসারী যুক্তফ্রণ্টের জন্য আবেদন জানান। মৌলানা আজাদ সমস্ত পরিস্থিতি পর্য্যালোচনা করে নিম্নরূপ সুচিন্তিত অভিমত দেন—

"এই প্রশ্নের সমস্ত দিক বিচার করে আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে আমাদের পক্ষে পরিষদ বর্জন ও নির্বিকার থাকা বৃথা। গত নির্বাচনে পরিষদ বর্জন আমাদের প্রয়োজন ছিল। বর্তমান পরিস্থিতিতে পরিষদে যতগুলি সম্ভব আসন দখল করলে আমাদের সুবিধা হবে।"

মৌলানা আজাদ ব্যক্ত করেন যে, জনগণের সামনে একটি ঐক্যবদ্ধ কার্য্যসূচী থাকলে হিন্দু মুসলমানের মধ্যে সংঘর্ষ এড়ান যেত। তিনি ব্যাখ্যা করেন, আমরা অমঙ্গলের সঙ্গে সহযোগিতা করব না, এই সার্বজনীন বিশ্বাসই হল অহিংস অসহযোগের ভিত্তি। কিন্তু এই অসহযোগ নিক্রিয়তার সমপর্য্যায়ভূক্ত করা কোন মতেই চলবে না। তিনি আরও বলেন, পরিস্থিতি পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে কৌশল পরিবর্তনের অবকাশ আছে, এমন কি তা প্রয়োজনও।

কংগ্রেস কর্মীদের আইন সভায় প্রবেশের অনুমতি দিয়ে প্রস্তাব উত্থাপন করেন মৌলানা মহম্মদ আলি। প্রস্তাবটি সমর্থন করেন ডাঃ কিচলু, আব্বাস তায়েবজী, শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু ও আরও অনেকে। মৌলানা মহম্মদ আলি ঘোষণা করেন, "দেশের স্বার্থ যদি সেরকম দাবী করে তাহলে বর্জন সূচী সংশোধনে দ্বিধা না করার জন্য আমি আত্মিক শক্তিক্রিয়া ও রহস্যজনক বেতারে মহাত্মা গান্ধী কর্তৃক আদিষ্ট হয়েছি।"

তাঁর কার্য্যসূচী সমর্থন করে শ্রী দাস বলেন—

"এই বিধান পরিষদ ও আইন সভাগুলি কি? এগুলি মিথ্যার বেসাতি। এগুলি কি আমরা দূর করব না? মহাত্মা গান্ধী সংস্কার ব্যবস্থার অবসান ঘটাতে চান, আমি ঠিক তাই করব ভেতর থেকে কাজ করে আর তা করার একমাত্র উপায় হল পরিষদের মাধ্যমে সরকার গঠন অসম্ভব করে তোলা। যাঁরা সেখানে যান পদের জন্য, যাঁরা সেখানে যান ঐ তুচ্ছ জিনিষগুলি পেতে যাকে তাঁরা কল্যাণ বলেন—আইনসভার টেবিল থেকে ছুড়ে দেওয়া রুটির টুকরোর জন্য। তাঁদের সঙ্গে আমার কোন সংশ্রব নেই। আমি তা তীব্র ঘৃণা করি। আমি তা অত্যন্ত অপছন্দ করি। আমি বলছি, হয় আমি তা ধ্বংস করব—যে দানব আমাদের জীবনীশক্তি শুষে নিচ্ছে তাকে ধ্বংস করব—নয়ত ওখানে আদৌ যেতে চাই না। এই আপোষমূলক প্রস্তাবে অহিংস অসহযোগের উপর গুরুত্ব আরোপ করায় আমি আনন্দিত।"

"যদি সংখ্যালঘু হয়ে পড়ি তাহলে ঐ আসনগুলি শূন্য রাখব, ওগুলি হবে অসহযোগের প্রজ্বলিত বাতির মত।

"যদিও আমি পরিষদ প্রবেশ কংগ্রেসের সাধারণ কাজের অঙ্গ স্বরূপ, এই মর্মে স্বরাজ্য দলের প্রস্তাব উত্থাপন করে সম্পূর্ণ জয়লাভ করতে পারতাম, তা করব না। তা করার কোন মানে হয় না, কারণ ঐক্যবদ্ধ কংগ্রেস আমার বিজয় লাভের চেয়ে অনেক ভাল।"

প্রস্তাবটি বস্তুত সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। পণ্ডিত মদন মোহন মালব্য সেকথা ঘোষণা করা মাত্র উদ্দীপনা ও আনন্দের সঞ্চার হয়।

কংগ্রেস কর্মীরা আইন সভার নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবেন স্থির হওয়ায় দেশবন্ধু দাস ও মতিলাল নেহেরু যুক্তপ্রদেশের কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ শহর সফর করেন। তারপর দেশবন্ধু কলকাতায় ফিরে বাংলাদেশে দ্রুত পরিদর্শনে বেরোন। তিনি সর্বত্র মনোনীত প্রার্থীদের পক্ষে ভাষণ দেন এবং আন্তরিক সাড়া পান। সকাল থেকে মাঝ রাত পর্য্যন্ত তিনি কাজ করতেন, খাওয়ার শোওয়ার সময় পেতেন না।

বাংলাদেশে নির্বাচনের ফল আজ ইতিহাস। জনজীবনের প্রবীণ কর্মীরা চিত্তরঞ্জনের মনোনীত অপরিচিত ব্যক্তিদের কাছে পরাজয় স্বীকার করেন। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের অন্যতম পথিকৃৎ ও রাজনীতিক্ষেত্রে প্রবীণতম শ্রী সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় পরাজিত হন তখনও পর্য্যন্ত রাজনীতিক্ষেত্রে সম্পূর্ণ অপরিচিত ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের কাছে। চিত্তরঞ্জনের নিজের জ্যেঠতুত ভাই বাংলাদেশের তদানীন্তন অ্যাডভোকেট জেনারেল শ্রী এস. আর. দাসকে কম খ্যাতিসম্পন্ন সাতকড়িপতি রায়ের কাছে পরাজয় স্বীকার করতে হয়। বিখ্যাত চিকিৎসক স্যার নীলরতন সরকার নতি স্বীকার করলেন বিজয়কৃষ্ণ বসুর কাছে।

দেশবন্ধু অসাধ্য সাধন করলেন। এক বছরেরও কম সময়ে তিনি কংগ্রেস কর্মীদের নিজের মতবাদ গ্রহণে বাধ্য করলেন। বাংলাদেশে নির্বাচনে তিনি মুসলমানদের জন্য সংরক্ষিত আসনগুলি জয় করা ছাড়াও সেদিনের সুপরিচিত নেতাদের কয়েকজনের হাত থেকে আসন ছিনিয়ে নেন। তিনি অভূতপূর্ব সাফল্যলাভ করেছিলেন কিন্তু এজন্য শরীরের উপর কম অত্যাচার করেন নি। তার ওপর এক নতুন উদ্বেগ দেখা দিল যা তাঁকে বিচলিত করে তুলল। তাঁর অত্যন্ত অনুগত কয়েকজন শিষ্যকে ১৮১৮ সালের তৃতীয় বিধি অনুসারে গ্রেপ্তারের ভয় দেখান হল।

তদানীন্তন বঙ্গলাট লর্ড লিটন দেশবন্ধুকে প্রাদেশিক মন্ত্রীসভা গঠনের জন্য আমন্ত্রণ জানান। সহকর্মীদের সঙ্গে পরামর্শ করে দেশবন্ধু তাঁকে নিম্নরূপ জবাব দেন—

"ইওর এক্সসেলেন্সি,

আপনি যে ভাবে পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করেছেন তা আমার দলের কাছে পেশ করি, তারা আপনার সদয় প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছেন। সংস্কার আইনে প্রদত্ত বৈধ অধিকার প্রয়োগ করে দ্বৈতশাসন ব্যবস্থার অবসান ঘটাবার জন্য যথাসাধ্য করার শপথবদ্ধ হয়েছেন এই দলের সদস্যরা। তাঁরা কার্যভার গ্রহণ করলে সেই কর্তব্য পালন করতে পারবেন না। আমাদের দল জানে যে কার্য্যভার গ্রহণ করে ভেতর থেকে বাধা সৃষ্টি সম্ভব কিন্তু কার্য্যভার—যা বর্তমান ব্যবস্থায় আপনার দান স্বরূপ—গ্রহণ করে বাধা প্রয়োগের হাতিয়ার রূপে তা প্রয়োগ করা সততার পরিচায়ক হবে না বলে তাঁরা মনে করেন। এ দেশের জনগণের জাগরিত চেতনা বর্তমান শাসন ব্যবস্থায় পরিবর্তন দাবী করে। তা না করা হলে বা অন্তরের পরিবর্তনসূচক সাধারণ প্রশাসন ব্যবস্থার কিছু পরিবর্তন না হলে দেশের জনগণ স্বেচ্ছায় সহযোগিতা করবে না। হস্তান্তরিত বিভাগগুলি সম্বন্ধে দায়িত্ব নিতে আমার অক্ষমতার জন্য দুঃখিত। তবে আমার দল আপনার সংবিধানবাদী মনোভাবের—যা আপনাকে এই প্রস্তাব করতে উদ্বুদ্ধ করেছে—প্রশংসা করছে; আপনার প্রস্তাব গ্রহণের ক্ষমতা আমাদের নেই।

ভবদীয় বিশ্বস্ত

চিত্তরঞ্জন দাস"

বঙ্গীয় বিধান পরিষদে স্বরাজ্য দল শক্তিশালী বিরোধী পক্ষ হয়ে দাঁড়ায় এবং সরকারকে বারবার পরাজিত করে। অন্তরীণ ও রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তিদানের প্রস্তাব বিপুল সংখ্যাধিক্যে গৃহীত হয়। পরপর তিনটি মন্ত্রীসভার দ্রুত পতন ঘটে আর বাংলাদেশে আমলাতন্ত্রের আগের রূপ একেবারে শেষ হয়ে যায়।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

কলকাতা করপোরেশন

ভারতে স্থানীয় স্বায়ত্বশাসন উন্নয়নে স্যার সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অন্যতম বৃহৎ অবদান হল ১৯২৩ সালের কলকাতা মিউনিসিপ্যাল আইন। এতে ভোটাধিকার আরও ব্যাপক এবং কলকাতা পৌর প্রতিষ্ঠান গণতান্ত্রিক সংস্থায় পরিণত হয়। এই আইন অনুসারে কলকাতা পৌর প্রতিষ্ঠানে পঁচাশী জন কাউন্সিলর এবং পাঁচ জন অল্ডারম্যান গ্রহণের ব্যবস্থা হয়। তাছাড়া চেয়ারম্যানের পদ বাতিল করে পৌর প্রতিষ্ঠানের সাধারণ ও বিশেষ প্রতিষ্ঠানে সভাপতিত্ব করার জন্য কাউন্সিলর ও অল্ডারম্যান দ্বারা মেয়র নির্বাচন ব্যবস্থা করা হয়। চেয়ারম্যানের কাজকর্মের ভার প্রধান কার্য্যনির্বাহক অফিসারকে দেওয়া হয় যিনি মেয়রের তত্ত্বাবধানে কাজ করবেন।

দেশবন্ধু বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির নামে পৌর প্রতিষ্ঠানের নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার মনস্থ করেন। কংগ্রেস বেশীর ভাগ আসনই বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয় করে। যেসব ক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দ্বি দাঁড়িয়েছিলেন কংগ্রেস কর্মীরা সেসব ক্ষেত্রে সাধারণ ও মুসলমানদের জন্য সংরক্ষিত আসন দুটিই জয় করে নেন। সারা সহরের অভিমত ছিল দেশবন্ধুর কলকাতার প্রথম মেয়র হওয়া উচিত। প্রথমে অনিচ্ছা দেখা দিলেও দেশবন্ধু শেষ পর্য্যন্ত রাজী হন।

মেয়র হিসাবে দেশবন্ধু তাঁর উদ্বোধনী ভাষণে অসামরিক প্রশাসন সম্বন্ধে তাঁর ধারণা প্রাঞ্জল ভাষায় ব্যাখ্যা করেন। এটা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে যে নাগরিক জীবন সম্বন্ধে তাঁর মনোভাব পরিষদে প্রবেশ বিষয়ে মনোভাব থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। এখানে তিনি গড়তে চান, ধ্বংস করতে নয়। পৌর প্রতিষ্ঠানের জন্য তিনি নিম্নরূপ কার্য্যসূচী স্থির করেন—অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা, দরিদ্রদের জন্য বিনা খরচে চিকিৎসার ব্যবস্থা, বিশুদ্ধতর ও সস্তা খাদ্য ও দুধ সরবরাহ, পানীয় ও অপরিশোধিত জল সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নয়ন, বাজার ও জনাকীর্ণ অঞ্চলে স্বাস্থ্যকর ব্যবস্থার উৎকর্ষ সাধন, দরিদ্রের জন্য গৃহনির্মাণ, সহরগুলির উন্নয়ন, যানবাহন ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং সস্তায় প্রশাসন ব্যবস্থার কর্মতৎপরতা বৃদ্ধি।

দেশবন্ধু আরও বলেন, "গরীবকে দরিদ্র নারায়ণ হিসাবে সেবা করা ভারতীয় জনগণের মহান আদর্শ। তাদের কাছে ভগবান আসেন দরিদ্রের রূপ ধরে তাই দরিদ্রের সেবাই তারা ভগবানের সেবা বলে মনে করে। তাই আপনাদের সকল কার্য্যকলাপ দরিদ্র সেবায় নিয়োগ করার জন্য আমি চেষ্টা করব। আপনারা লক্ষ্য করেছেন আমার পরিকল্পিত কর্মসূচীতে অধিকাংশ বিষয়ই দরিদ্রদের জন্য। পৌর প্রতিষ্ঠান যদি এই কার্য্যসূচী সীমিতভাবেও রূপায়িত করতে পারে তাহলে এর অস্তিত্ব ন্যায়সঙ্গত হবে।"

প্রশাসনিক ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য দেশবন্ধু সুভাষচন্দ্রকে প্রধান কার্য্য নির্বাহক অফিসার নিয়োগ করেন।

দেশবন্ধু মেয়র হবার অল্পকাল পরেই কলকাতা পৌর প্রতিষ্ঠানের মেথরেরা ধর্মঘট করে। তিনি তাদের ডেকে বলেন, তারা যদি অবিলম্বে কাজে যোগদান না করে তাহলে তিনি স্বয়ং স্বেচ্ছাসেবকদের নিয়ে জঞ্জাল সাফ করতে বেরোবেন। তবে তারা যদি বিনাসর্তে কাজে যোগদান করে তাহলে তাদের বেতন বৃদ্ধি

ও প্রকৃত অভিযোগ দূর করার সম্পূর্ণ দায়িত্ব তিনি গ্রহণ করবেন। তাঁর এই আবেদনে তৎক্ষণাৎ সাড়া পাওয়া যায় এবং ধর্মঘট প্রত্যাহার করা হয়।

এ প্রসঙ্গে পত্র পত্রিকার মাধ্যমে জনমত গঠনে চিত্তরঞ্জনের প্রয়াসের কথাও উল্লেখ করা যায়। এক অর্থে সাংবাদিকতা তাঁর রক্তে ছিল। ১৯০১ সাল থেকে তিনি, 'নিউ ইণ্ডিয়া' পত্রিকার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। বাংলা মাসিক 'নারায়ণ' এক নতুন ধরণের সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক পত্রিকা। পরিষদে প্রবেশ সম্বন্ধে তাঁর মতবাদ ঠিক প্রতিপন্ন করার জন্য ১৯২২ সালে তিনি একটি বাংলা সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করেন।

১৯২৩ সালে তিনি ফরোয়ার্ড পাবলিশিং কোম্পানী প্রতিষ্ঠা করেন, এতে ডিরেক্টরদের মধ্যে ছিলেন পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু, শরৎচন্দ্র বসু, তুলসী গোস্বামী ও পি. ডি. হিম্মৎসিংকা। 'ফরোয়ার্ড' নামে একটি দৈনিক পত্রিকা আত্মপ্রকাশ করে ২৩শে অক্টোবর ১৯২৩ তারিখে। পত্রিকাটি ভারতীয় সাংবাদিকতার নতুন মান প্রতিষ্ঠা করে এবং জনমতের ওপর এর বিরাট প্রভাব ছিল। এই পত্রিকায় সম্পাদকীয় ও বিশিষ্ট প্রবন্ধগুলি চিত্তরঞ্জনের নির্দেশে লেখা হতো। সেগুলি জোরালো হলেও বক্তব্য বা ভাষার দিক থেকে কখনই চরমপন্থী ছিল না। পত্রিকার ন্যায্য ও নির্ভীক সমালোচনা সরকার ও জনগণ উভয়কে সমভাবে আকৃষ্ট করে।

সুভাষচন্দ্র বসু কলকাতা পৌর প্রতিষ্ঠানের প্রধান কার্য্য নির্বাহক অফিসার হওয়ার আগে কিছুকাল এই পত্রিকাটি পরিচালনা করেন। প্রধান কার্য্য নির্বাহক অফিসার হলে তাঁকে এই কাজ ছেড়ে দিতে হয়। গোড়াতেই চিত্তরঞ্জন বলে দিয়েছিলেন, এ পত্রিকায় শুধু রাজনৈতিক সংবাদই দেওয়া হবে না—কলা, সাহিত্য, বিজ্ঞান, স্থাপত্য, চিত্রাঙ্কন, খেলাধূলা, মঞ্চ ও ছায়াছবির জন্য বিশেষ পাতা দিতে হবে। বৈচিত্র্য এবং ন্যায্য ও নির্ভীক সমালোচনার জন্য 'ফরোয়ার্ড' পত্রিকা দেশে একটা শক্তি হয়ে দাঁড়ালো।

চতুর্দশ অধ্যায়

বঙ্গ চুক্তিপত্র

চিত্তরঞ্জন তাঁর রাজনৈতিক জীবনের গোড়ার দিকেই উপলব্ধি করেছিলেন যে ভারতের স্বাধীনতা লাভের জন্য হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে বন্ধুত্ব ও সমঝোতা অত্যাবশ্যক। স্বাভাবিক সময়ে উভয়ের মধ্যে ভাল সম্পর্ক থাকলেও সামান্যতম কারণে প্রায়ই তিক্ততার সৃষ্টি ও সংঘর্ষ বাধে দেখে তিনি ব্যথিত হন। বিশেষত, যুক্তপ্রদেশ, বিহার ও পাঞ্জাবে মাঝে মাঝে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা লাগে দেখে তিনি বিশেষ বিচলিত হয়ে পড়েন। বাংলাদেশের ভাগ্য এদিক থেকে মোটামুটি ভাল হলেও ১৮৯১ ও ১৮৯৫ সালে টালার দাঙ্গামা ও ১৯১২ সালের দাঙ্গা প্রমাণ করে দেয় এই ভাল সম্পর্ক কত অনিশ্চিত। দেশবন্ধুর মনে পড়ল ১৯০৫ সালে ব্রিটিশ আমলারা নিজেদের অবস্থা আরও জোরালো করার জন্য এক সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে অন্য সম্প্রদায়কে উস্কানি দিয়েছিলেন। প্রকৃতপক্ষে নবগঠিত আসাম ও পূর্ববঙ্গের তদানীন্তন ছোটলাট স্যার বমফিল্ড ফুলার প্রকাশ্যে নাকি বলেছিলেন, "হিন্দু বউ যদি আমার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করে তাহলে আমি নিশ্চয়ই আমার ভালবাসা মুসলমান বউকে দেব।"

এই মনোভাবের পরিপ্রেক্ষিতেই ১৯০৯ সালের ভারতীয় পরিষদ আইনে প্রথম পৃথক নির্বাচক মণ্ডলী গঠনের ব্যবস্থা করা হয়।

কংগ্রেস এই সমস্যা সম্বন্ধে বহু বছর ধরে সচেতন ছিল। দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে অমীমাংসিত সমস্যাগুলির সমাধানের উদ্দেশ্যে

১৯১৬ সালে কংগ্রেস ও লীগের মধ্যে একটা চুক্তি হয়। কংগ্রেস পাঞ্জাব প্রদেশ বিধান পরিষদে মুসলমানদের জন্য একান্ন শতাংশ আসন নির্দিষ্ট করে দিতেও রাজী হয়। ১৯২৩ সালের কলকাতা পৌর আইনেও কয়েক বছর মুসলমানদের বিশেষ সুবিধা দেওয়ার কথা বলা হয়। এই পটভূমির পরিপ্রেক্ষিতে দু সম্প্রদায়ের মধ্যে স্থায়ী শান্তি বিধান এবং যুগ্ম দাবী ও কার্য্যকলাপের ভিত্তি স্থাপনের উদ্দেশ্যে দেশবন্ধু বিখ্যাত হিন্দু-মুসলমান চুক্তিপত্র রচনা করেন।

এই চুক্তিতে বঙ্গীয় আইন সভায় প্রতিনিধিত্ব করার উদ্দেশ্যে জনসংখ্যার ভিত্তিতে যৌথ নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হয়। মুসলমানেরা তাদের ঘাটতি মিটিয়ে তাদের সংখ্যা অনুপাতে উপযুক্ত না হয়ে ওঠা পর্য্যন্ত তাদের দিকে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়ার নির্দেশও এই চুক্তিতে দেওয়া হয়। মসজিদের সামনে গীতবাদ্য ও গোহত্যার মত বিভিন্ন বিষয়েরও উল্লেখ করা হয় এই চুক্তিতে। প্রত্যেক সম্প্রদায়কে অনুরোধ করা হয় এমন কোন কাজ না করতে যাতে অন্য সম্প্রদায় মনে আঘাত পায়।

শ্রেষ্ঠতম মনোভাব নিয়ে চুক্তিটি রচিত হলেও একে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক বাদ প্রতিবাদ শুরু হল। হিন্দুদের মধ্যে গোঁড়া সাম্প্রদায়িকেরা চিত্তরঞ্জনের নিন্দা শুরু করলেন। তিনি হিন্দুদের আধকার বিলিয়ে দিয়েছেন, এই তাঁদের অভিযোগ। অধিকতর নরমপন্থী হিন্দুরাও বললেন যে চিত্তরঞ্জন মুসলমানদের আস্থা অর্জনের চেষ্টায় তাঁদের অত্যন্ত সুবিধে দিয়েছেন। আবার, মুসলমানদের মধ্যে গোঁড়া সাম্প্রদায়িকেরা বললেন, পুরো চুক্তিটা একটা ছদ্মাবরণ মাত্র, নিজের সম্প্রদায়ের ওপর মুসলমান নেতাদের প্রভাব খর্ব করার চেষ্টা চিত্তরঞ্জন করছেন। তবে অধিকাংশ মুসলমান চিত্তরঞ্জনের চুক্তিকে তাঁদের অধিকারের সনদ বলে অভিহিত করেন এবং

চিত্তরঞ্জন প্রায় রাতারাতি তাঁদের অবিসংবাদী নেতা হয়ে দাঁড়ালেন।

উভয় সম্প্রদায়ের সন্দেহবাদীদের বোঝাবার জন্য চিত্তরঞ্জনকে কঠোর সংগ্রাম করতে হয়। তিনি বলেন যৌথ দাবী ও যৌথ কাজের ভিত্তি রচনা এই চুক্তি করবে। দেশ স্বাধীন হলে এই দু সম্প্রদায়ের মধ্যে অবিশ্বাস ও সন্দেহ বৃদ্ধির জন্য কোন দল থাকবে না। তাঁরা পরস্পরকে বিশ্বাস করতে শিখবেন এবং সহযোগিতার মাধ্যমে কাজকর্ম করা সম্ভব হবে। তিনি বলেন, অহিংস অসহযোগ ব্যতীত স্বরাজ লাভ সম্ভব নয়। চিন্তা ও কাজে একমাত্র হিন্দু মুসলমানের ঐক্যের মাধ্যমেই অহিংস অসহযোগ কার্য্যসূচী কার্য্যকরী হতে পারে।

দেশবন্ধু উপলব্ধি করলেন যে কংগ্রেস কর্তৃক তাঁর মতবাদের সমর্থন প্রথমে অর্জন করা দরকার। জাতির ঐক্য ও স্বাধীনতার জন্য তাঁর আবেগময় ভাষণে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি অভিভূত হয় ও তাঁর চুক্তি অনুমোদন করে। তাঁর পরবর্তী কাজ হল নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সমর্থন লাভে চেষ্টা করা। কোকনদে কংগ্রেসের অধিবেশনে এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়। সেখানে চিত্তরঞ্জনের প্রস্তাবটি চাপা দেওয়ার চেষ্টা করা হয় কারণ দিল্লীতে অনুষ্ঠিত বিশেষ অধিবেশনে গৃহীত প্রস্তাব অনুসারে একটি সর্বভারতীয় চুক্তিপত্র কমিটির বিবেচনাধীন ছিল। কোকনদে আলোচনা চলাকালে চিত্তরঞ্জন বিরোধী কয়েকজন দাবী করেন যে তাঁর চুক্তিটি রহিত করতে হবে।

কিছু বাধা যে আসবে তা চিত্তরঞ্জন ধরে নিয়েছিলেন কিন্তু তার তীব্রতা দেখে তিনি বিস্মিত হন। বিশেষত কয়েকজনের মনোভাব

দেখে তিনি মর্মাহত হন—বাংলাদেশে যা কিছু হয়েছে তা সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করতে তাঁরা চেয়েছিলেন। তিনি এক ক্রোধব্যঞ্জক ভাষণে বলেন, "আপনারা বঙ্গ চুক্তি আপনাদের প্রস্তাব থেকে বাদ দিতে পারেন কিন্তু ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস থেকে বাংলাদেশকে বাদ দিতে কোনমতেই পারেন না। জাতীয় অধিবেশনে বাংলাদেশের প্রস্তাব বিবেচিত হওয়ার দাবী বাংলাদেশ করছে। বাংলাদেশ তার অধিকার থেকে বঞ্চিত হোক এমন কথা বলার অধিকার কারুর কি আছে? এরকম বিনা আড়ম্বরে বাংলাদেশকে বাদ দেওয়া যাবে না। 'বাংলাকে বাদ দাও' বলে যাঁরা চীৎকার করছেন তাঁদের যুক্তি আমি বুঝি না।

"বাংলাদেশ কি অস্পৃশ্য? এ ধরণের একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নে মন্তব্য করার অধিকার বাংলাদেশকে দিতে কি আপনারা অস্বীকার করবেন? তা যদি করেন তাহলে নিজের পায়ে দাঁড়াবার ক্ষমতা বাংলাদেশ রাখে। প্রস্তাব করার অধিকার থেকে বাংলাদেশকে বঞ্চিত করতে আপনারা কোনমতেই পারেন না।"

কোকনদ অধিবেশনে স্থির হয় যে, এই প্রস্তাব সম্বন্ধে প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটিগুলি নিজেদের মত প্রকাশের পর চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবেন নিখিল ভারত চুক্তি কমিটি। এতে দেশবন্ধু সন্তুষ্ট হন, কারণ বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি ইতিপুর্বে বঙ্গ চুক্তি অনুমোদন করেছে। অতএব নিখিল ভারত চুক্তি কমিটিকে বঙ্গ চুক্তি সম্বন্ধে বিবেচনা করতেই হবে। কোকনদ কংগ্রেসের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাবে স্বরাজ্য দলের অস্তিত্ব স্বীকার এবং স্বরাজ্য দলের সমর্থনে যেসব কংগ্রেসকর্মী বিধান পরিষদে নির্বাচিত হয়েছেন তাঁদের অনুমোদন করা হয়।

১৯২৪ সালের মে মাসে সিরাজগঞ্জে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। বঙ্গ চুক্তি আবার বিতর্কের বিষয়

হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু দেশবন্ধু চারঘণ্টাব্যাপী এক ভাষণে সমালোচক-দের যথাযথ উত্তর দেওয়ার পর বিপুল হর্ষধ্বনির মধ্যে বঙ্গ চুক্তি গৃহীত হয়। দেশবন্ধুর জীবিতাবস্থায় বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির অনুমোদিত কার্য্যসূচীরূপে এই চুক্তি বজায় থাকে।

সিরাজগঞ্জ অধিবেশনে গৃহীত আর একটি প্রস্তাব নিয়ে বাদ প্রতিবাদ হয়েছিল। বাংলাদেশের তরুণ বিপ্লবী গোপীনাথ সাহা কলকাতা পুলিশ কমিশনার স্যার চার্লস টেগার্ট ভ্রমে জনৈক ব্রিটিশ ব্যবসায়ী আর্নেষ্ট ডে'কে গুলী করে হত্যা করে। সাহা ধরা পড়ে এবং বিচারে তার ফাঁসী হয়। এই ঘটনা সম্বন্ধে সিরাজগঞ্জ অধিবেশনে নিম্নরূপ প্রস্তাব নেওয়া হয়—

"এই সম্মেলন হিংসার নিন্দা ও তার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে অহিংসা নীতি আঁকড়ে ধরলেও গোপীনাথ সাহার স্বার্থত্যাগের আদর্শের—যদিও তা দেশের বৃহত্তর স্বার্থের পরিপ্রেক্ষিতে বিপথে পরিচালিত হয়েছিল—প্রশংসা করে এবং তাঁর মহান আত্মত্যাগের জন্য সম্মান জানাচ্ছে।"

এই প্রস্তাব—বিশেষত সংবাদপত্রে যেভাবে তার বিবরণ প্রকাশিত হয়েছিল সেজন্য—যথেষ্ট ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি করে। আমেদাবাদে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির বৈঠকেও প্রস্তাবটি উত্থাপন করা হয়। কিন্তু দেশবন্ধুর সমর্থন সত্বেও তা বাতিল হয়। এই উপলক্ষ্যে দেশবন্ধু বলেন যদিও এ প্রস্তাব গৃহীত হয়নি, তাঁর বক্তব্য বিফলে যায়নি—গোপীনাথ সাহার মহান স্বার্থত্যাগের প্রশংসা মহাত্মা গান্ধী প্রকাশ্যে করেছেন। দেশবন্ধু দাসের মৃত্যুর পর মহাত্মা গান্ধী বলেন, এ বিষয়ে তাঁদের মতভেদ হল প্রকৃতপক্ষে প্রেমিক যুগলের কলহের মত। উল্লেখযোগ্য যে, ১৯৩১ সালে করাচীতে সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত কংগ্রেস

অধিবেশনে মহাত্মা গান্ধীর উপস্থিতিতে ভগৎ সিং, সুখদেব ও রাজগুরু সম্বন্ধে আরও জোরালো ভাষায় একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। করাচীর সেই প্রস্তাব সম্বন্ধে মহাত্মা গান্ধীর প্রায়শ সমালোচক সুভাষচন্দ্র বসু বলেন, "করাচীতে এমন একটা পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছিল যার ফলে যেসব লোক সাধারণ অবস্থায় এ প্রস্তাবের কয়েক মাইলের মধ্যে আসত না তারা নিঃশব্দে সেটি গলাধঃকরণ করে। আর মহাত্মা গান্ধীকে এ প্রস্তাবের জন্য তাঁর বিবেককে কিছুটা নমনীয় করতে হয়।"

দুঃখের বিষয়, দেশবন্ধুর মৃত্যুর পরে তাঁরই কয়েকজন শিষ্য বঙ্গ চুক্তি অস্বীকার করেন। মৌলানা আজাদের মতে, এই চুক্তি অস্বীকার হল হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে অনৈক্য উত্তরোত্তর বৃদ্ধি এবং শেষ পর্যন্ত দেশভাগের অন্যতম কারণ। যে ইতিহাস ঘটলেও—ঘটতে—পারত তা নিয়ে জল্পনা কল্পনা করা বৃথা, কিন্তু একথা জোরের সঙ্গে বলা যায় যে, চিত্তরঞ্জন বেঁচে থাকলে অবিভক্ত ভারত ১৯৪৭ সালের অনেক আগেই স্বাধীনতা লাভ করত।

পঞ্চদশ অধ্যায়

তারকেশ্বর সত্যাগ্রহ

রাজনৈতিক ঘটনাবলীর বিবরণী আবার শুরু করার আগে এখানে তারকেশ্বরের ঘটনার কথা উল্লেখ করা হয়ত অপ্রাসঙ্গিক হবে না। বাংলাদেশে তারকেশ্বর একটি বিখ্যাত তীর্থস্থান ছিল, এখনও আছে। আগেকার মোহান্তেরা ধর্মপ্রবণ ছিলেন কিন্তু পরবর্তীকালের কয়েকজন মোহান্তের সুখ্যাতি ছিল না। প্রায় একশ বছর আগে ১৮৭২ সালে মাধব গিরি নামে এক মোহান্ত হত্যার মামলায় জড়িয়ে পড়ে। এলোকেশী নামে এক তরুণী তার স্বামী নবীনের হাতে মারা পড়ে। কিন্তু অনেকের বিশ্বাস মাধব গিরিই আসল অপরাধী। মোহান্তরা ক্ষমতার অপপ্রয়োগ করতে থাকে। মহাবীর দলের স্বামী সত্যানন্দ ও স্বামী বিশ্বানন্দ এসব বন্ধ করার জন্য আন্দোলন শুরু করেন।

বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে মোহান্ত ছিলেন সতীশ গিরি। তাঁর সঙ্গে এঁটে উঠতে না পেরে সংস্কারকেরা দেশবন্ধুর শরণাপন্ন হলেন।

তারকেশ্বরের কয়েকটি ঘটনার কথা শুনে দেশবন্ধু নিজেই বিচলিত হয়ে পড়েছিলেন। সেজন্য তিনি ঘোষণা করলেন বাংলাদেশের সম্মান রক্ষার জন্য আন্দোলনের ভার তিনি নেবেন। তাঁর আহ্বানে হাজার হাজার তরুণ এগিয়ে এল আন্দোলনের কষ্টভোগ করার জন্য এবং তারা কারাবরণ করে। দেশবন্ধু দাসের ছেলে চিররঞ্জন দাশ

প্রথম স্বেচ্ছাসেবকদলে ছিলেন এবং গ্রেপ্তার হন। আন্দোলন অব্যাহত গতিতে চলতে লাগল। বাংলাদেশের লাট লর্ড লিটন শ্রীরামপুরে এক বক্তৃতায় তারকেশ্বরের আন্দোলনকে বিরাট ধাপ্পাবাজি বলে অভিহিত করেন। কিন্তু দেশবন্ধু তাঁর কাজে অবিচলিত থাকেন এবং শীঘ্রই প্রমাণ্‌ করে দেন যে এ আন্দোলন প্রকৃত আন্দোলন, ধাপ্পাবাজি নয়।

দেশবন্ধু সকল পরিণামের জন্য প্রস্তুত ছিলেন। স্বেচ্ছাসেবকদের ওপর পুলিশ গুলি চালান সত্বেও তিনি আন্দোলন প্রত্যাহার করেন নি। প্রকৃতপক্ষে মোহান্তকে পুলিশ সাহায্য করায় স্বেচ্ছাসেবকদের সঙ্কল্প আরও দৃঢ় হয় আর হাজারে হাজারে তরুণ এগিয়ে আসে আন্দোলন সফল করার জন্য, অবশেষে মোহান্ত বুঝতে পারেন যে তিনি আর গদীতে থাকতে পারবেন না। তিনি পদত্যাগ করেন। তাঁর অন্যতম শিষ্য প্রভাত গিরি মোহান্ত হন এবং তিনি কংগ্রেস সিদ্ধান্ত মেনে নিতে রাজী হন। স্থির হয় যে, তারকেশ্বরের নামে দেবোত্তর সম্পত্তির সমস্ত আয় এবং তীর্থযাত্রীদের কাছ থেকে প্রাপ্ত প্রণামী ও চাঁদা তীর্থযাত্রীদের সেবাতেই ব্যয়িত হবে। উদ্বৃত্তাংশ জাতি গঠনের নানা কাজে ব্যয় করা হবে।

ঠিক এই সময় চুক্তিটি ঠিকমত পালনে বাধা দেয় ব্রাহ্মণ সভা। হুগলীর আদালতে দেওয়ানী মামলা শুরু হয়। ফলে স্থিতাবস্থা বজায় থাকে। দেশবন্ধুর মৃত্যুর বহু পরে আদালতের রায় বেরোয়। এই বাধা দানের জন্য ব্রাহ্মণ সভার কাজের নিন্দা করে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি একটি প্রস্তাব গ্রহণ করে।

ষোড়শ অধ্যায়

বেলগাঁও কংগ্রেস

আইনসভা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার অনুমতি লাভ চিত্তরঞ্জনের পক্ষে প্রথম দফায় জয়লাভ। তার ফলে স্বরাজ্য দল গঠন—যা বাংলাদেশে দ্বৈত শাসন প্রায় বানচাল করে দেয়। দেশবন্ধু নিজে প্রথমে নির্বাচনে দাঁড়ান নি। কিন্তু তাঁর অন্যতম প্রধান সহকারী বীরেন্দ্রনাথ শাসমল ডায়মণ্ডহারবার ও মেদিনীপুর উভয় স্থান থেকে নির্বাচিত হওয়ায় তাঁকে একটি আসন ত্যাগ করতে হয়। দেশবন্ধুকে এবার নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য প্ররোচিত করা হয়। বঙ্গীয় বিধান পরিষদে স্বরাজ্য দলের প্রথম নেতা হলেন দেশবন্ধু।

কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভাতেও স্বরাজ্য দল বিরাট সাফল্য লাভ করে পণ্ডিত মতিলাল নেহরুর নেতৃত্বে। তাঁদের প্রথম জয় হল ব্যবস্থাপক সভার সভাপতিরূপে বিঠলভাই প্যাটেলের নির্বাচন। তারপর বিজয়গতি অব্যাহত থাকে। বিপুল ভোটাধিক্যে অ-জনপ্রিয় ব্যবস্থাগুলি অগ্রাহ্য এবং দেশগঠনমূলক প্রস্তাবগুলি সমর্থিত হয়।

৯ই জানুয়ারি ১৯২৪ তারিখে দেশবন্ধুর সভাপতিত্বে লক্ষ্ণৌতে স্বরাজ্য দলের বৈঠক বসে। কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভায় জাতির নিম্নলিখিত দাবীগুলি পেশ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়—

(১) সমস্ত রাজনৈতিক ও অন্তরীণ বন্দীকে মুক্তি দিতে হবে।

(২) সমস্ত দমনাত্মক আইন প্রত্যাহার করতে হবে।

(৩) ভারতের ভাবী সংবিধানের নীতি স্থির করার জন্য জাতীয় সম্মেলন আহ্বান।

এই দাবীগুলি পেশ করার সময় ব্যবস্থাপক সভায় পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু ঘোষণা করেন, "আমাদের দলকে ধ্বংসকারী বলে উড়িয়ে দেওয়া যাবে না। সহযোগিতা করার জন্যই আমরা এখানে এসেছি। এ সহযোগিতা যদি সরকার গ্রহণ করেন তাহলে তাঁরা দেখবেন যে স্বরাজ্যবাদীরা তাঁদেরই লোক। আর তা যদি না করেন তাহলে স্বরাজ্যবাদীরা নিজেদের পায়ে দাঁড়াবে এবং অসহযোগ চালিয়ে যাবে। তারা বাজেটের বিরোধিতা এবং সর্বাত্মক বাধা দানের নীতি গ্রহণ করবে।"

তদানীন্তন স্বরাষ্ট্র সদস্য স্যার ম্যালকম হেইলী পাল্টা জবাবে বলেন যে, সরকার দাবীগুলি পর্য্যায়ক্রমে বিবেচনা করতে প্রস্তুত আছেন। তিনি উল্লেখ করেন, বর্তমান পরিস্থিতিতে দাবীগুলি মেনে নেওয়া যায় না। কারণ ১৯১৯ সালের ভারত শাসন আইন অনুসারে বড়লাটের জন্য সংরক্ষিত বিশেষ সুবিধার আওতায় ওগুলি পড়ে না। স্বরাজ্য দল তাঁর যুক্তি মেনে নেন নি। এ বিষয়ে তাঁরা ব্যবস্থাপক সভায় জাতীয়তাবাদী ও নির্দলীয় সদস্যদের সমর্থন পেয়েছিলেন।

স্বরাজ্য দল আইনসভা দখল করাতে দেশবন্ধু আনন্দিত হলেও তিনি চান, বিধান পরিষদে প্রবেশ কংগ্রেসের প্রধান কার্য্যসূচী হোক। ইতিমধ্যে মহাত্মা গান্ধী অ্যাপেণ্ডিসাইটিস অপারেশনের পর জেল থেকে ছাড়া পেয়েছেন। তিনি তাঁর পত্রিকা 'ইয়ং ইণ্ডিয়া'র সম্পাদনার ভার পুনরায় গ্রহণ করেন। এবং শীঘ্রই স্পষ্ট বোঝা গেল যে তিনি আগের মতই পরিষদ বর্জনের পক্ষপাতী।

ভবিষ্যৎ কার্য্যসূচী সম্বন্ধে আলোচনা করার জন্য দেশবন্ধু ও পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে জুহুতে ১৮ই মে ১৯২৪ তারিখে সাক্ষাৎ করেন। এই সাক্ষাতের ফলে স্বরাজ্যবাদী ঐ দুজন নেতা খুব খুশী হন নি। কারণ মহাত্মা গান্ধী বিধান পরিষদে প্রবেশ সম্পর্কে কংগ্রেসের দিল্লী ও কোকনদ অধিবেশনে গৃহীত প্রস্তাবে অসন্তোষ প্রকাশ করেন। মহাত্মা গান্ধী পরে যে বিবৃতি দেন তাতে তাঁদের মনোভাবের মৌলিক পার্থক্য স্পষ্ট ধরা পড়ে। পরিষদে প্রবেশ অসহযোগ আন্দোলনকে ধ্বংস করেছে বলে তিনি মনে করেন। তবে তিনি একটা বিষয়ে রাজী হন। স্বরাজ্যবাদীদের বাধা দেওয়ার দরকার কংগ্রেসের নেই বলে তিনি মনে করেন। তাঁর মতে কংগ্রেসীদের উচিত হল খাদি, বিলিতি কাপড় বর্জন, মদ্যপান নিরোধ ও ব্যয় সঙ্কোচের জন্য সৃজনমূলক কাজ করা।

দেশবন্ধু ও পণ্ডিত মতিলাল নেহেরুও এক যুগ্ম বিবৃতিতে পরিষদ বর্জন সম্পর্কে মহাত্মা গান্ধীর মতবাদ না গ্রহণের কারণ দেখান। তাঁরা বলেন, পরিষদে প্রবেশ হল অসহযোগের আর এক রূপ। কারণ স্বরাজবাদীরা পরিষদে প্রবেশ করছিলেন সাংবিধানিক অচলতা সৃষ্টি করার জন্য।

দু নেতাই মহাত্মা গান্ধীর গঠনমূলক কার্য্যসূচী এবং আইন অমান্য আন্দোলন সম্বন্ধে তাঁর ধারণা পূর্ণ অনুমোদন করেন।

দেশবন্ধু ও পণ্ডিত মতিলাল আরও বলেন, "যে মুহূর্তে আমরা দেখব যে আইন অমান্য আন্দোলন ব্যতীত আমলাতন্ত্রের স্বার্থান্বেষী জেদ মেটান অসম্ভব, আমরা আইনসভা থেকে অবসর গ্রহণ করে দেশকে আইন অমান্য আন্দোলনের জন্য তৈরী করব। ততদিনে দেশ যদি আইন অমান্য আন্দোলনের জন্য তৈরী না হয়ে থাকে

তাহলে আমরা খোলাখুলিভাবে মহাত্মা গান্ধীর পরিচালনা মেনে নেব এবং তাঁর পতাকা তলে সমবেত হয়ে, কংগ্রেসের হয়ে, ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করব যাতে আইন অমান্য আন্দোলনের কার্যসূচী সম্যক রূপায়িত হয়।"

জুহুতে অবস্থানকালে চিত্তরঞ্জন স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের আকস্মিক মৃত্যু সংবাদ পান। তিনি গভীর শোকাভিভূত হন। কলকাতায় ফিরে মেয়র হিসাবে তাঁর বিদায়ী ভাষণে আশুতোষের দেশসেবার কথা উল্লেখ করে তাঁর আত্মার প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেন।

নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির পরবর্তী বৈঠক আমেদাবাদে ২৭শে জুন ১৯২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়।

মহাত্মা গান্ধী পাঁচ দফা বর্জনের—খেতাব, আইনসভা, স্কুল ও কলেজ, আদালত এবং বিলিতি কাপড়—কার্য্যসূচী গ্রহণ করার উপর জোর দেন। তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে ঘোষণা করেন যাঁরা পাঁচ দফা বর্জন নীতি গ্রহণ করবেন না এবং সত্য ও অহিংসা নীতি সম্বন্ধে যাঁদের বিন্দুমাত্র সন্দেহ আছে তাঁদের কংগ্রেস কার্য্য নির্বাহক কমিটিতে থাকা উচিত নয়।

এই মর্মে একটি প্রস্তাবও পেশ করা হয় যে সমস্ত কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানের নির্বাচিত সদস্যদের প্রতিদিন চরখা চালাতে এবং প্রত্যেক মাসে প্রায় দু হাজার গজ তাঁদের হাতে কাটা তন্তু নিখিল ভারত খাদি বোর্ডকে পাঠাতে হবে। প্রস্তাবটিতে শাস্তিমূলক ব্যবস্থাও ছিল—কোন সদস্য দুটি সর্তের একটিও না পালন করলে ধরে নেওয়া হবে যে তিনি কার্য্যভার ত্যাগ করেছেন।

পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু বৈধতার প্রশ্নে প্রস্তাবটি চ্যালেঞ্জ করেন। তাঁর যুক্তি হল, যাঁরা কংগ্রেসের উদ্দেশ্য স্বীকার করে আনুগত্য পত্রে স্বাক্ষর দিয়ে সদস্য হয়েছেন তাঁদের উপর একটা নতুন সর্ত আরোপ করে তাঁদের আসনচ্যুত কোনমতে করা যেতে পারে না। কংগ্রেসের প্রাক্তন সভাপতিদের পদাধিকার বলে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সদস্য হওয়ার অধিকার কেড়ে নেওয়ার যে ব্যবস্থা উক্ত প্রস্তাবে করা হয়েছে তিনি তারও বিরোধিতা করেন।

তদানীন্তন কংগ্রেস সভাপতি মৌলানা মহম্মদ আলি এই বৈধতার প্রশ্নে কোন রুলিং দেন নি। তিনি ভোট গ্রহণের প্রস্তাব করেন। পণ্ডিত মতিলাল নেহেরুর বক্তব্য ৮৩—৬৭ ভোটে অগ্রাহ্য করা হয়। তিনি ঘোষণা করেন স্বরাজবাদীরা সদলে বেরিয়ে যাবেন কিন্তু শীঘ্রই ফিরে আসবেন গৃহীত সিদ্ধান্ত পালটে দেওয়ার জন্য।

স্বরাজবাদী সদস্যেরা অধিবেশন ছেড়ে চলে যাওয়ার পর আসল প্রস্তাবটি ভোটে ফেলা হয়। শাস্তিমূলক ব্যবস্থাটি মাত্র ৬৭-৩৭ ভোটে গৃহীত হয়। মহাত্মা গান্ধী মনে করেন প্রস্তাবটি প্রকৃতপক্ষে পরাজিত হয়েছে কারণ এই ৩৭টি ভোটের সঙ্গে ৬৭ জন স্বরাজবাদীর—যাঁরা সভাকক্ষ ত্যাগ করে গেছেন—ভোট যোগ করলে এই শাস্তিমূলক সর্তটি বাতিল হত। সেজন্য তিনি নিজেই এই সর্তটি বাদ দেওয়ার জন্য চাপ দেন।

বিকেলে এক সম্মেলনে মহাত্মা গান্ধী দেশবন্ধু ও পণ্ডিত মতিলালের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। আলাপ আলোচনার পর স্থির হয় যে পাঁচ দফা বর্জনের প্রস্তাব প্রকাশ্য অধিবেশনে পেশ করা হবে—তবে পরিষদ বর্জনের প্রসঙ্গটি সংশোধন করে

দিল্লী ও কোকনদ অধিবেশনে গৃহীত প্রস্তাবের অনুরূপ করার পর। এই আপোষমূলক প্রস্তাবটি প্রকাশ্য অধিবেশনে পেশ করা হল এবং স্বরাজ্য দল তাঁদের দৃষ্টিকোণ বজায় রাখতে সক্ষম হন।

১৬ই আগষ্ট ১৯২৪ তারিখে কলকাতায় নিখিল ভারত স্বরাজ্য দলের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। দলের সকল বিশিষ্ট নেতাই এই সম্মেলনে যোগদান করেন। সম্মেলনে এক ভাষণে দেশবন্ধু বলেন, "আপনারা এর যে নামই—অসহযোগ, সহানুভূতিশীল, সহযোগিতা—দিন না কেন, আমি আমার কার্য্যসূচী সুস্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করতে চাই। আমাদের ব্যবস্থার বিরুদ্ধে অবলম্বিত যে কোন ব্যবস্থা ধ্বংস করতে আমরা সঙ্কুচিত হব না। সরকারকে এ কথা বলতে আমরা সঙ্কোচ বোধ করব না, 'আমাদের ন্যায্য দাবী তোমরা না মানা পর্য্যন্ত তোমাদের শাসনব্যবসা আমরা ধ্বংস করে দেব। তোমাদের ব্যবস্থা ধ্বংস না করে আমাদের ব্যবস্থা গড়তে পারছি না। ধ্বংস করাতে যে একটা বিশেষ আনন্দ আছে তা নয়, কিন্তু আমাদের পথের বাধা দূর না করা পর্য্যন্ত আমরা কিছু গড়তে পারব না।"

স্বরাজ্য দলকে সমর্থন জানাবার আবেদন করে তিনি ভাষণ শেষ করেন—"আমি আপনাদের আবেদন জানাচ্ছি—আমলাতন্ত্র বা ভারত সচিবের কাছে নয়—আমি আপনাদের কাছে আবেদন জানাচ্ছি, দেশের সামনে স্বরাজবাদীরা যে নীতি তুলে ধরেছেন তা আপনারা দৃঢ়তার সঙ্গে সমর্থন করুন। আমরা অবশ্যই কাজ করব কিন্তু আমাদের নিঃশ্বাস ফেলার সময় দিন। বিরূপ সমালোচনা ও প্রশ্ন জর্জরিত করে আমাদের বিচলিত করবেন না। আমার জীবনের গত কুড়ি বছর ধরে আমি এ নিয়ে অনবরত ভেবেছি এখন আমার বাকী জীবন দেশের কারণে উৎসর্গ করেছি।

আমাতে আস্থা রাখুন, ভগবানের ইচ্ছায়, আমার লক্ষ্য সাধন না হওয়া পর্যন্ত আমি মরব না।"

আমেদাবাদে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির বৈঠক অনুষ্ঠিত হওয়ার পর মহাত্মা গান্ধী নতুন করে দেশের পরিস্থিতি পর্য্যালোচনা করতে শুরু করেন। দিল্লী, শাহজাহানপুর, লক্ষ্ণৌ, এলাহাবাদ, জব্বলপুর ও নাগপুরে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধতে দেখে তিনি বিস্মিত ও মর্মাহত হন। সব থেকে জঘন্য দাঙ্গা হয়েছিল মালাবারে মোপলা জেলাগুলিতে—প্রায় চার হাজার লোক ঘর ত্যাগ করতে বাধ্য হয়।

দাঙ্গার কারণ সম্বন্ধে তদন্ত করার জন্য মহাত্মা গান্ধী ও মৌলানা সৌকত আলিকে নিয়ে একটি কমিটি গঠিত হয়। দাঙ্গার কারণ এবং বিভিন্ন সম্প্রদায়ের দায়িত্বের ভাগ বিষয়ে তাঁরা একমত হতে পারেন নি। সৌকত আলি ১৯১৯ সালে মহাত্মা গান্ধীর ঘনিষ্ঠতম অনুগত কর্মী ছিলেন। এখন মহাত্মা গান্ধী তাঁর অভিমত গ্রহণ না করায় তিনি তাঁর নেতৃত্ব অস্বীকার করেন।

মহাত্মা গান্ধী বহু ভারতীয়ের নৃশংস আচরণে এমন বিচলিত হয়েছিলেন যে তিনি একুশ দিন ব্যাপী অনশন করার সিদ্ধান্ত করেন। তার ফলে ভারতের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের একটি সম্মেলন দিল্লীতে অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে ভারতে ইংরেজ ধর্মযাজক এবং কয়েকজন ব্রিটিশ প্রতিনিধিও উপস্থিত ছিলেন। ঐক্য সম্মেলন নামে অভিহিত এই সম্মেলনে দেশবন্ধু বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করেন। সম্মেলনে গৃহীত কতগুলি সিদ্ধান্ত হল—(১) প্রত্যেক ব্যক্তির ধর্মাচরণের পূর্ণ স্বাধীনতা থাকা উচিত। (২) গো-হত্যা বলপূর্বক বা আইনের সাহায্যে বন্ধ করা যায়, এমন প্রত্যাশা হিন্দুদের করা উচিত নয়, একমাত্র পারস্পরিক বিশ্বাস ও সম্মতির দ্বারাই তা করা সম্ভব। (৩) অনুরূপভাবে

মুসলমানদেরও এ আশা করা উচিত নয় যে, আইন বা আদালতের সাহায্যে মসজিদের সামনে গীতবাদ্য বন্ধ করা যাবে—এরজন্য প্রয়োজন পারস্পরিক সম্মতি বা বিশ্বাস।

জাতীয় ও স্থানীয় পর্য্যায়ে পঞ্চায়েত গঠনের সুপারিশও এই সম্মেলনে করা হয়। কেন্দ্রীয় জাতীয় পঞ্চায়েতের সভাপতি হন মহাত্মা গান্ধী। হাকিম আজমল খাঁ, লালা লাজপত রায় এবং আরও তিনজন সদস্য এই পঞ্চায়েতে ছিলেন। কেন্দ্রীয় কমিটি সাম্প্রদায়িক ঐক্য উন্নয়নে বিভিন্ন ব্যবস্থা অবলম্বন এবং দাঙ্গা লাগা মাত্র তা থামাবার পদ্ধতি সম্বন্ধে সুপারিশ করেন।

সম্মেলন শেষ হওয়ার পর দেশবন্ধু সিমলা অভিমুখে রওনা হন। তাঁর স্বাস্থ্যহানি উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। বায়ু পরিবর্তন একান্তভাবে প্রয়োজন ছিল তাঁর। কিন্তু বিশ্রাম তাঁর কপালে ছিল না। সুভাষচন্দ্র বসু ও অন্যান্য অনেক সহকারীর গ্রেপ্তার হওয়ার সংবাদ তাঁর কাছে পৌঁছাল। চিত্তরঞ্জন তৎক্ষণাৎ ফিরে এলেন কলকাতায়। পৌর প্রতিষ্ঠানের এক বৈঠকে তিনি বলেন—

"দেশের প্রত্যেক সৎ ব্যক্তি এ কথা বলতে বাধ্য, 'আমি আমার দেশকে ভালবাসি—ভালবাসি আমার স্বাধীনতা। আমার নিজের তত্ত্বাবধানের অধিকার আমার অবশ্যই থাকা দরকার'।

"তা যদি অপরাধ হয়, স্বীকার করছি আমি অপরাধী। তা যদি অপরাধ হয়, তাহলে সেই কর্তব্য—যা বর্তমানে প্রত্যেক ভারতীয়ের কর্তব্য হয়ে দাঁড়িয়েছে বলে আমি মনে করি—এড়ানর চেয়ে আমি ফাঁসিতে যেতে রাজি আছি।

"আমি শুধু এই কথাই বলতে চাই, সুভাষ যদি বিপ্লবী হয়, আমিও বিপ্লবী। তাহলে আমাকে কেন গ্রেপ্তার করা হয় নি?

হাঁ, আমি জানতে চাই, কেন? দেশকে ভালবাসা যদি অপরাধ হয়, আমি অপরাধী। সুভাষ অপরাধী হলে আমিও অপরাধী। পৌর প্রতিষ্ঠানের শুধু প্রধান কার্য্য নির্বাহক অফিসার নয়, মেয়রও সমান অপরাধী।

"আমি শুধু বলতে চাই, এইসব অর্ডিন্যান্স আমাদের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করা হচ্ছে শুধুমাত্র আইনসঙ্গত প্রতিষ্ঠানগুলিকে শেষ করার জন্য।

"তৃতীয় বিধি অনুসারে সুভাষ বসুর গ্রেপ্তার আমলাতন্ত্রের পাশবিক শক্তির প্রকাশ মাত্র। একদিন সকালে পৌর প্রতিষ্ঠানের প্রধান কার্য্য নির্বাহক অফিসারের কাজ করতে তিনি গেলেন। ঘরে ফিরে দেখলেন পুলিশ দাঁড়িয়ে আছে। তাঁর বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ দায়ের করা হয় নি। তাঁর কাছ থেকে কোন কৈফিয়ত চাওয়া হয় নি। তাঁকে কোন কারণ দেখান হল না, শুধু বলা হল, 'আমাদের পাশবিক শক্তি আছে, তোমাকে আমরা কারাগারে টেনে নিয়ে যাব।' এই কি আইন? এই কি বিচার?"

কলকাতায় ফিরেই দেশবন্ধু আমলাতন্ত্রের এই নতুন আক্রমণের কথা তারযোগে মহাত্মা গান্ধী, পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু, শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু ও অন্যান্য নেতাদের জানান। ভারতের প্রায় সমস্ত বিশিষ্ট নেতাই কলকাতায় আসেন এবং সারা ভারতে এই দমনাত্মক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সোচ্চার হয়ে ওঠে। বাংলাদেশে অত্যন্ত শক্তিশালী ও ব্যাপক প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। সরকারী কাজের প্রতিবাদের জন্য ৩১শে অক্টোবর অনুষ্ঠিত এক সভায় দেড়লক্ষ লোক যোগদান করে। মহাত্মা গান্ধী, পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু এবং অন্যান্যেরা নভেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে কলকাতায় পৌঁছান ও দেশবন্ধুর সঙ্গে যোগ দেন। মহাত্মা গান্ধী এবার

বুঝতে পারেন যে, বিধান পরিষদ এবং কলকাতা পৌর প্রতিষ্ঠানে স্বরাজ্য দলের সাফল্যই আমলাতন্ত্রকে ক্ষেপিয়ে দিয়েছে, হিংসাত্মক পন্থা অবলম্বনে বাধ্য করেছে। সরকার স্বরাজ্য দলের শ্রেষ্ঠ কর্মীদের গ্রেপ্তার করে দলের কার্য্যসূচী বানচাল করতে চেয়েছিলেন।

দেশনেতাগণ উপলব্ধি করলেন, তাঁদের মধ্যে মতভেদ অবিলম্বে দূর করে আন্দোলনের জন্য একটি সর্বসম্মত কার্য্যসূচী গ্রহণ করা দরকার। এক যুক্ত বিবৃতিতে মহাত্মা গান্ধী, দেশবন্ধু এবং পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু বিধান পরিষদগুলিতে বিশেষত বাংলাদেশে ও কেন্দ্রে—স্বরাজ্য দলের সাফল্যের কথা উল্লেখ করে এই দলের কার্য্যসূচী কংগ্রেসের প্রধান কার্য্যসূচীরূপে গৃহীত হওয়ার দাবী করেন। তাঁদের অন্যান্য ঘোষণার মধ্যে ছিল—(১) জাতীয় কার্য্যসূচী হিসেবে অসহযোগ আন্দোলন—বিলিতি কাপড় বর্জন বাদে—স্থগিত রাখতে হবে; (২) সকলকে গঠনমূলক কার্য্যসূচী গ্রহণ করতে হবে; (৩) স্বরাজ্যদল কংগ্রেসের হয়ে বিধান পরিষদে কাজ চালিয়ে যাবে এবং (৪) কংগ্রেসের সদস্যদের বার্ষিক চার আনা চাঁদার বদলে দু'হাজার গজ হাতে কাটা সূতো পাঠাতে হবে।

বিধান পরিষদ বর্জনের নিজস্ব কার্য্যসূচী ত্যাগ করে সেখানে প্রবেশ কংগ্রেসের প্রধান কার্য্যসূচী বলে অনুমোদন করে মহাত্মা গান্ধী তাঁর উদার মন ও রাজনৈতিক বিজ্ঞতার পরিচয় দেন। ২৩শে নভেম্বর ১৯২৪ তারিখে বম্বেতে অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির এক বৈঠকে তিনজন নেতার যুক্ত বিবৃতিকে পূর্ণ সমর্থন জানান হয়।

দেশবন্ধু এবার পল্লী সংগঠনমূলক কাজে পূর্ণ শক্তি নিয়োগ করেন। সর্বসাধারণের নিকট এক আবেদনে তিনি বলেন, "স্বরাজ্য

দলের কার্য্য নির্বাহক পরিষদ ডিসেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে কলকাতা ও হাওড়ায় শুধুমাত্র স্বরাজের কাজ করতে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। জনসভার আয়োজন করে যে সব বিষয় ব্যাখ্যা করা হবে তা হল, দেশের বর্তমান পরিস্থিতি, আমলাতন্ত্রের দমনাত্মক নীতি যার ফলে সম্প্রতি ধরপাকড় চলছে, তৃতীয় বিধির পুনরুজ্জীবন ও নতুন অর্ডিন্যান্স জারি, বম্বেতে বর্তমানে যে সর্বভারতীয় সর্বদলীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হচ্ছে তার ফলাফল ও বিধান পরিষদের ভেতরে ও বাইরে স্বরাজ্য দলের ভবিষ্যৎ কর্মসূচী। তাছাড়া চাঁদা সংগ্রহ করাও হবে। বর্তমান মুহূর্তে সরকারের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়ে দাঁড়ানোর পরম প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে দেশবাসীকে সচেতন এবং সেদিক থেকে বিচার করে আমাদের সম্পদ—লোকবল ও অর্থ একত্র করার জন্য আমায় চেষ্টা না করলেও চলবে। দেশের কাজে তাঁরা যা কিছু ব্যয় করতে পারেন তা দেওয়ার জন্য আমি সর্বসাধারণের কাছে আবেদন জানাচ্ছি। আমাদের স্বেচ্ছাসেবকেরা সীল করা কৌটা নিয়ে বাড়ী বাড়ী চাঁদা সংগ্রহ করবে। আশা করি কলকাতা ও হাওড়ার প্রত্যেক নাগরিক অন্তত এক টাকা করে দেবেন। মফঃস্বলেও স্বরাজ্য সপ্তাহ পালন করা হবে। তার তারিখ শীঘ্রই জানান হচ্ছে। আমি আপনাদের সকলকে গ্রামে কাজ করার জন্য আবেদন জানাচ্ছি। আমি চিরকাল বিশ্বাস করে এসেছি গ্রামেই আমাদের মুক্তি রয়েছে।”

আগেই বলেছি, তাঁর প্রধান সহকারীদের গ্রেপ্তারের সময় চিত্তরঞ্জনের শরীরের অবস্থা ভাল ছিল না। তা সত্বেও সিমলায় বিশ্রাম গ্রহণে ইতি ঘটিয়ে তিনি কলকাতায় ফিরে আসেন। দেশকে প্রস্তুত ও স্বরাজ্য তহবিলে একলক্ষ টাকা সংগ্রহ করার জন্য তিন সপ্তাহ ধরে যে অবিরাম পরিশ্রম তিনি করেছিলেন তাতে তাঁর স্বাস্থ্যের গুরুতর অবনতি ঘটে ও তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। তা সত্বেও বেলগাঁওতে মহাত্মা গান্ধীর সভাপতিত্বে

আসন্ন কংগ্রেস অধিবেশনে তিনি অনুপস্থিত থাকতে চাইলেন না। কারণ সেই অধিবেশনে বিধান পরিষদে প্রবেশ নিয়ে আলোচনা হওয়ার কথা।

বেলগাঁওতে দেশবন্ধু ও মহাত্মা গান্ধীর মধ্যে পুনর্মিলন সম্পূর্ণ হল। দেশবন্ধু বলেন, "আমি ঠিকই জানতাম মহাত্মা গান্ধী ছাড়া পেলে স্থায়ী ঐক্য লাভ করা যাবে। আমলাতন্ত্র সারা ভারতকে চ্যালেঞ্জ করে এই বাংলাদেশে। আর সেই চ্যালেঞ্জের জবাব কি হল? বিলিতি কাপড় বর্জন। আমলাতন্ত্র আশা করেছিল বেলগাঁওতে খুব ঝগড়া হবে কিন্তু মহাত্মা গান্ধী তাদের হতাশ করেছেন। গঠনমূলক কার্য্যসূচীতে আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস আছে কিন্তু শত্রুকে যেখানে সম্ভব তার ভিত্তি উপড়ে ফেলার সুযোগ দেওয়াতে আমি বিশ্বাস করি না। আমি জানি বিধান পরিষদ আমাদের স্বরাজ এনে দেবে না কিন্তু আমাদের অগ্রগতির অন্তরায় বলে ওগুলি ধ্বংস করতে হবে। আমাদের জীবন গঠনের জন্য স্থানীয় স্বায়ত্বশাসন প্রতিষ্ঠানগুলি অবশ্যই দখল করতে হবে। পরিষদের কাজকর্মই স্বরাজবাদীদের চূড়ান্ত কর্মসূচী নয়। ওগুলি ধ্বংস করার পর আমরা বেরিয়ে আসব।"

বেলগাঁও কংগ্রেস দেশবন্ধু ও পণ্ডিত মতিলালের ব্যক্তিগত জয়স্বরূপ। কারণ বিধান পরিষদ দখল কংগ্রেসের প্রধান রাজনৈতিক কর্মসূচীরূপে এই অধিবেশনে গৃহীত হয়। বিলিতি কাপড় বর্জন বজায় থাকে। কিন্তু অন্যান্য বর্জন প্রত্যাহার করা হয়। বছর শেষ হবার আগেই স্বরাজ দল কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানে বলিষ্ঠতম শক্তি হয়ে দাঁড়াল। কংগ্রেস অধিবেশনে এবারই চিত্তরঞ্জনের শেষ যোগদান।

সপ্তদশ অধ্যায়

শেষ ইচ্ছাপত্র

আইন ব্যবসা ত্যাগের পর চিত্তরঞ্জন রাতারাতি কলকাতার শ্রেষ্ঠতম ধনীদের একজন থেকে দরিদ্রতমদের একজন হয়ে দাঁড়ান। কিন্তু তাঁর দায়িত্ব অপরিবর্তিত থাকে কারণ বহু কর্মী গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য তাঁর মুখাপেক্ষী ছিল। একমাত্র সম্পত্তি যা বজায় ছিল তা হল ভবানীপুরের প্রাসাদতুল্য ভবন। কর্মীদের অসংখ্য দাবী মেটাবার জন্য এ বাড়ীটাও বন্ধক দেওয়া হয়। দেশবন্ধুর কয়েকজন বন্ধু তাঁর পরিবারের জন্য বাড়ীটি রক্ষা করতে চান কিন্তু দেশবন্ধু স্থির করলেন দেশের কাজে তা দান করতে হবে। সম্পত্তির মোট মূল্য ৩,২৬,০০০ টাকা স্থির হয় কিন্তু মোট দেনার পরিমাণ ছিল লক্ষাধিক টাকা। চিত্তরঞ্জন স্থির করলেন দেনা মিটিয়ে বাকা টাকা দিয়ে নিম্নরূপ উদ্দেশ্যগুলি সাধনের জন্য একটি ট্রাষ্ট গঠন করা হবে—

(১) শিক্ষা

(২) মন্দির নির্মাণ করে দেবমূর্তি প্রতিষ্ঠা ও নিত্যপূজা

(৩) হিন্দু ছেলেদের ধর্মশিক্ষা

(৪) মাতৃমন্দির প্রতিষ্ঠা (অনাথ আশ্রম ও সকল সম্প্রদায়ের অবলাদের আশ্রয়) এবং

(৫) দরিদ্র ও দুর্দশাগ্রস্তদের সাহায্য দান।

দেশবন্ধু অছি মনোনীত করেন শ্রীতুলসীচন্দ্র গোস্বামী, শ্রীনির্মলচন্দ্র চন্দ্র, শ্রীনলিনীরঞ্জন সরকার, শ্রীসত্যমোহন ঘোষাল

ও ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়। দেশবন্ধুর মৃত্যুর পর স্যার নীলরতন সরকার ও শ্রীসুকুমাররঞ্জন দাসকেও অছি নিয়োগ করা হয়। মহাত্মা গান্ধীও এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করেন এবং অছিদের সঙ্গে পরামর্শক্রমে দেশবন্ধু স্মৃতি তহবিল গঠন করেন যাতে কালে আট লক্ষ টাকা সংগৃহীত হয়েছিল। বহু উত্তমর্ণ স্বেচ্ছায় দাবী ছেড়ে দেন এবং অছিগণ দেশবন্ধুর ভবন নারী হাসপাতালে রূপান্তরিত করেন। হাসপাতালের নাম হল চিত্তরঞ্জন সেবা সদন। আজ তা একটা বিরাট প্রতিষ্ঠান যেখানে হাজার হাজার নারীকে বিনা খরচে বা সুবিধাজনক হারে চিকিৎসা করা হয়। এর সাফল্যের মূলে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের উল্লেখযোগ্য অবদান রয়েছে।

দেশবন্ধু বেলগাঁও থেকে ফেরেন জ্বর নিয়ে। তিনি পিত্তাধিক্যজনিত শূল বেদনায় কষ্ট পাচ্ছিলেন। তা সত্বেও বিধান পরিষদের অধিবেশনে যোগ দিতে তিনি মনস্থ করেন। এই অধিবেশনে বঙ্গ জরুরী বিধি সম্বন্ধে আলোচনার কথা ছিল। ৭ই জানুয়ারী, ১৯২৫ তারিখে সকালে তিনি শয্যাশায়ী অবস্থাতেই ঘোষণা করলেন, "কালাকানুন নিয়ে বিধান পরিষদে আলোচনা হবে। যেমন করে হোক আমি পরিষদে যাব ও কালাকানুনের বিরোধিতা করব।" তাঁকে ষ্ট্রেচারে করে বিধানসভা কক্ষে আনা হয়। ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় ও ডাঃ যতীন্দ্র মোহন দাসগুপ্ত—উভয়েই বিধান পরিষদের সদস্য—দেশবন্ধুর পাশে পাশে ছিলেন। বিলটি অগ্রাহ্য হয়। দেশবন্ধু তাতে উৎফুল্ল হন, তাঁর শরীরও কিছুটা ভাল হয়। চিকিৎসকগণ তাঁকে অন্তত তিনমাস পূর্ণ বিশ্রাম নিতে বলেন। ২৭শে জানুয়ারী দেশবন্ধু কলকাতা থেকে পাটনা অভিমুখে রওনা হন।

পাটনা থেকে দেশবন্ধু রাজগীরে যান। কিন্তু অনিদ্রা ও দুর্বলতায় তিনি ভুগতে থাকেন। পাটনায় জনৈক হোমিওপ্যাথ

চিকিৎসক তাঁর চিকিৎসা করেন এবং তাতে চিত্তরঞ্জনের কষ্টের কিছুটা উপশম হয়। কিন্তু বিধান পরিষদের মার্চ অধিবেশনে যোগ দেওয়ার জন্য তাঁকে কলকাতায় ফিরতে হয়। এই অধিবেশনে প্রাদেশিক মন্ত্রীসভার প্রশ্নটি পুনরায় বিবেচিত হওয়ার কথা ছিল।

মন্ত্রীসভার অনুকূলে যুক্তিগুলি শোনার পরে দেশবন্ধু তাঁর স্বকীয় ভঙ্গীতে বলেন, "আমরা একটা জীবন্ত সংবিধান চাই, একটা স্বাধীন সংবিধান, যে সংবিধানে সম্মানীয় ব্যক্তিরা তাঁদের সম্মানীয় বন্ধুদের সঙ্গে একযোগে কাজ করতে পারেন। আমি বলছি বর্তমানে সমস্ত ক্ষেত্র জুড়ে বিরাজ করছে একটা কপট সংবিধান।

"যে সুন্দর প্রাসাদের কথা আমি বলেছি, দ্বৈতশাসন একেবারে শেষ করার ফলে তা নির্মাণ করা সম্ভব হবে।

"আপনারা যদি মনে করেন যে সরকার বলতে সেই সরকারই বোঝাবে যা জনগণের দ্বারা, জনগণের জন্য এবং জনগণের কল্যাণের জন্য গঠিত হয়েছে তাহলে একথা বোঝা খুব কঠিন নয় যে বর্তমান ব্যবস্থায় মন্ত্রীগণ কোন কাজেই লাগবেন না।

"আমি এখন অনায়াসেই মনে করতে পারি যে বিশ্বের কোন সরকারই—রক্ষণশীল বা শ্রমিক বা উদারনৈতিক—ভারতের মত একটা বিরাট দেশের দাবী সম্বন্ধে প্রশ্ন তুলতে পারে না।"

এই নিয়ে তৃতীয়বার বাংলাদেশের মন্ত্রীগণ ২৩শে মার্চ সোমবার ১৯২৫ তাঁদের বেতন পেলেন না। এইভাবে বাংলাদেশে দ্বৈত-শাসনের অবসান ঘটলো। চিত্তরঞ্জনের জীবদ্দশায় তাঁর পুনরুজ্জীবন সম্ভব হয় নি। কলকাতার 'দি ষ্টেটসম্যান' পত্রিকা চিত্তরঞ্জন

সম্পর্কে মন্তব্য করেন, "ভারতের প্রতিভাবান পুরুষ, বিশৃঙ্খলার দাস যাঁর আত্মিক যোগ ছিল ঘৃণাত্মক শক্তির সদর কার্য্যালয় মস্কোর সঙ্গে।"

বাংলাদেশে দ্বৈতশাসনের অবসানে এই সাফল্যের ফলে দেশবন্ধুর মধ্যে এক নতুন শক্তি ও উদ্দীপনার সঞ্চার হয়। এবার তিনি দেশকে অর্থনৈতিক পরাধীনতার শৃঙ্খল—যা বৃটেনের স্বার্থে দেশকে পরান হয়েছিল—থেকে মুক্ত করার দিকে দৃষ্টি দেন। সে সময় এক ভাষণে কৃষকদের উন্নয়নের জন্য ত্রিশ কোটি টাকা মূলধন নিয়ে একটি ব্যাঙ্ক খোলার প্রস্তাব করেন। গোড়া থেকেই দেশবন্ধু ব্যবসা বাণিজ্যে আগ্রহী ছিলেন। আইন ব্যবসায় রত থাকা কালে তিনি ইণ্ডিয়ান নেভিগেশন কোম্পানীতে অনেক টাকা বিনিয়োগ করেছিলেন। যশোহর-ঝিনাইদহ লাইট রেলওয়ে কোম্পানীর ব্যাপারে তাঁর বিশেষ আগ্রহ ছিল। তিনি প্রায়ই বলতেন, "রাজনৈতিক কার্য্যসূচীর ভার সুভাষ, তুলসী ও অন্যান্যেরা ভালভাবেই নিতে পারবে। আমি জনগণকে অর্থনৈতিক দাসত্ব থেকে মুক্ত করাতে আত্মনিয়োগ করব।"

আর একটি ঘটনায় চিত্তরঞ্জন বেশ উৎসাহিত বোধ করেন। কয়েকজন ব্রিটিশ নাগরিক সরকার এবং জনগণের মধ্যে একটা মিটমাটের চেষ্টা করেন। শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের ভক্ত মিঃ থর্ণ ও জনৈকা ব্রিটিশ মহিলা দেশবন্ধু ও লর্ড লিটনের মধ্যে সাক্ষাতের আয়োজন করেন। মন্ত্রীদের বেতন দান বন্ধ ও দ্বৈত-শাসনের অবসান আগেই ঘটান হয়েছিল। অন্যদিকে মাঝে মাঝে হিংসাত্মক কার্য্যকলাপ দেখা যাচ্ছিল। গ্রেপ্তার, অন্তরীণ ও পুলিশী অত্যাচারের পটভূমিতে সন্ত্রাসমূলক কার্য্যকলাপ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে। দেশবন্ধু ভারতীয় রাজনৈতিক সমস্যার সত্বর সমাধানের জন্য বিশেষ উৎসুক ছিলেন। কারন তিনি সরকারী

যন্ত্রকে জনসেবায় প্রয়োগ করতে চেয়েছিলেন। তাছাড়া, তিনি বিশ্বাস করতেন যে "স্বরাজ অহিংসার মাধ্যমে হয়ত পাওয়া যাবে কিন্তু হিংসা দিয়ে তা কোনদিনই লাভ করা যাবে না।" সরকারও পরিস্থিতি উন্নয়নে বিশেষ উদগ্রীব ছিলেন। এই সব বিবেচনা করে দেশবন্ধু হিংসাকে রাজনৈতিক হাতিয়ার করে তোলার নিন্দা করে প্রকাশ্যে এক বিবৃতি দেওয়ার জন্য লর্ড লিটনের অনুরোধে তৎক্ষণাৎ রাজী হন।

২৯শে মার্চ ১৯২৫ তারিখে দেশবন্ধু নিম্নরূপ বিবৃতি দেন—

"আমি এর আগে পরিষ্কার করে জানিয়েছি এবং আবার জানাচ্ছি যে আমি রাজনৈতিক হত্যা ও যে কোন রূপে হিংসার বিরোধী। আমার ও আমার দলের কাছে তা অত্যন্ত ঘৃণ্য। তা আমাদের রাজনৈতিক অগ্রগতির অন্তরায় বলে আমি মনে করি। তাছাড়া হিংসা আমাদের ধর্ম উপদেশের বিরোধী। আমি এ বিষয়ে নিশ্চিত যে, হিংসা যদি আমাদের রাজনৈতিক জীবনে মূল বিস্তার করে তাহলে চিরকালের জন্য আমাদের স্বরাজের অবসান ঘটবে। এই অমঙ্গল যাতে আর বাড়তে না পারে এবং এই পদ্ধতি আমার দেশে রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে প্রয়োগ না করা হয় তা দেখার জন্য আমি বিশেষ উৎসুক।

"আমি একথা আগেও জানিয়েছি এবং আবার জানাচ্ছি সরকারী কোন রকম দমনাত্মক ব্যবস্থার আমি অনুরূপ বিরোধী, এবং তা আমার কাছে অনুরূপ ঘৃণ্য। দমনাত্মক ব্যবস্থা দিয়ে রাজনৈতিক হত্যা বন্ধ করা যায় না বরং তাতে উস্কানি দেওয়া হয়, তাতে উৎসাহ যোগান হয়।

"আমরা সমান গৌরব ও মর্য্যাদার সঙ্গে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অংশীদার হওয়ার সর্তে স্বরাজ ও ভারতের মুক্তি লাভে দৃঢ় সঙ্কল্প।

"এ সংগ্রাম দীর্ঘ হতে পারে, এজন্য আন্দোলন কঠিন হতে পারে কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত সংগ্রাম করতে আমরা বদ্ধপরিকর।

"বাংলার তরুণ সন্তানদের বলি, স্বরাজের জন্য সংগ্রাম করো কিন্তু সেই সংগ্রামে কলুষতার স্পর্শ যেন না লাগে। আমাদের ন্যায্য দাবী যেন কলঙ্কিত না হয়। কঠোর ও অবিরাম সংগ্রাম চালিয়ে যাও। এগিয়ে যাও, সমস্ত বাধা দূর করো, স্বরাজ লাভ করো।

"ইউরোপীয়দের আমি বলি, আমাদের ভুল বুঝবেন না। আপনাদের অন্যায় সন্দেহ দূর করুন। দমনাত্মক কাজে সরকারকে সমর্থন করে—তা যতই প্রয়োজন হোক না কেন—আমাদের রাজনৈতিক জীবনে হিংসাকে পাকা খুঁটি গাড়তে অজ্ঞানকৃত সাহায্য করবেন না।"

তদানীন্তন ভারত সচিব লর্ড বার্কেনহেড এই আবেদনে অগৌণে সাড়া দেন। লর্ড সভায় বঙ্গ জরুরী বিধি নিয়ে আলোচনা কালে তিনি ঘোষণা করেন যে তাঁর মন থেকে সন্দেহ ও অবিশ্বাস দূর করতে তিনি প্রস্তুত। তিনি ভারতীয় নাগরিকদের আবেদন জানান দেশবন্ধুর নির্দেশে চলতে এবং রাজনৈতিক জীবনে হিংসা ও সন্ত্রাসের অবসান ঘটানর জন্য সরকারকে সাহায্য করতে।

পাটনায় ৩রা এপ্রিল এক ভাষণে দেশবন্ধু নিম্নরূপ জবাব দেন—

"লর্ড বার্কেনহেডের দৃষ্টিভঙ্গী পরিষ্কার ও সাহসী। তিনি অন্যায় সন্দেহ দূর করে ঘটনাবলীর দিকে নজর রাখতে প্রস্তুত আছেন জেনে আনন্দিত হলাম।

"এ ঘোষণাটির তাৎপর্য্য সাধারণ নয়।

"১৯২২ সালে গয়া অধিবেশনে আমার ভাষণে আমি আমার মনোভাব সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেছিলাম। যে অকল্যাণ স্বরাজ প্রতিষ্ঠার সবচেয়ে বড় বিঘ্ন তা দূর করার জন্য কোন কার্য্যসূচী রূপায়ণে আমি শুধু ইচ্ছুক নই, উৎসুকও বটে। কিন্তু সরকার অনুকূল আবহাওয়া সৃষ্টি না করলে আমার সমস্ত প্রয়াস অফলপ্রসূ হতে বাধ্য।

"বঙ্গ জরুরী বিধি প্রভুত্বাসীন ব্যক্তিদের আদালতের অধিকার কেড়ে নিয়ে ধরপাকড় করার ব্যাপক ও অবাধ ক্ষমতা দিয়েছে।

"একবার ইংলণ্ডের কোষাধ্যক্ষ বেকন বলেছিলেন, 'রাজদ্রোহ বন্ধ করার নিশ্চিততম পন্থা হল রাজদ্রোহের কারণটি অপসারিত করা। কারণ জ্বালানি তৈরী থাকলে কখন এক স্ফুলিঙ্গ জ্বলে উঠবে তা বলা কঠিন।' রাজদ্রোহের কারণ দুটি—অত্যধিক দারিদ্র্য ও অত্যধিক অসন্তোষ। আমার দৃঢ় বিশ্বাস শুধুমাত্র অহিংসার মাধ্যমেই ভারতের স্বাধীনতা লাভ করা যায়।

"ভারতে বিপ্লব আন্দোলন সম্ভব হওয়ার কারণ সম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে তদন্ত এবং এই রোগ চিরকালের জন্য নির্মূল করার উপায় নির্দেশের জন্য আমি লর্ড বার্কেনহেডকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। বাইরের লক্ষণ দেখে চিকিৎসার ব্যবস্থা করলে যথেষ্ট হবে না। যে মুহূর্তে ওরা দেখবে সরকার স্বয়ং স্বাধীনতার ভিত্তি স্থাপন করছেন, আমি বলছি, সেই মুহূর্তে বিপ্লব আন্দোলন বিগত হবে। যদিও আমি মনে করি, আরও আলাপ আলোচনার অনুকূল আবহাওয়া সৃষ্ট হয়েছে। সরকারের বর্তমান দমনাত্মক নীতির জন্য আমি তার সঙ্গে সহযোগিতা করতে অক্ষম।

"আমি বিপ্লবীদের হিংসা ও সরকারের দমনাত্মক ব্যবস্থা—যা হিংসার আর এক রূপ—দুয়েরই নিন্দা করেছি। যেসব শর্তে

একটা আত্মসম্মান বিশিষ্ট জাতি সহযোগিতা করতে পারে আমি সেগুলির উল্লেখ করেছি। "এখন পরবর্তী ব্যবস্থা অবলম্বন করবেন ইউরোপীয়গণ ও সরকার।"

'দি টাইমস' ও 'দি ডেইলী হেরাল্ড'এর মত ব্রিটিশ কাগজ এই ঘোষণার জন্য চিত্তরঞ্জনকে অভিনন্দন জানান। আণ্ডার সেক্রেটারি অফ্ ষ্টেট ফর ইণ্ডিয়া কমন্স সভায় হিংসা সম্বন্ধে দেশবন্ধুর বিবৃতির প্রশংসা করেন।

এর অনতিকাল পরেই ২রা মে ১৯২৫ তারিখে ফরিদপুরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনের এক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে পরামর্শ করে দেশবন্ধু উক্ত তারিখ স্থির করেন। তাঁর আসন্ন জীবনাবসান সম্বন্ধে তিনি আগেই টের পেয়েছিলেন কি না জানি না। এই সম্মেলনে তাঁর ভাষণটি সযত্নে রচনা করেন তিনি। তিনি সহকর্মীদের সঙ্গে এবিষয়ে আলোচনা করেন এবং তাঁরা তাঁর বিশ্লেষণ ও দৃষ্টিভঙ্গী সমর্থন করাতে তিনি খুব আনন্দিত হন। ১লা মে মহাত্মা গান্ধী কলকাতায় পৌঁছান। তাঁকে দেশবন্ধুর বাড়ীতে নিয়ে গেলে তিনি ভাবাবেগে আপ্লুত হন। তিনি জানতেন যে দেশবন্ধু বাড়ীটি দেশের কাজে দান করেছেন। বিকেলে মির্জাপুর পার্কে এক জনসভায় গান্ধীজী বলেন, "আজ ও বাড়ীতে গিয়ে আমি দুঃখাভিভূত হই। ঐ সুন্দর প্রাসাদটি আর দেশবন্ধুর সম্পত্তি নেই। জগতে তাঁর শেষ সম্পদ থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য তিনি ভবনটি অছিদের হাতে তুলে দিয়েছেন। তাঁর কথা মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চোখের জল বাধা মানেনি। তাঁর ভাঙ্গা স্বাস্থ্য এখনও জোড়া লাগেনি। সেই ভাঙ্গা স্বাস্থ্য নিয়েই তিনি ফরিদপুরে গেছেন। নিজের বলতে যা কিছু বোঝায় তা সমস্ত ত্যাগ করার এই মহান মনোভাব আমি সহজে কল্পনা করতে পারি না।

"বস্তুত তাঁর পার্থিব অর্জনের অবশিষ্টাংশের জন্য যখন অছি

নিয়োগ করেন তখনই ত্যাগের চরম পরকাষ্ঠা দেখা গিয়েছিল। কিন্তু তাও শেষ নয়।"

দেশবন্ধু বাসন্তী দেবীর সঙ্গে ফরিদপুরে পৌঁছেছিলেন ১লা মে ১৯২৫ তারিখে। পরদিন সকালে মহাত্মা গান্ধী সেখানে পৌঁছালেন। উভয় নেতাকেই সাড়ম্বরে অভ্যর্থনা জানান হয়।

তাঁর পূর্ব-প্রস্তুত ভাষণ পাঠ করার আগে দেশবন্ধু মহাত্মা গান্ধীকে নিম্নরূপ সম্বোধন করেন—

"মহাত্মাজী, বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনের সভাপতিরূপে আপনাকে স্বাগত জানাবার অধিকার পাওয়ার জন্য আমি গর্ববোধ করছি। অসহযোগ আন্দোলন সুরু হবার পর থেকেই আমি আপনার শিষ্য এবং এখনও শিষ্য ও সহকর্মী। আপনার গুণকীর্ত্তন আমি না করলেও চলবে। সারা বিশ্ব তাই করবে। আমি নিশ্চিত জানি আজ যেমন যেমন ভারতবর্ষ আপনার কথা শুনছে তেমনি একদিন সারা বিশ্ব আপনার কথা শুনবে। আমরা আপনার কাছে প্রেরণা চাই, চাই নির্দেশ। অসহযোগ আন্দোলনের গোড়াতে যদি আপনার প্রেরণা ও বাণী প্রয়োজন হয়ে থাকে আজ তার প্রয়োজনীয়তা আরও বেড়েছে কারণ আমি এক মুহূর্ত্ত বিশ্বাস করিনা যে এই আন্দোলন ব্যর্থ হয়েছে। বরং আমি মনে করি আমরা স্বরাজের আরও কাছে এসে পড়েছি। সংহতি সাধনের কাজে আরও এগিয়ে গিয়েছি যা না হলে স্বরাজ লাভ অসম্ভব। আজ এবং যে কোন কালে আপনার নির্দেশ বিনা ভারতের পক্ষে চলা অসম্ভব। স্বরাজ লাভ না হওয়া পর্য্যন্ত ভগবান যেন আমাদের পরিচালনা করেন, আমাদের প্রেরণা দেন। আমরা সেজন্য এবং আপনার দীর্ঘ জীবনের জন্য প্রার্থনা করছি।"

ফরিদপুরে দেশবন্ধুর ভাষণ জাতির উদ্দেশ্যে তাঁর শেষ ইচ্ছাপত্র। ভারতের সাংবিধানিক উন্নয়নের ইতিহাসে এই ইচ্ছাপত্রটি একটি স্মরণীয় অধ্যায় হয়ে থাকবে। দেশবন্ধু ঘোষণা করেন, বৃটিশ

সাম্রাজ্যবাদ যদি ভারতের আধিপত্য করতে চায় তিনি তাঁর শেষ নিঃশ্বাস দিয়ে তার প্রতিরোধ এবং বৃটিশ সাম্রাজ্য থেকে ভারতকে বিচ্ছিন্ন করার জন্য কাজ করবেন। পক্ষান্তরে, ভারতীয়দের নিজস্ব ইচ্ছেমত জীবনযাত্রা নির্বাহের অধিকার বৃটিশ জনগণ যদি স্বীকার করে নেন তাহলে তিনি সানন্দে কমনওয়েলথের ভেতরে থাকবেন। প্রকৃতপক্ষে, তিনি কমনওয়েলথের সদস্য থাকার পক্ষপাতী কারণ বিশ্বশান্তি রক্ষায় তা সাহায্য করবে। এই পরিণতি সাধনের উদ্দেশ্যে বৃটিশ সরকারের সঙ্গে সম্মানজনক সর্তে আপোষ মীমাংসা করতে তিনি প্রস্তুত। বৃটিশ সরকার যদি এই বন্ধুভাবাপন্ন প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে তাহলে দেশকে গণ আইন অমান্য আন্দোলনের জন্য অবশ্যই প্রস্তুত করতে হবে। এজন্য প্রাথমিক কাজ হিসাবে মহাত্মা গান্ধী রচিত সংগঠনমূলক কার্য্যসূচী রূপায়ণের ওপর জোর দিতে হবে।

দেশবন্ধু আরও উল্লেখ করেন যে কমনওয়েলথের মধ্যে অবাধ মৈত্রীর ব্যবস্থা যেমন আছে তেমনি পৃথক হবার অধিকারও আছে। বর্ত্তমান যুগে কোন জাতিই বিচ্ছিন্ন হয়ে বাঁচতে পারে না। কমনওয়েলথের ধারণা চিত্তরঞ্জনের কাছে আধ্যাত্মিক তাৎপর্য্যবিশিষ্ট ছিল। তাঁরই কথায়—

"কমনওয়েলথের ধারণার একটি গভীর তাৎপর্য্য আছে আমার কাছে। আমি বিশ্বশান্তিতে বিশ্বাস করি যে একদিন সারা বিশ্ব এক সঙ্ঘসূত্রে আবদ্ধ হবে। আমি মনে করি, বিশ্বের বিভিন্ন জাতি নিয়ে গঠিত বিরাট কমনওয়েলথ—তাদের প্রত্যেকের নিজস্ব জীবন পদ্ধতি, সভ্যতা, নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীসহ বিভিন্ন জাতির এই সঙ্ঘ—রাষ্ট্রনায়কের দ্বারা ঠিকমত পরিচালিত হলে যে বৃহত্তম সঙ্ঘ মানুষের কল্পনায় সম্ভব সেই মানব জাতির সঙ্ঘ গঠনে সারা বিশ্বকে এক সূত্রে গ্রথিত করার কাজে চিরস্থায়ী অবদান রেখে যাবে। তবে রাষ্ট্রনায়কদের দ্বারা তা উপযুক্তভাবে পরিচালিত হওয়া দরকার। কারণ এই ধারণার বিকাশের জন্যে সঙ্ঘের অন্তর্গত দেশগুলিকে

স্বার্থত্যাগ করতে হবে, সাম্রাজ্যবাদের ধারণা এবং সেই সঙ্গে আধিপত্য বিস্তারের জঘন্য মনোভাব চিরকালের জন্য বিসর্জন দিতে হবে। আমি মনে করি, ভারতের কল্যাণের জন্য, কমনওয়েলথের কল্যাণের জন্য, বিশ্বের কল্যাণের জন্য ভারতের উচিত কমনওয়েলথের সঙ্গে হাত মিলিয়ে সকল দেশের, সকল মানুষের স্বাধীনতার জন্য চেষ্টা এবং এইভাবে মানবিকতার সেবা করা।"

দমন সম্পর্কে দেশবন্ধু বলেন, "যথেচ্ছাচার করার ক্ষমতা সংহত করার এটি একটি পদ্ধতি। আমি সরকারের হিংসার—কারণ দমনাত্মক ব্যবস্থা হল হিংসার হিংস্রতম রূপ—তীব্র নিন্দা করি যেমন নিন্দা করি রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভের পদ্ধতিরূপ হিংসা অবলম্বনের।"

সংস্কার ব্যবস্থা সম্পর্কে তিনি বলেন, "১৯১৯ সালের ভারত শাসন আইনে কিছুই দেওয়া হয়নি, আমি তা ১৯২১ সালে আমেদাবাদ ভাষণে পরিষ্কার দেখিয়ে দিয়েছিলাম। মুড্ডিম্যান কমিটির সামনে সাক্ষ্যদানকালে নরমপন্থী লোকেরাও সংস্কার ব্যবস্থার নিষ্প্রয়োজনীয়তা প্রমাণ করে দিয়েছিলেন। হাঁ, স্বরাজ যদি সম্পূর্ণ অর্থে আমাদের দেওয়া হবে বলে এক্ষুণি পাকা চুক্তি হয়, নিকট ভবিষ্যতে যদি তা আপনা থেকে আসে, জনগণকে যদি কতগুলি প্রকৃত দায়িত্ব দেওয়া হয় এবং শাসকগণের অন্তরের পরিবর্তন যদি সত্যিই ঘটে তাহলে সরকারের সঙ্গে আমাদের সহযোগিতা না করার কোন কারণ থাকতে পারে না। আমি সব সময় বলেছি যে আমাদের গঠনমূলক কাজ এখুনি শুরু করার সুযোগ পাওয়ার জন্য আমাদের বিরাট স্বার্থত্যাগ করতে হবে।

"আমাদের মীমাংসা প্রস্তাব যদি কোন সাড়া না জাগাতে পারে তাহলে গত দু বছর ধরে আমরা যে নীতি অনুসরণ করে আসছি সেই অনুসারে আমরা জাতীয় কাজ অবশ্যই চালিয়ে যাব যাতে

সরকারের পক্ষে ব্যতিক্রমমূলক ক্ষমতা প্রয়োগ ব্যতীত দেশ প্রশাসন অসম্ভব হয়ে পড়ে…”

স্বাধীনতা সংগ্রামের অস্ত্র প্রসঙ্গে দেশবন্ধু বলেন, “জাতীয় আইন অমান্য আন্দোলন—যা স্বাধীনতার জন্য সংগ্রামী মানুষের শেষ হাতিয়ার—চালাবার জন্য আবহাওয়া সৃষ্টি করতে চাই।…কিন্তু আইন অমান্য আন্দোলনের জন্য প্রয়োজন অতি উচ্চ স্তরের সংগঠন, স্বার্থত্যাগের অসীম ক্ষমতা এবং জাতির সাধারণ স্বার্থে ব্যক্তিগত ও সাম্প্রদায়িক স্বার্থত্যাগের আন্তরিক ইচ্ছা। মহাত্মা গান্ধীর গঠনমূলক কার্য্যসূচী পুরোপুরি রূপায়িত করার জন্য ভারত প্রস্তুত না হলে ভারত কোনকালেই আইন অমান্য আন্দোলনের জন্য তৈরি হতে পারবে না বলে আমার মনে হয়।

“কিন্তু সর্বত্র আমি পুনর্মিলনের চিহ্ন দেখতে পাচ্ছি। ভারতের একটা বাণী দেবার আছে এবং বিশ্বজাতির বিরাট কমনওয়েলথে—যার কথা আমি আগে বলেছি—সেই বাণী দেবার জন্য ভারত উদগ্রীব। ব্রিটিশ রাজনীতিজ্ঞগণ কি ঠিকমত সাড়া দেবেন? তাঁদের ও আমাদের উভয়ের পক্ষে সম্মানজনক সর্তে তাঁরা শান্তি অর্জন করতে পারেন।

“এদেশের জনগণকে আমি বলি—রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভের সাহস দেখানর ফলে আপনারা বিরাট স্বার্থত্যাগ করেছেন এবং সরকারী ক্রোধের সকল পরিণাম আপনাদের সহ্য করতে হয়েছে। কিন্তু আপনাদের রাজনৈতিক অস্ত্রগুলি সরিয়ে রাখার সময় এখনও আসেনি। কঠোর সংগ্রাম করুন কিন্তু সে সংগ্রামে যেন কলুষতা না থাকে। তারপর আপোষ মীমাংসার দিন যখন আসবে—যা আসতে বাধ্য—উদ্ধত মনোভাব নয়, উপযুক্ত নম্রতার সঙ্গে শান্তি সম্মেলনে আপনারা যোগ দেবেন যাতে লোকে বলে যে আপনাদের সাফল্য আপনাদের

দুঃখ দুর্দশা থেকে আরও মহীয়ান করেছে। এবং মীমাংসার শর্তগুলি আলোচনাকালে জাতীয়তার—যা আত্মউপলব্ধির, আত্মোন্নয়ন ও আত্মচরিতার্থতার উপায় মাত্র কিন্তু জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য নয়—দম্ভে মানবিকতার বৃহত্তর দাবীর কথা ভুলবেন না।

"আমি কি খুঁজছি তার পরিষ্কার ধারণা আমার আছে। আমি চাই ভারতের সকল রাজ্যের এক সংঘ যেখানে প্রত্যেক রাজ্যের নিজস্ব সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য অনুসরণের অবাধ অধিকার থাকবে। সর্বসাধারণের সেবায় রাজ্যগুলি পরস্পরের সঙ্গে আবদ্ধ থাকবে। ভারত হবে স্বাধীন জাতিসংঘের মধ্যে এক মহান সংঘ যার স্বাধীনতা হল জনগণের স্বাধীনতা, যার মানবসেবা এবং যার ঐক্য বিশ্বের সকল মানুষের মধ্যে শান্তির আশা সঞ্চার করবে।

অষ্টাদশ অধ্যায়

শেষের কদিন

৫ই মে ১৯২৫ তারিখে দেশবন্ধু কলকাতায় ফেরেন। তিনি তখন জ্বরে ভুগছিলেন। এবার নিজের বাড়ীতে না থেকে তিনি এক বন্ধুর সঙ্গে বাস করেন। তাঁর সংস্পর্শে যাঁরা এসেছিলেন, সকলেই তাঁর মনোভাবে এক বিরাট পরিবর্তন দেখতে পেয়েছিলেন। বর্তমান লেখক এই সময় প্রতিদিনই তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতেন। দেশবন্ধু চিরকাল যোদ্ধা ছিলেন, আজ যা করা উচিত তা আগামী কালের জন্য স্থগিত রাখা তাঁর স্বভাব বিরুদ্ধ ছিল। এ সবই বদলাল। কেউ তাঁকে কিছু করতে বললেই তাঁর একমাত্র জবাব ছিল, "কিছুদিন অপেক্ষা করুন। দার্জিলিং থেকে ফিরে আপনার কাজ করব।"

একদিন তিনি তাঁর এক বন্ধুকে বলেন, মহাত্মা গান্ধীর কোন শত্রু নেই কিন্তু আমার অনেক শত্রু। তিনি মনে করতেন মহাত্মার কারুর প্রতি বিদ্বেষ নেই বলেই তা সম্ভব হয়েছে কিন্তু তিনি তাঁর অন্তর থেকে সে ভাব সম্পূর্ণ দূর করতে পারেন নি। মতভেদের ফলে মানুষে মানুষে অনৈক্য তাঁকে অধিকতর ব্যথিত করতে থাকে। তিনি প্রায়ই বলতেন, সকল প্রশ্ন আমাদের উদারতর দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে বিচার করতে হবে। জীবন ও সংগ্রামের ব্যর্থতার কথা তিনি বলতে শুরু করেছিলেন। তাঁর কথায় এমন একটা দার্শনিক স্পর্শ লেগেছিল যাতে আত্ম উপলব্ধি ও ভগবানের চরণে বিলীন হওয়ার কাছে সম্মান ও জনপ্রিয়তা অত্যন্ত তুচ্ছ হয়ে পড়েছিল।

তাছাড়া বিলাসিতা ও পার্থিব আরামের প্রতি তিনি ক্রমেই অধিকতর উদাসীন হয়ে পড়েন। বঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির

সাধারণ কর্মসচিব সাতকড়িপতি রায়কে বলেন, তিনি তাঁর সমস্ত পার্থিব সম্পদ দিয়ে দিয়েছেন। এখন তিনি সম্পূর্ণ নিঃস্ব। সাতকড়িপতি রায় উত্তরে বলেন, স্বাধীনতা সংগ্রামে জয়লাভ করার পর পার্থিব সম্পদ প্রচুর পরিমাণে তিনি পাবেন। শ্রী রায় পার্থিব ধন সম্পদের কথা বলায় চিত্তরঞ্জন আহত হন। তিনি জোরের সঙ্গে বলেন, তাঁর এখনও যেটুকু অছে তা তিনি তৎক্ষণাৎ ত্যাগ করতে প্রস্তুত আছেন। তিনি শুধু চান কংগ্রেস তাঁর জন্য গঙ্গাতীরে একটা ছোট্ট কুটীর তৈরি করে দিক যেখানে সরল জীবন যাপন করতে পারবেন তিনি।

ব্যক্তিগত বিষয় থেকে দেশবন্ধু নিজেকে সম্পূর্ণ সরিয়ে আনলেও তাঁর দেশপ্রেম আদৌ খর্ব হয়নি, তা পূর্বের মতই তীব্র ছিল। একবার সত্যরঞ্জন বক্সি ও সরোজ দত্ত তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, সরকার যদি জাতীয় দাবীতে কর্ণপাত না করেন তাহলে কি হবে? দেশবন্ধু তার জবাবে বলেছিলেন, জাতীয় স্বাধীনতা লাভের একমাত্র উপায় হল জনগণের জাতীয়তাবোধ জাগরণ করা। তিনি চেয়েছিলেন আগামী বছরে এই প্রশ্নটি সামনে রেখে যেন নির্বাচনের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা হয়। জনগণ একবার জেগে উঠলে আইন অমান্য আন্দোলন অপরিহার্য্য হয়ে উঠবে আর যথেষ্ট ব্যাপক আকারে আইন অমান্য আন্দোলন হলে কোন সুসভ্য সরকারই তা ঠেকিয়ে রাখতে পারবেন না।

১১ই মে দেশবন্ধু পাবনা অভিমুখে রওনা হন। আগে তাঁর জিনিষপত্রের তত্ত্বাবধান এবং তাঁর সুবিধা অসুবিধা দেখার জন্য সহকারী ও ভৃত্যেরা থাকতো। এবার তাঁকে সাহায্য করার কেউ নেই, সঙ্গে শুধু স্ত্রী বাসন্তী দেবী। তাই চিত্তরঞ্জন বড় অসহায় বোধ করছিলেন। 'ফরওয়ার্ড' পত্রিকার অন্যতম সম্পাদক শ্রী প্রফুল্ল চক্রবর্ত্তী সেই একই ট্রেনে যাচ্ছিলেন। তিনি চিত্তরঞ্জনের দেখাশোনা

এবং ভার নেবার জন্য এগিয়ে এলেন। পাবনায় চিত্তরঞ্জন তিন চারদিন ছিলেন এবং পদ্মাতীরে বাস করে প্রভূত আনন্দ পেয়েছিলেন। তিনি সহর এড়িয়ে চলতেন কিন্তু বহু লোকে তাঁকে দেখতো আসতো। পল্লী সংগঠনের অত্যাবশ্যকতা সম্বন্ধে তাঁদের বলতেন। এই তিন চারদিনে চিত্তরঞ্জন যথেষ্ট বিশ্রাম পেয়েছিলেন এবং ১৫ই মে তিনি দার্জিলিং অভিমুখে রওনা হন।

চিত্তরঞ্জনকে আন্তরিক অভ্যর্থনা জানাবার জন্য দার্জিলিং ষ্টেশনে ১৬ই মে তারিখে অসংখ্য লোক সমবেত হয়েছিল। নাড়াজোলের রাজাও উপস্থিত ছিলেন। জনগণ কিন্তু হতাশ হয়। কারণ দীঘাপতিয়ার মহারাজা গাড়ী পাঠিয়ে দিয়েছিলেন চিত্তরঞ্জনকে আনবার জন্য। দার্জিলিংএ চিত্তরঞ্জন স্যার নৃপেন্দ্রনাথ সরকারের—পরবর্ত্তীকালের বড়লাটের ব্যবস্থাপক পরিষদের আইন সদস্য—বাড়ী 'স্টেপ-অ্যাসাইডে' অবস্থান করেন। স্যার নৃপেন্দ্রনাথ বর্ত্তমান লেখককে ১৯শে ফেব্রুয়ারী ১৯২৬ তারিখে নিম্নরূপ চিঠি দেন—

"আমি শ্রী দাশের মতবাদের বিরোধী তা জানা সত্ত্বেও তিনি আমার প্রতি সর্বদাই সদয়ভাব পোষণ করতেন। আমি একদিন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে তাঁর অবস্থা দেখে মর্মাহত হলাম। তাঁর পা দুটি রোগা হয়ে গেছে। তাঁকে বড় অবসন্ন দেখাচ্ছিল। আমি তাঁকে দার্জিলিংএ এসে আমার আতিথ্যের জন্য অনুরোধ করলাম। আমি বল্লাম আমি তাঁকে আমার একটা বাড়ী ছেড়ে দেব। তিনি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বললেন খরচপত্র তিনি নিজেই করবেন। আজ আমি বললাম আমি যদি তাঁর অতিথি হয়ে তাঁর কোন বাড়ীতে বাস করি তাহলে তিনি কি আমাকে খরচপত্র করতে দেবেন? তিনি শেষে রাজী হন এবং আমাকে একটি মর্মস্পর্শী চিঠি লেখেন—যার বিষয়বস্তু আমি জনসমক্ষে প্রকাশ করতে পারি না।

"দার্জিলিংএ থাকার সময়ে তিনি মাঝে মাঝে আমায় চিঠি লিখতেন। তাঁর শেষের চিঠিগুলির সুর অত্যন্ত প্রফুল্লজনক।"

স্যার নৃপেন্দ্রনাথ চিত্তরঞ্জনের আরামের জন্য সমস্ত ব্যবস্থাই করেছিলেন এবং তাঁর দ্রুত স্বাস্থ্যোন্নতি ঘটতে লাগলো। প্রথমে তিনি রিক্সায় ঘোরাঘুরি করতেন। কিন্তু কয়েকদিন পরে তিনি অল্প অল্প হাঁটতে লাগলেন। মাথায় সিল্কের লাল টুপী, কাশ্মীরি ওভারকোট পরিহিত চিত্তরঞ্জনকে সন্ন্যাসীর মতো দেখাতো। অনুপ গোস্বামী—যাঁকে স্যার নৃপেন্দ্রনাথ চিত্তরঞ্জনের তত্ত্বাবধানের জন্য নিয়োগ করেছিলেন—বর্ত্তমান লেখককে বলেন যে চিত্তরঞ্জনের দুটি জিনিষ তাঁকে বিশেষ আকৃষ্ট করে। প্রথমটি হলো তাঁর সর্বত্যাগীর পোষাক এবং দ্বিতীয়টি হলো তাঁর মিষ্টি হাসি এবং পবিত্র চাহনি। তাঁর কণ্ঠস্বরেও একটি আশ্চর্য যাদু ছিল। তাঁর সংস্পর্শে যিনিই এসেছেন তিনিই অভিভূত হয়েছেন। বাহ্যত তাঁর স্বাস্থ্যোন্নতি হলেও জ্বরভোগের হাত থেকে তিনি সম্পূর্ণ অব্যাহতি পাননি। সপ্তাহে তাঁর একবার অন্তত জ্বর হতো।

প্রফুল্ল চক্রবর্ত্তী চিত্তরঞ্জনের সঙ্গে মে মাসের শেষ সপ্তাহে সাক্ষাৎ করেন। তিনি সেই সাক্ষাৎকারের নিম্নরূপ বিবরণ দিয়েছেন—

"স্টেপ অ্যাসাইড বাড়ীর বারান্দায় একটি সোফায় দেশবন্ধুর সেই অর্দ্ধশায়িত চেহারার কথা আমি কোন দিনই ভুলব না। যাঁরা তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন তিনি তাঁদের সঙ্গে মৃদুস্বরে কথা বলছিলেন। মুখে মিষ্টি হাসি। কিন্তু চাহনি অন্তস্পর্শী। দেশের কথাই তাঁর সারা মনজুড়ে বিরাজ করছিল। আমি তাঁকে শেষ দেখি ২৬শে মে তারিখে। আমি রাত্রি ৮-৩০ মিঃ দেখা করতে যাই। আমি তাঁকে বিছানায় শায়িত অবস্থায় দেখলাম। আমাকে তাঁর শেষ কথা হলো 'প্রফুল্ল তুমি বরং এখন যাও আমি একটু নাম করব।'

শ্রীমতী বেসান্ত ভারতের কমনওয়েলথ বিল সম্পর্কে দেশবন্ধুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন ২৯শে মে তারিখে। তিনি ঐ বিলের প্রত্যেকটি ধারা নিয়ে শ্রীমতী বেসান্তের সঙ্গে আলোচনা করেন এবং তাঁকে প্রতিশ্রুতি দেন যে কলকাতা ফিরেই তিনি এই বিল সম্পর্কে সহকর্মীদের সঙ্গে আলোচনা করবেন। এই ধরনের রাজনৈতিক আলোচনা তাঁকে যুগপৎ উত্তেজিত ও ক্লান্ত করত। প্রকৃতপক্ষে তাঁর মন এমনই ছিল যে একবার তিনি আবেগাবিভূত হলে সহজে স্বাভাবিক হতে পারতেন না। কীর্ত্তন শুনতে বললে দেশবন্ধু বলতেন, তাতে তিনি বড়ই অভিভূত হয়ে পড়েন। কীর্ত্তনের কথা ও সুর তাঁর মনকে এমন নাড়া দেয় যে তিনি কয়েক রাত ঘুমাতে পারতেন না।

মহাত্মা গান্ধী বঙ্গদেশ সফর করছিলেন, চিত্তরঞ্জন তাঁকে লিখলেন—"মনে রাখবেন, আপনি এখন আমার এক্তিয়ারে ঃ আমিই অভ্যর্থনা কমিটির সভাপতি। দার্জিলিংকে আপনার সফর সূচীর অন্তর্ভূক্ত করতে হবে এই আমার আদেশ।"

মহাত্মা লিখলেন—"কলকাতায় কার্য্য নির্বাহক কমিটির বৈঠক বসবে। অন্যান্য স্থানের কর্মসূচীও স্থির হয়ে গেছে। এখন সম্ভব হবে না। দয়া করে কিছু মনে করবেন না। দেশবন্ধু তার জবাবে লিখলেন—"তাহলে পুরো কমিটিকেই এখানে নিয়ে আসুন। আমি তাদের থাকার ব্যবস্থা করবো। সদস্যদের রেলভাড়া দেবে বঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি। আমি সাতকড়িকে এই মর্মে লিখছি।"

তা সম্ভব হয়নি। তবে কার্য্য নির্বাহক কমিটির বৈঠকের পরে বন্ধুকে দেখার উদ্দেশ্যে মহাত্মা গান্ধী দার্জিলিং-এ যাবার জন্য তৈরী হলেন। তিনি দেশবন্ধুকে লিখে জানালেন যে দার্জিলিং-এ তিনি মাত্র দু'দিন থাকবেন। শরীরের ওরকম অবস্থা সত্বেও

চিত্তরঞ্জন স্বয়ং গান্ধীজির আরামের সমস্ত ব্যবস্থার তত্ত্বাবধান করেন।

৪ঠা জুন মহাত্মা গান্ধী দার্জিলিং-এ পৌঁছলেন। দেশবন্ধু আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে পড়েন এবং স্বয়ং গান্ধীজির দেখাশোনার ভার নেন। মহাত্মা গান্ধীর জন্য ছাগলের হুধের ব্যবস্থা করার উদ্দেশ্যে তিনি জলপাইগুড়ি থেকে ছাগল আনিয়েছিলেন। তাঁরা একসঙ্গে চারদিন কাটিয়েছিলেন এবং দেশবন্ধুর স্বাস্থ্যোন্নতি দেখে মহাত্মা গান্ধী বিশেষ আনন্দিত হন। মাত্র হু'দিন থাকার পরিকল্পনা নিয়ে এলেও মহাত্মা গান্ধী দেশবন্ধুর অনুরোধে দার্জিলিং-এ পাঁচদিন কাটান।

ভারত সম্বন্ধে বৃটিশ মনোভাব নিয়ে হুইবন্ধু প্রায়ই আলোচনা করতেন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন লর্ড বার্কেনহেডের ভাবভঙ্গিতে আকৃষ্ট হয়েছিলেন এবং মনে করতেন যে লণ্ডনে লর্ড রিডিং-এর উপস্থিতির ফলে ভারতের স্বার্থের দিকে আরও বেশী নজর দেওয়া হবে। তখন সাধারণে বিশ্বাস করতো যে লর্ড রিডিং মুড্ডিম্যান কমিটির সংখ্যালঘুর রিপোর্টটি যাতে পার্লামেণ্টে গৃহীত হয় তারজন্য চেষ্টা করছেন। দেশবন্ধু এই আশা পোষণ করেন যে লর্ড বার্কেনহেড একজন শক্তিশালী পুরুষ এবং তিনি নিশ্চয়ই ভারতের জন্য কিছু করবেন। তিনি বলেন, শক্তিশালী পুরুষদের সঙ্গে মোকাবিলা করতে তিনি ভালবাসেন।

কিন্তু মহাত্মা গান্ধীর এ বিষয়ে গভীর সন্দেহ ছিল। তিনি বলেন, ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও দেশবন্ধুর সঙ্গে তিনি এ বিষয়ে একমত হতে পারেন না। তিনি উল্লেখ করেন হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে কোন ঐক্য নেই। প্রকৃতপক্ষে সর্বত্র তাঁদের মধ্যে সংঘর্ষ লাগছে। বাংলাদেশ নানা দলে বিভক্ত। এই পরিস্থিতিতে মহাত্মা গান্ধীর

মতে বৃটিশের কাছ থেকে কিছু পাবার আশা নেই। তাঁরা কখনও দুর্বলতার কাছে নতি-স্বীকার করেন না। সেজন্য ভারতীয়দের একমাত্র কর্তব্য হলো শক্তিশালী হওয়া।

দেশবন্ধু মহাত্মা গান্ধীর এইসব সন্দেহকে আমল দেন নি। তিনি বলেন, মহাত্মা গান্ধী একজন তার্কিকের মত তর্ক করছেন। তিনি নিজে যুক্তি নয়, অনুভূতি দিয়েই পরিচালিত হতে চান। তাঁর অন্তরের অনুভূতি হলো যে, একটা বিরাট কিছু ঘটতে চলেছে।

মহাত্মা গান্ধী মনে করেন এই গভীর বিশ্বাসে আঘাত দেওয়া উচিত হবে না। তাই তিনি চুপ করে থাকেন। পরে তিনি বলেন দেশবন্ধুর প্রগাঢ় বিশ্বাসের প্রতি গভীর সম্মান থাকার জন্য তিনি তাঁর সঙ্গে তর্ক করেন নি। তিনি আশা করেন ইংরেজেরা একদিন উপলব্ধি করবে দেশবন্ধু দাশকে হারিয়ে তাঁরা একজন প্রকৃত বন্ধু হারিয়েছেন।

দেশবন্ধু তাঁর বিশ্বাস দিয়ে ইতিপূর্বে যে আশ্চর্য্য কাজ করেছেন তা উপলব্ধি করে গান্ধীজি মুগ্ধ হয়েছিলেন। পরে তিনি লিখেছিলেন, "যদিও আমি জানতাম ইংরেজরা ঐ অবস্থায় কিছুই করবেন না এবং বার্কেনহেডের কাছ থেকে কিছু আশা করার মত তথ্য আমাদের ছিল না। আমি স্বীকার করি স্বর্গত দেশবন্ধুর—যিনি ইংরেজ রাজনৈতিকদের ভারত সম্বন্ধে পূর্বের তুলনায় আরও বেশী উদ্বুদ্ধকারীদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন—কাছে একটা কর্তব্য আছে।"

মহাত্মা গান্ধী ও দেশবন্ধু কমনওয়েলথ বিল সম্বন্ধে একমত হলে দেশবন্ধু শ্রীমতী বেশান্তকে এক পত্রে এ বিষয়ে তাঁদের অভিমত জানান। সরকার এ বিলটি অগ্রাহ্য করলে শ্রীমতী বেশান্ত কি

ব্যবস্থা অবলম্বন করতে চান তা দেশবন্ধু জানার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। তাঁর মৃত্যুর পরে শ্রীমতী বেশান্ত লেখেন, দেশবন্ধুর চিকিৎসকগণ শীতকালের পরে তাঁকে ইউরোপে যাবার পরামর্শ দিয়েছিলেন। ২৯শে ও ৩০শে মে দার্জিলিং-এ আমি তাঁর সঙ্গে বেশ কয়েক ঘণ্টা আলোচনা করেছিলাম। তাঁর ফরিদপুর ভাষণে যে অভিব্যক্তি ও দৃষ্টিভঙ্গী প্রকাশ পেয়েছে তার অনেক পরিবর্তন দেখলাম তাঁর মধ্যে। তাঁর সেই পুরানো আক্রমণাত্মক মনোভাব অদৃশ্য হয়েছে। তিনি অত্যন্ত শান্ত ও নম্র হয়ে পড়েছিলেন।

দেশবন্ধু মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে ভারতীয় রাজনীতির সকল প্রশ্ন সম্পর্কে আলোচনা করেছিলেন। তাঁদের আলোচনার বেশীর ভাগই হতো চরখা, খাদি ও পল্লীসংগঠনকে কেন্দ্র করে। চিত্তরঞ্জন ইতিমধ্যে পল্লীসংগঠনের একটি পরিকল্পনা রচনা এবং সেজন্য লক্ষাধিক টাকাও সংগ্রহ করেছিলেন। চরখা চালান সকল কার্য্যকলাপের কেন্দ্র করার পরামর্শ মহাত্মা গান্ধী তাঁকে দেন। তিনি আরও বলেন, পল্লী সংগঠনের কাজ রাজনীতি থেকে স্বতন্ত্র ও স্বাধীনভাবে করতে এবং এর ভার কোন বিশেষজ্ঞের হাতে দিতে হবে। এ কাজের ভার দেওয়ার জন্য মহাত্মা গান্ধী শ্রীসতীশচন্দ্র দাসগুপ্তের নাম প্রস্তাব করেন। দেশবন্ধু তাতে রাজী হন এবং সতীশচন্দ্র দাসগুপ্ত, সাতকড়িপতি রায় ও অন্য আর একজনকে নিয়ে একটি ছোট কমিটি গঠন স্থির হয়। তৃতীয় ব্যক্তির নাম দেশবন্ধু তখন দেন নি। তিনি যথাযোগ্য বিবেচনা করে তৃতীয় ব্যক্তি নির্বাচনের সিদ্ধান্ত করেন।

চিত্তরঞ্জন পাটনায় ডাঃ রামেন্দ্রপ্রসাদ প্রেরিত জনৈক ব্যক্তির কাছে চরখা চালান শিখছিলেন। কিন্তু তখন তাঁর শিক্ষা বেশী এগোয়নি। কিন্তু দার্জিলিং-এ তিনি বেশ কিছুক্ষণ চরখা চালাতেন। তিনি মহাত্মা গান্ধীকে হাসতে হাসতে একদিন

বলেছিলেন, হাতের কাজে তাঁর কোন দক্ষতা নেই। তাঁর স্ত্রী জানেন এ বিষয়ে তিনি কতো অসহায়। বাসন্তী দেবী এ বিষয়ে একমত হন এবং বলেন যে চিঠির বাক্স খোলবার জন্য চিত্তরঞ্জন তাঁকে ডেকে থাকেন। মহাত্মা গান্ধী ঠাট্টার সঙ্গে বলেন, এ তো মেয়েদের চাতুরীকলার একটি অঙ্গ। বাসন্তী দেবী তাঁর স্বামীকে সম্পূর্ণ অসহায় করে রেখেছেন যাতে তিনি তাঁর ওপর কর্তৃত্ব ফলাতে পারেন।

এই ঘটনার উল্লেখ করে গান্ধীজি পরে লিখেছিলেন, "দেশবন্ধুর অট্টহাসিতে মনে হলো পূরো বাড়ীটা ভেঙ্গে পড়বে। আন্তরিকতার সঙ্গে হাসবার ও কাঁদবার সমান দক্ষতা ছিল দেশবন্ধুর। কাঁদতেন তিনি গোপনে কিন্তু হাসতে পারতেন তিনি হাজার হাজার লোকের সামনে এবং তাঁর সেই হাসির রৌদ্র-দীপ্তি দিয়ে তাদের উজ্জ্বল করে তুলতেন।

একদিন দেশবন্ধু মহাত্মা গান্ধীকে জানান, গ্রামে একটা ছোট কুটিরে কৃষকের জীবন যাপন করতে যদি তিনি পেতেন তাহলে খুশী হতেন। মহাত্মা গান্ধী মন্তব্য করেন, দেশবন্ধুর রাজনীতিতে ধর্ম আগের তুলনায় আরও বিশিষ্ট ভূমিকা নিয়েছে। দেশবন্ধু তার জবাবে বলেন, তিনি রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এসেছেন কারণ তিনি রাজনীতিকে ধর্মের অঙ্গ বলেই মনে করেন। মহাত্মা গান্ধী বলেন, তা হতে পারে, তবে এই সময় তাঁর চরিত্রে আধ্যাত্মিকতার প্রভাব বেশী।

প্রমথ চৌধুরী সেই সময় দার্জিলিং-এ ছিলেন। তিনি লেখেন, "আমি আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা দিয়ে মহাত্মা গান্ধীর উক্তির সত্যতা পূর্ণ সমর্থন করতে পারি। দার্জিলিং-এ যে কেউ তাঁর সংস্পর্শে এসেছিলেন সকলেই লক্ষ্য করেন যে তাঁর স্বভাবে এমন একটা মাধুর্য্য এসেছিল যা তাঁর সহজাত কর্তৃত্বপ্রবণ চরিত্রে এক

নতুন স্নিগ্ধতা এনেছিল। আমি কখনও তাঁর মুখ থেকে রূঢ় কথা শুনিনি। আমরা অনেক বিষয়েই একমত ছিলাম না। তাঁর প্রিয় বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনাকালে কখনও উত্তাপের সঞ্চার হয়নি।”

কলকাতা পৌর প্রতিষ্ঠানের সাম্প্রতিক ঘটনাবলীতে দেশবন্ধু বিশেষ উদ্বিগ্ন হন। মিউনিসিপ্যাল বাজারের মধ্যে জনৈক মুসলমান পীরকে সমাধি দেওয়া নিয়ে মতানৈক্য দেখা দেয়। দেশবন্ধু মহাত্মা গান্ধীকে বলেন, “এই পীরের ব্যাপারটি নিয়ে আমি অত্যন্ত উদ্বিগ্ন। এভাবে হগ মার্কেটে পীরকে সমাধি দিতে অনুমতি দেওয়ার অধিকার সুভাষ বা সুরাবর্দির কারুর নেই। একটা অন্যায় হয়েছে, তা'বলে মুসলমানদের ধর্মবিশ্বাসে আমরা আঘাত করতে পারি না। একটা অন্যায় নিঃসন্দেহে হয়েছে কিন্তু কবর খুঁড়ে দেহটি বের করে নিয়ে আসা আরও বড় অন্যায় হবে।” দেশবন্ধু তারকেশ্বরের ঘটনা নিয়েও গান্ধীজির সঙ্গে আলোচনা করেন। তাঁরা একটা যুক্ত বিবৃতিতে স্বাক্ষর দেন। পরে দেশবন্ধু মহাত্মা গান্ধীকে স্বরাজ্য দলের হিসাবপত্র দেখে যেতে বলেন। মহাত্মা গান্ধী জানান যে হিসাবপত্র তিনি দেখেছেন এবং স্যার সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় অভিযোগ করেছেন। দেশবন্ধু দুঃখের সঙ্গে বলেন, বাংলাদেশে দেশকর্মীদের মধ্যে অত্যন্ত ঈর্ষা রয়েছে। তিনি মহাত্মা গান্ধীকে সুরেন্দ্রনাথ ও শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তীর সঙ্গে দেখা করে কংগ্রেসের বিভিন্ন শাখার মধ্যে অবিরোধীভাব ফিরিয়ে আনার জন্য চেষ্টা করতে অনুরোধ করেন। তিনি যদি তাতে সফল হন তাহলে বাংলাদেশের বিরাট সেবা হবে।

দুই নেতার মধ্যে হাল্কাসুরে আলোচনা হত। একবার দেশবন্ধুর বিছানার পাশে গান্ধীজি একটা চেয়ারে বসেছিলেন। দেশবন্ধু অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় কথাবার্তা বলছিলেন। দেশবন্ধু জানতেন গান্ধীজি আসন করে বসতেই ভালবাসতেন। তিনি নিজের বিছানার একদিকে একটা বালিশ রেখে দেশী কম্বল দিয়ে গদি করে

মহাত্মাকে বসতে দিলেন। মহাত্মা গান্ধী শ্রী দাশকে প্রশ্ন করলেন, "আজ আমার কি মনে হচ্ছে জানেন ?"

দেশবন্ধু— কি ?

মহাত্মা— চল্লিশ বছর আগেকার একটা কথা মনে পড়ছে। ঠিক এমনিভাবে আমি ও আমার স্ত্রী বিয়ের সময় মুখোমুখি হয়ে বসেছিলাম। এখানে কেবল তফাৎ দেখছি পাণি বন্ধনের। পরে বাসন্তী দেবীর দিকে তাকিয়ে বল্লেন, "ভাবছি বাসন্তী দেবী কি মনে করছেন।"

সমস্ত বাড়ীখানি দেশবন্ধুর উচ্চহাস্যে মুখরিত হয়ে উঠলো। হায়, সে হাসি শীঘ্রই আর শোনা যাবে না। একদিন দেশবন্ধু জিজ্ঞাসা করলেন, মহাত্মা গান্ধীর জন্য আনীত পাঁচটি ছাগল ঠিকমত দুধ দিচ্ছে কিনা। অনুপ গোস্বামীর ওপর ভার ছিল মহাত্মাজীর আহারাদির তত্ত্বাবধান করা। তিনি উত্তর দিলেন, "পাঁচটার মধ্যে দু-টো দিচ্ছে কিন্তু বাকী তিনটে অস্বীকার করছে। আমরা যতই চেষ্টা করিনা কেন তারা মাটির ওপর টান হয়ে শুয়ে পড়ে।"

মহাত্মাজী মন্তব্য করলেন, এ ছাগলদের আত্মসম্মানবোধ দেখে তিনি ভারী খুশী হয়েছেন। দেশবন্ধু জবাব দিলেন, যে তিনটি অসহযোগ করেছে তাদের কয়েদ করা দরকার। অনুগত দুটিকে মহাত্মা গান্ধীর খেতাব দেওয়া উচিত। উভয়েই উচ্চহাস্য করে উঠলেন।

দার্জিলিং-এ ষ্টেপ অ্যাসাইড বাড়ীতে পাঁচদিন ধরে চরখার গুঞ্জনা শোনা গিয়েছিল। মহাত্মা গান্ধী, মহাদেব দেশাই ও অন্যান্যেরা প্রতিদিন অনেকক্ষণ ধরে চরখা কাটতেন। বাসন্তী দেবী খুব ভাল

সূতো কাটতেন, চিত্তরঞ্জনও মাঝে মাঝে চরখা ঘোরাতেন। একদিন চিত্তরঞ্জন প্রস্তাব করলেন যে সকলে মিলে চরখা ঘোরাচ্ছেন তার ছবি নেওয়া হোক। সেখানে বহু ফটোগ্রাফার উপস্থিত ছিলেন। গান্ধীজী মন্তব্য করলেন, "অনেক রাঁধুনিতে রান্না নষ্ট। বরং পূরো ষ্টেপ অ্যাসাইডকে চরখা শিক্ষণ কেন্দ্রে পরিণত করা যাক।"

মহাত্মা গান্ধী ও দেশবন্ধু মাঝে মাঝে বেড়াতে বেরোতেন। সঙ্গে থাকতেন মহাদেব দেশাই। সে এক অভূতপূর্ব দৃশ্য। মহাত্মা গান্ধীর জানু পর্য্যন্ত ধুতি, ঊর্দ্ধাঙ্গে গরম চাদর, মহাদেব দেশাইয়ের খাদি টুপি আর দেশবন্ধুর আলখাল্লা ও সিল্কের টুপি।

ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী সে দৃশ্যের হুবহু বর্ণনা দিয়েছেন। তাঁর ভাষায়—"দার্জিলিংএ চিত্তরঞ্জনের শেষের কদিনের—যখন তাঁর সঙ্গে বাড়ীতে বা রাস্তায় দেখা হত—কথা কি বলব ! মহাত্মা গান্ধী তখন দেশবন্ধুর সঙ্গে অবস্থান করছিলেন। তাঁর গা থেকে কম্বল পড়ে গেলেই চিত্তরঞ্জন নিজে তা উঠিয়ে দিতেন। চিত্তরঞ্জন স্বয়ং চাপকান ধরণের একটি পোষাক পরতেন—যা পাশের দিকে বাঁধা যেত। পোষাকটি হয় তিনি আবিষ্কার করেছিলেন, নয়, কোন ভারতীয় ফ্যাশন দেখে অনুকরণ করেছিলেন।"

মহাত্মা গান্ধী ৯ই জুন দার্জিলিং ত্যাগ করেন। দু বন্ধুর মধ্যে আর সাক্ষাৎ হয়নি।

আগেই বলেছি ডাঃ ডি. এন. রায়ের চিকিৎসায় দেশবন্ধু আরোগ্য লাভ করছিলেন। ৯ই জুন রাতে তাঁর আবার জ্বর হয়। ১২ই জুন তিনি চিকিৎসকের সঙ্গে দেখা করতে যান। জ্বরের লক্ষ্মণ সম্পর্কে ডাঃ রায় প্রশ্ন করলে চিত্তরঞ্জন বলেন, আর একবার আক্রমণ হতে পারে ভাবলেই আমার হৃৎকম্প হচ্ছে। তিনি আরও বলেন, তাঁর

শরীর থেকে এলোপ্যাথিক বিষ ঝেড়ে ফেলতে না পারলে হোমিওপ্যাথিক ঔষধ কাজ করবে না। ঐদিন তিনি স্যার জগদীশ চন্দ্র বসুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। শ্রীমতী অবলা বসু সম্পর্কে তাঁর বোন হন। তাঁর অনুরোধে দেশবন্ধু কিছুক্ষণ কীর্তন শোনেন।

এই সময় চিত্তরঞ্জন তাঁর ঘনিষ্ঠতম বন্ধু, রাজনৈতিক জীবনে অন্তরঙ্গ সখা পণ্ডিত মতিলাল নেহেরুকে একটি চিঠি লেখেন। ভারতীয় রাজনৈতিক বিষয়ে তাঁর চিন্তাধারা এই বোধহয় শেষবার লেখনীমুখে প্রকাশ পেল। ব্যক্তিগত কুশল প্রশ্নাদির পর দেশবন্ধু লেখেন—

"আমি ভালর দিকে যাচ্ছি—তবে অত্যন্ত মন্থর গতিতে। একমাত্র অভিযোগ হল, দুর্বলতা ছাড়াও সপ্তাহে একদিন করে জ্বরাক্রান্ত হচ্ছি—ষষ্ঠ দিনে জ্বর হয়। ঠিকমত ভাল না হওয়া পর্য্যন্ত এখানে থাকার সঙ্কল্প করেছি।

"আমাদের ইতিহাসে সর্বাপেক্ষা সঙ্কটজনক মুহূর্ত আসছে। এই বছরের শেষাশেষি ও আগামী বছরের গোড়ার দিকে অনেক কাজ করতে হবে। আমাদের সব কিছু সম্পদ কাজে লাগাতে হবে কিন্তু আমরা দুজনেই অসুস্থ। ভগবান জানেন কি হবে।

"জুলাই বা আগষ্ট মাসে বা আরও পরে কিছু একটা ঘটতে পারে। আমার বিশ্বাস বার্কেনহেড-রিডিং আলোচনার ফলে কিছু একটা ঘটবে।...কে যেন আমার কানে কানে বলছে যে তাঁরা আমাদের কাছে একটা প্রস্তাব করবেন। এখন সেই প্রস্তাবের যথার্থ কোন মূল্য আছে কি না তা হল অন্য কথা। কিন্তু ইতিমধ্যে কোন কমনওয়েলথ বিল বা অনুরূপ কিছু দিয়ে আমরা বিষয়টি জটিল করে তুলতে চাই না। গ্রহণযোগ্য যদি কিছু না আসে তাহলে কংগ্রেসের পরবর্তী অধিবেশনে সুস্পষ্ট রাজনৈতিক নেতৃত্ব অবশ্যই দিতে হবে।"

এ চিঠি সম্বন্ধে পরে পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু লেখেন, "১২ই জুন আমি চম্বা থেকে ডালহৌসি ফিরে আমার টেবিলে তাঁর নিজের হাতে ঘন ঘন করে লেখা পাঁচ পাতা লম্বা চিঠি রাখা রয়েছে দেখলাম। এপ্রিল মাসে পাটনায় পরস্পরের কাছে বিদায় নেওয়ার —এখন মনে হচ্ছে তা চিরকালের জন্য—সময় আমরা স্থির করেছিলাম আমাদের অল্পস্থায়ী বিশ্রামের সময় কেউ কাউকে রাজনৈতিক বিষয়ে লিখে ব্যতিব্যস্ত করব না। তারপর আমরা কেউ কাউকে চিঠি লিখিও নি। আমাদের পরলোকগত নেতার শেষ ইচ্ছাপত্র বলে এই চিঠিটি আমার কাছে অত্যন্ত মূল্যবান।"

১৩ই জুন দেশবন্ধু বর্ত্তমান লেখককে ডেকে পাঠান। ১৪ই জুনের ভোরবেলা পর্য্যন্ত আমি তাঁর সঙ্গে ছিলাম। রাত্রের আহারের সময় তিনি কলা, রাজনীতি ও অর্থনীতি সম্বন্ধে বলেন। তিনি মন্তব্য করেন, প্রকৃত শিল্পী স্বর্গ ও আপন ঘরের সমজাতীয় বিষয়গুলির প্রতি অনুরক্ত থাকেন। তারপর তিনি একটি বাংলা কবিতার সঙ্কলন এনে চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির অংশাবশেষ অতি আবেগের সঙ্গে পাঠ করতে লাগলেন। শ্রীচৈতন্য বিষয়ে কবিতা পাঠ করতে করতে ভাবাবেগে তাঁর কণ্ঠরুদ্ধ হল এবং চোখে জল এলো।

দেশবন্ধু তারপর বলেন, এইদিন তাঁর জ্বরের পালা তাই তিনি বেশী খাবেন না। পাঁচ মিনিট অন্তর অন্তর তিনি আমাকে নাড়ী দেখতে বল্লেন। আমি যখন বল্লাম জ্বরের চিহ্নমাত্র নেই তখন তিনি খুব সুখী হলেন। সাধারণত রাত দশটায় তাঁর জ্বর আসত কিন্তু সেদিন রাতে ঐ সময়তেও জ্বর আসেনি, তিনি খুব খুশী হয়েছিলেন, সেখানে যাঁরা উপস্থিত ছিলেন তাঁরাও। খাওয়ার পর বাড়ীর অন্যান্য সকলে উপরে উঠে গেলেন। কিন্তু দেশবন্ধু আমাকে অপেক্ষা করতে বল্লেন কয়েকটি বিষয়ে আলোচনা করবার জন্য। তিনি বল্লেন, "তোমার সঙ্গে সব কাজ সেরে নেব। এই "পীরের"

ব্যাপার আমাকে অতিষ্ঠ করে তুলেছে। একদিকে আমি সর্বসাধারণের মতামত অগ্রাহ্য করতে পারি না, কাজটা বাস্তবিকই অন্যায় হয়েছে। অন্যদিকে মুসলমান সভ্যগণের মনে আঘাত দিতে পারি না। যদি অন্যান্য কাউন্সিলাররা তুলবার প্রস্তাব পাশ করে নেয়, আর এই ক্ষেত্রে মুসলমান সভ্যগণ যদি ক্ষুণ্ণ হয়ে ছেড়ে দেন, আমিও ছেড়ে দেব। তবে যদি মুসলমানদের মধ্যে কোন সম্প্রদায় এই দেহটা দাবী করে উঠিয়ে নেয়, সব গোলমাল চুকে যেতে পারে। তুমি গিয়েই শরতের সঙ্গে দেখা করবে এবং সুরাবর্দির সঙ্গে কথা বলে যাতে এ জিনিষটা হয়, দেখবে। আমি টেলিগ্রাম করে দিচ্ছি। এ বিষয়ে একটা সমাধান না হওয়া পর্য্যন্ত আমি বিন্দুমাত্র স্বস্তি পাচ্ছি না।" তিনি এই মর্মে শরৎ চন্দ্র বসুকে একটি পত্রও লেখেন।

মাঝরাত পর্য্যন্ত তিনি কথা বলে চললেন। তাঁর শরীর বেশ সুস্থ ও মনও খুব প্রফুল্ল মনে হচ্ছিল। রাত বারোটার সময় বাসন্তী দেবী উঠে উপরে গেলেন কিন্তু তক্ষুনি ফিরে এসে বললেন, "বারটা বেজে গেছে শুতে চল।" দেশবন্ধু তাঁকে দুশ্চিন্তা করতে মানা করলেন, জ্বর ঠেকান গেছে এবং তাঁর আর জ্বর হবে না। দেহ ও মনে তিনি প্রফুল্লবোধ করছিলেন। কেউ তখনও বুঝতে পারেন নি যে দীপ নেভার আগে এই তার শেষ শিখা।

আমি দেশবন্ধুর নীচের ঘরে শুয়েছিলাম। ভোরের দিকে ওপরের ঘরে একটা অস্পষ্ট গোলমালে আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল। লোকজনের চলাফেরা ও একটা কাৎরানীর আওয়াজ শোনা যাচ্ছিল। সকাল পাঁচটায় আমাকে জানানো হল যে রাত তিনটের সময় দেশবন্ধুর ভয়ানক জ্বর হয়। কম্বলের ওপর কম্বল চাপা দিয়েও তাঁর কাঁপুনি থামান যায়নি। আমি উপরে ছুটে গেলাম। আমি যেতেই দেশবন্ধু খুব মৃদুকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন, "কে?"

অবরুদ্ধস্বরে জবাব দিলাম, "আমি হেমেন্দ্র।" দেশবন্ধু বল্লেন, হেমেন্দ্র তুমি যে বলেছিলে আমার আর জ্বর হবে না।

তাঁর সেই কাতরস্বর শুনে আমার প্রাণ ফেটে যাচ্ছিল। আমি কোন কথা বলতে পারলাম না। আমি তাঁর পাশে বসে তাঁর পা, কোমর ও হাত টিপে দিতে লাগলাম। তিনি জানালেন, শুধু ঘাড়ে ও হাতে নয় কোমরে ও পায়ে অসহ্য যন্ত্রণা হচ্ছে। আমরা ব্যাগে করে গরম জলের সেঁক দিলাম কিন্তু তাতে তাঁর যন্ত্রণার উপশম হল না।

হঠাৎ তিনি বললেন, "মহাত্মা গান্ধীকে আমার অবস্থা জানাও। আমি তাঁকে চিঠি লিখতে পারব বলে মনে হচ্ছে না।"

একটু পরেই তিনি আমাকে বল্লেন, "তোমার এখন যাওয়া উচিত। কলকাতায় গিয়েই শরৎ বসু ও সুরাবর্দির সঙ্গে অবশ্যই দেখা করবে।" তারপর বাসন্তী দেবীর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, আমার জন্য রান্না তৈরী হয়েছে কিনা।

দার্জিলিং ছাড়ার ইচ্ছে আমার ছিলনা। কিন্তু আমি জানতাম নিউ মার্কেটে পীরকে কবর দেওয়ার বিষয়ে তিনি হয়তো উদ্বিগ্ন ছিলেন। তাই কলকাতা অভিমুখে রওনা হওয়া ছাড়া আমার আর কোন উপায় ছিল না। আমি যখন বেরোবার জন্য তৈরী হচ্ছি দেশবন্ধু জিজ্ঞাসা করলেন, "কলকাতার পথে কি একবার পাবনা হয়ে যেতে পারবে?" আমি জবাব দেবার আগেই তিনি নিজেই বল্লেন, "না তোমাকে সোজা কলকাতাই যেতে হবে।" আমার মনে হয়, তাঁর ছেলের সঙ্গে দেখা করবার জন্যে তিনি আমাকে পাবনা যেতে বলেছিলেন কিন্তু তিনি সর্বদাই দেশের কাজকে ব্যক্তিগত বিষয়ের ওপরে প্রাধান্য দিতেন। অত্যন্ত অনিচ্ছা ও দুঃখের সঙ্গে আমি দেশবন্ধুর কাছে বিদায় নিয়ে ১৫ই জুন সকাল ৯টায় দার্জিলিং ত্যাগ করলাম।

আমি তখন উপলব্ধি করতে পারিনি যে তাঁর সঙ্গে আমার আর কখনও দেখা হবে না। প্রত্যেক সপ্তাহে তাঁর জ্বর হতো তাই

অন্যান্যদের মত আমিও মনে করেছিলাম সোমবারে জ্বর সেরে যাবে। প্রকৃতপক্ষে, কেউ বুঝতে পারেনি যে তাঁর অবস্থা এত সাংঘাতিক। আমি যখন দেশবন্ধুর কাছে বিদায় নিচ্ছিলাম তিনি বল্লেন, "কলকাতায় পৌঁছেই তার করো।"

পরে আমি শুনেছিলাম যে বিকেলে তাঁর বাঁ পা ফোলে, শীঘ্রই ডান পা-টিও ফুলতে থাকে এবং জ্বর ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে। গোড়ালির ওপর দিকে অসহ্য যন্ত্রণা এবং চিকিৎসকেরা মনে করেন যে দেশবন্ধুর ফাইলেরিয়া হয়েছে। কিন্তু রক্ত পরীক্ষা করে ঐ রোগের কোন প্রমাণ পাওয়া গেল না। রাত ৯টার পর জ্বর ক্রমেই কমতে লাগলো। কিন্তু তিনি ঘুমাতে পারেন নি। এবং ধীরে ধীরে শরীর অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়ে। ১৬ই জুন মঙ্গলবার জ্বর স্বাভাবিক ডিগ্রীর নীচে নেমে যায় এবং আরও নামতে থাকে। হোমিওপ্যাথ চিকিৎসক ডাঃ রায় শ্রীমতী দাশকে কোন এলোপ্যাথিক ডাক্তার ডাকার পরামর্শ দেন।

দেশবন্ধু তা শুনে চিকিৎসক বদলাতে রাজী হন না।

একটু পরে দেশবন্ধুকে অক্সিজেন দেওয়া হয়। কিন্তু তাতেও কোন ফল হল না। বেলা ১টার সময় দেশবন্ধুর অবস্থা আরও খারাপ হতে আরম্ভ করে। চোখের জ্যোতি মিলিয়ে যায় এবং নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছিল। ধীরে ধীরে তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়েন।

কলকাতায় দেশবন্ধুর জামাতাকে তার করা হয় তৎক্ষণাৎ কোন চিকিৎসককে নিয়ে যাবার জন্য। ডাঃ রায় বিকাল ৪টে পর্য্যন্ত রোগীর কাছে ছিলেন। তারপরে তিনি চলে যান। দেশবন্ধু আর পূর্ণ জ্ঞান ফিরে পান নি। পৌনে পাঁচটার সময় তিনি ঠাকুরের নাম উচ্চারণ করতে করতে দেহত্যাগ করেন।

সারা দার্জিলিং-এ খবর ছড়িয়ে পড়লো। বন্ধুবান্ধব, আত্মীয় স্বজন সকল সম্প্রদায়ের পুরুষ নারী শিশু এই মহান নেতাকে সম্মান জানাবার জন্য ছুটে এলেন। দূর দূরান্ত থেকে জনস্রোত অবিরাম আসতে লাগলো। বহু পাহাড়ী লোক পনের মাইল হেঁটে শেষ দর্শন পেতে এসেছিল। অন্ধকার রাত, পাইনের বনে ঝড়ের মাতামাতি, বাইরের অন্ধকার ঘরেও নেমেছে। বাসন্তী দেবী তাঁর স্বামীর মৃতদেহের পাশে শেষ রাত পর্য্যন্ত বসেছিলেন।

স্যার জগদীশচন্দ্র বসু বল্লেন, শেষকৃত্যের জন্য শব কলকাতায় নিয়ে যাওয়া হবে। ইতিমধ্যে ডাঃ যতীন্দ্রমোহন দাসগুপ্ত ও সুরেন্দ্রনাথ হালদার কলকাতা থেকে দার্জিলিং-এ পৌঁছেছিলেন।

বঙ্গ সরকার কলকাতা অভিমুখে এই অন্তিম যাত্রার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করতে রেলকর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দেন। দার্জিলিং ষ্টেশনে বিরাট জনসমাবেশ হয়েছিল। পরদিন সকালে কলকাতায় শবাধার পৌঁছালে অসংখ্য লোক ষ্টেশনে উপস্থিত থাকে। শিয়ালদহ ষ্টেশন থেকে পাঁচ ছ' মাইল শুধু জন সমুদ্র। দার্জিলিং থেকে শিয়ালদহ পর্য্যন্ত রাস্তায় প্রত্যেক ষ্টেশনে হাজার হাজার লোক এসে পরলোকগত নেতার উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাঞ্জলি জানান।

দেশবন্ধুর শব এসে যখন কলকাতায় পৌঁছায় মহাত্মা গান্ধী তখন কলকাতায় ছিলেন। তিনিও খাটে কাঁধ দিয়েছিলেন কিন্তু ভিড়ের চাপ এতো বেশী ছিল যে তিনি উল্টে পড়ে যান। স্বেচ্ছাসেবকরা তাঁকে কাঁধের ওপর তুলে না নিলে তিনি জনতার পদদলিত হতেন। শুধু রাস্তা নয় প্রত্যেক ছাদে, জানলায়, দরজায় শোকার্ত নর-নারীর ভিড়। দোকানপাট সব বন্ধ। গাড়ী চলাচল বন্ধ, সমস্ত কলকাতা শোকমগ্ন, নিস্তব্ধ! সারা দেশে শোকের ছায়া। দেশবন্ধু সকলের কাছে কতখানি শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন তার প্রমাণ

পাওয়া গেল যখন হাজারে হাজারে ইউরোপীয় এসে তাঁর আত্মার উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করলো।

এই শোকমিছিল এক বিরাট অজগরের মত দুঃখের ভারে পাকে পাকে এগিয়ে চললো। প্রায় পাঁচলক্ষ লোক শবানুগমন করে। ষ্টেশন থেকে কেওড়াতলা শ্মশানে পৌঁছাতে ঠিক আট ঘণ্টা সময় লাগে।

প্রায় সন্ধ্যার সময় চিতা প্রজ্জ্বলিত হয়। মহাত্মা গান্ধী নীরবে করুণ নয়নে তাকিয়ে রইলেন আর দেশবন্ধুর মরদেহ ধীরে ধীরে ভস্মে পরিণত হলো।

একটি শোকসভা অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে একমাত্র বক্তা ছিলেন মহাত্মা গান্ধী। অতিকষ্টে ভাবাবেগ সম্বরণ করে—একবার তিনি ভেঙ্গে পড়েন—মহাত্মা গান্ধী বলেন, "দেশবন্ধু মহত্তম ব্যক্তিদের অন্যতম ছিলেন। গত ছ'বছর ধরে তাঁকে ঘনিষ্ঠভাবে জানার সুযোগ আমার হয়েছিল। কয়দিন আগে দার্জিলিং-এ তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আমার এক বন্ধুকে বলেছিলাম, দেশবন্ধুর যত অন্তরঙ্গ হচ্ছি ততই তাঁকে ভালবাসছি। যে কদিন আমি দার্জিলিং-এ ছিলাম আমি দেখেছিলাম ভারতের কল্যাণ চিন্তা ছাড়া আর কোন চিন্তার স্থান দেশবন্ধুর মনে ছিল না। স্বপ্নে, চিন্তায় ও কাজে একমাত্র বিষয় ছিল ভারতের স্বাধীনতা, অন্য কিছু নয়। আমি আপনাদের জানাচ্ছি, দার্জিলিং-এ তাঁর সঙ্গে আমার কাটাবার শেষ মুহূর্ত পর্য্যন্ত দেশবন্ধু আমাকে অনুরোধ করেছিলেন বাংলাদেশে আমি যেন আরও বেশী দিন থেকে সর্ব দলের মধ্যে ঐক্য স্থাপনের চেষ্টা করি যাতে সমস্ত শক্তি সংহত করে এক উদ্দেশ্যে লাগান যায়। তিনি ছিলেন নির্ভীক, ছিলেন সাহসী। বাংলাদেশের তরুণদের প্রতি দেশবন্ধুর ভালবাসা ছিল অসীম। তাঁর শত্রুপক্ষীয়েরা স্বীকার করেন যে, বাংলাদেশে

তাঁর শূন্য স্থান পূর্ণ করার মত আর কেউ নেই। তাঁর অন্তরে হিন্দু মুসলমানের মধ্যে কোন ভেদ বোধের স্থান ছিল না। আমি ইংরেজদের জানাচ্ছি, তাঁদের প্রতিও দেশবন্ধু কোনো বিরূপ মনোভাব পোষণ করেন নি।

"দেশবন্ধুর মরদেহ বিনষ্ট হয়েছে কিন্তু তাঁর আত্মা অবিনশ্বর। শুধু আত্মা নয় তাঁর অসীম সেবা ও স্বার্থত্যাগের জন্য তাঁর নামও অমর হয়ে থাকবে। তাঁর সেবা ও স্বার্থত্যাগের তুলনা নেই। তাঁর স্মৃতি যেন আমাদের অন্তরে চির জাগরুক থাকে, তাঁর দৃষ্টান্ত যেন আমাদের মহান প্রয়াসে চিরদিন প্রেরণা যোগায়। যে কেউ তাঁর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করবেন—তা সে যত ক্ষুদ্র হারেই হোক না কেন—তিনিই তাঁর স্মৃতি জাগিয়ে রাখতে সাহায্য করবেন। তাঁর আত্মা শান্তি লাভ করুক।"

দেশবন্ধু কবি রবার্ট ব্রাউনিঙ-এর গভীর অনুরাগী ছিলেন। তিনি প্রায়ই নীচের কয় পংক্তি আবৃত্তি করতেন—

One who never turned his back, but
marched breast forward,
Never doubted clouds would break ;
Never dreamed though right were worsted,
wrong would triumph ;
Held we fall to rise, are baffled to fight better,
Sleep to wake.

(যে কখনও পৃষ্ঠভঙ্গ দেয়নি বরং বুক ফুলিয়ে এগিয়ে গিয়েছে, আকাশ ভেঙ্গে পড়বে এমন শঙ্কা যার মনে কখনও দেখা দেয়নি। স্বপ্নেও যিনি কোনদিন ভাবেন নি যে ন্যায় পরাজিত হলেও অন্যায় চিরজয়ী হবে। যিনি বলতেন, আমরা পড়ি ওঠার জন্য, ব্যর্থ হই আরও ভালভাবে সংগ্রামের জন্য, ঘুমাই জাগার জন্য।)

এই হল দেশবন্ধুর স্মৃতিস্তম্ভে উৎকীর্ণ করার শ্রেষ্ঠতম লিপি।

পরিশিষ্ট—১

[২৩শে এপ্রিল, ১৯১৭ তারিখে ভবানীপুরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনে সভাপতির ভাষণ থেকে উদ্ধৃতি]

…এই অন্ধকার ও অবসাদময়যুগে ভারতে ইংরেজ বণিকের আগমন। ধ্বংসস্তূপের ওপর সে গড়ে তুলল তার সাম্রাজ্য। দ্রুত ক্ষমতা বিস্তার দ্বারা সে তার অদ্ভুত কর্মক্ষমতা ও জীবনীশক্তির প্রমাণ দিল। দুর্বলদের প্রতি যা ঘটে আমাদের বেলাতেও তাই হল। আমরা ইংরেজ সরকারকে গ্রহণ করলাম, সেই সঙ্গে ইংরেজ জাতি, তাদের কৃষ্টি, সভ্যতা, বিলাসিতা এবং তাদের স্বেচ্ছাচারিতা সবই মেনে নিলাম। যেমন করে রাতের পথিক সহজ পরিচিত পথ হারিয়ে ঘোরালো পথে দূরে গিয়ে পড়ে তেমনি আমাদের দুর্ভাগ্যে অন্ধ হয়ে আমাদের দেশের প্রাচীন পরিচিতিগুলি—তার ইতিহাস, তার কৃষ্টি, বিধান, দর্শন—থেকে অনেক দূরে সরে গিয়ে ইংরেজদের সাহিত্য, বিজ্ঞান ও দর্শন উদ্দাম আগ্রহে অনুসরণ করতে লাগলাম। বিদেশী জিনিষের প্রতি এই মোহের প্রগাঢ়তা হয়ত হ্রাস পেয়েছে, কিন্তু তা একেবারে লোপ পেয়েছে এমন দাবী আমরা করতে পারি না।

আমাদের জাতীয় জীবনের দ্বারদেশে রামমোহন বিজ্ঞানের যে তূর্য্যনাদ করেছিলেন তা আমরা শুনেছিলাম বা মনে করেছিলাম শুনেছি বলে। যাহোক আমরা তার ফর্মুলাগুলির পুনারাবৃত্তি করতে শুরু করলাম। প্রগাঢ় শাস্ত্র চর্চার—যাতে রামমোহন স্বয়ং ডুবে থাকতেন—দিকে আমরা কেউ নজর দিইনি। এ তথ্য সম্পূর্ণ আমাদের চোখ এড়িয়ে গেল যে, রামমোহন আমাদের জাতীয় কৃষ্টি ও

সভ্যতার মধ্যেই আমাদের মুক্তির পথ বের করার চেষ্টা করেছিলেন। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে স্কুল কলেজ প্রতিষ্ঠিত হতে লাগল। পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রতি আমাদের প্রবণতা আরও স্পষ্ট হয়ে উঠল। তারপর বহু বছর পরে এলেন বঙ্কিমচন্দ্র, মাতৃভূমিতে মায়ের রূপ প্রতিষ্ঠা করলেন তিনি। সেই মূর্তিতে প্রাণসঞ্চার করলেন তিনি। তিনিই প্রথম মাকে দেখলেন, মাকে চিনতে পারলেন। তিনি জনসাধারণকে ডেকে বললেন, "দেখ, এই আমাদের মা, এঁকে পূজা কর, স্বগৃহে প্রতিষ্ঠা করো।" যে গান তিনি গাইলেন তা এই মায়েরই গান—"সুজলাং সুফলাং মলয়জ শীতলাং শস্যশ্যামলাম্"। কিন্তু আমরা বধির হয়ে তাঁর গান শুনলাম না, অন্ধ হয়ে তাঁর দেখা মাতৃভূমি দেখলাম না। তাই বঙ্কিম বিলাপ করে বললেন, "আমি অরণ্যে রোদন করছি।"

* * * *

আরও সময় কাটল। ১৯০৫ সালে স্বদেশীবাদের তূর্য্যধ্বনি শোনা গেল। বাংলার জনগণ নিজেদের বুঝতে ও উপলব্ধি করতে শুরু করলেন। রবীন্দ্রনাথ গাইলেন, "বাংলার মাটি, বাংলার জল—সত্য হউক সত্য হউক সত্য হউক হে ভগবান।" আর কবির গানে যেন সাড়া দিয়ে বাংলার মাটি ও জল নিজেদের অস্তিত্ব প্রমাণ করতে আরম্ভ করল।

আমাদের মধ্যে অনেক জ্ঞানী, গম্ভীর ও মাননীয় প্রভু আছেন যাঁরা মনে করেন—'আমি অন্তত তাই শুনেছি'—যে, স্বদেশী আন্দোলন করা প্রচণ্ড ভুল হয়েছে। পাশ্চাত্য শিক্ষা আমাদের মধ্যে একটা আত্মহান কৃষ্টি সৃষ্টি করেছে। এ কৃষ্টি চিরকালের জন্য শক্তিহীন কিন্তু অনেক কিছু লাভের প্রত্যাশী। যাঁরা এই সংস্কৃতির গর্ব করেন তাঁরা সব কিছু ফুটরুল ও দাড়িপাল্লায় মাপতে চান। তাঁরা অঙ্কে পণ্ডিত, সমস্ত প্রশ্ন তাঁরা গাণিতিক

প্রশ্নে দাঁড় করান। কিন্তু জীবনবন্যা গণিতকে অস্বীকার করে চলে, ফুটরুল দাঁড়িপাল্লা সব ভাসিয়ে নিয়ে যায় তা। স্বদেশী আন্দোলন এল ঝড়ের মত, প্রবল বন্যার মত তা প্রচণ্ড বেগে আছড়ে পড়ল। আত্মা যখন জাগে, কোনরকম হিসেব না করেই তা জাগে। মানুষ যখন জন্মায়, কোন হিসেব লাগে না সেজন্য। মানুষ জন্মগ্রহণ করে কারণ এছাড়া তার আর কোন উপায় নেই। আত্মা চেতনার মধ্যে প্রবেশ করে কারণ তাকে তা করতেই হবে। সেই প্রবল জীবনবন্যা—যাকে আমরা স্বদেশী আন্দোলন নামে অভিহিত করি—আমাদের ডুবিয়ে দিল, বাংলাদেশের প্রাণবন্ত আত্মার সংস্পর্শে আর একবার আসতে আমাদের সাহায্য করল। তার সঞ্জীবনী প্রভাবে আমরা বাংলাদেশের কৃষ্টি ও সভ্যতার তটিনীতে—যা বাংলাদেশের অন্তরে বহুকাল ধরে প্রভাবিত—অবগাহন করলাম। আমাদের জাতীয় ইতিহাসের ধারার প্রকৃত পরিচয় আমরা আবার পেলাম। বৌদ্ধ, শৈব, শাক্ত ও বৈষ্ণবধর্মের আত্মা সম্যক উপলব্ধি করতে সাহায্য করল স্বদেশী আন্দোলন; চণ্ডীদাস আর বিদ্যাপতির গান মনে করিয়ে দিল; চৈতন্যের মহান জীবনের দীপ্ত গৌরব পূর্ণ উপলব্ধি করতে পারলাম। জ্ঞানদাস, গোবিন্দ দাস, লোচন দাস ও প্রাচীন কবিবরদের সুর আমাদের অন্তরে আবার অনুরণিত হতে লাগল; রামপ্রসাদের ভক্তি সঙ্গীত আবার আমাদের মুগ্ধ করল; আমরা রামমোহনের গভীর শৃঙ্খলাবোধের তাৎপর্য্য উপলব্ধি করলাম; বঙ্কিম পূজিত মূর্তি আমরা চিনলাম, যাঁর সম্বন্ধে বঙ্কিম গেয়েছেন, "তুমি কৃষ্টি, তুমি ধর্ম, তুমি হৃদি তুমি মর্ম ত্বং হি প্রাণা শরীরে। বাহুতে তুমি মা শক্তি, হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি, তোমারই প্রতিমা গড়ি মন্দিরে মন্দিরে।" বঙ্কিমের গান আমাদের কানের ভেতর দিয়ে প্রবেশ করে অন্তর স্পর্শ করল, আকুল করে তুলল আমাদের মন। আবার আমরা বুঝতে পারলাম রামকৃষ্ণ কি খুঁজছিলেন, কি

পেলেন ; বুঝতে পারলাম কেমন করে কেশবচন্দ্র যুক্তির বাইরের জগৎ ছেড়ে অন্তরের অন্তর্জগতে প্রবেশ করলেন ; বিবেকানন্দের ভাষণে আমাদের আত্মা তৃপ্ত হল। আমরা বুঝলাম, বাঙ্গালী হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান যাই হোক না কেন, সে বাঙ্গালীই থাকে। তার জাতি আলাদা, চরিত্র আলাদা, তার বিধি আলাদা। মানুষের এই জগতে বাঙ্গালীদের একটা নিজস্ব স্থান আছে— আছে দাবী, কৃষ্টি ও কর্তব্য। আমরা উপলব্ধি করলাম, বাঙ্গালী যদি আত্ম উপলব্ধি করতে চায় তাহলে তাকে খাঁটি বাঙ্গালী হতে হবে। ভগবানের অনন্ত সৃষ্টির আশ্চর্য্য বৈচিত্র্যের মধ্যে বাঙ্গালী একটা নির্দিষ্ট জাতির প্রতিনিধি, বাংলাদেশ সেই জাতির মূর্ত রূপ ; না তার থেকেও বেশী, বাংলাদেশ হল সেই জাতির জীবন ও আত্মা। আমাদের আত্মার চেতনাপ্রত্যুষে মা দীপ্ত গৌরবে তাঁর অসীম ভুবনমোহিনী রূপ প্রকাশ করলেন। আমাদের হৃদয় এই সৌন্দর্য্যে আপ্লুত হল। আমরা দেখলাম, মা এক, আবার বহু, একরূপিণী, আবার বিশ্বময়ী। অন্যেরা এই সৌন্দর্য্য নিয়ে আলোচনা ও তর্ক করতে পারেন, কিন্তু এই রূপমাধুরীতে মুগ্ধ হয়ে মরতে পারার জন্য খুশী।

স্বদেশী আন্দোলন এসেছিল কোনরকম হিসেব না করে। গেল বিনা হিসেবে ; কিন্তু এখন হিসেব নিকেশের সময় এসেছে। মা যে এসেছেন তা তিনি জানিয়েছেন ; এখন তাঁকে পূজো আমাদের করতেই হবে। আর সেই পূজার জন্য আমাদের অনেক হিসেব নিকেশ করতে হবে। ফর্দ তৈরী ও উপকরণ সংগ্রহ করতে হবে। দেশের ওপর দিয়ে একটা প্রবল বন্যা বয়ে গেছে। কিন্তু এখন জমি চাষ করতে হবে, তার গর্ভের সোনালী ফসলকে জন্ম দিতে হবে। দৃঢ় বিশ্বাস রাখুন, এ সোনা আসতে বাধ্য।

তাই আমাদের সামনে রয়েছে মূল সমস্যা—বঙ্গদেশের নব

জাগরিত জাতীয় জীবনকে কেমন করে পূর্ণ ও পর্য্যাপ্তভাবে বিকশিত করা যায়।

* * * *

প্রত্যেক জাতির মধ্যে প্রকৃত মৈত্রী ও ভ্রাতৃত্ব জাগাতে হলে জাতির সুপ্ত সত্তাকে সর্বাগ্রে বিকশিত করা দরকার। ব্যষ্টির সঙ্গে সঙ্গে উন্নয়ন না হলে যেমন পরিবারের উন্নতি হতে পারে না, যেমন পরিবারের উন্নতি না হলে সমাজের উন্নতি সম্ভব নয়, যেমন প্রত্যেক সম্প্রদায়ের উন্নতি না হলে দেশ এগোতে পারে না, তেমনি প্রত্যেক জাতির তার নিজস্ব চারিত্রিক ও সভ্যতার বিকাশ না ঘটলে সমগ্র মানব সমাজের পক্ষে অগ্রগতি লাভ কখনই সম্ভব নয়। আমাদের শিরায় আর্য্য বা অনার্য্য যে রক্তই প্রবাহিত হোক না কেন, বাঙ্গালী প্রাচীন যুগের সত্যকামের মত সত্য কখনই গোপন করবে না। বাঙ্গালী কখনই ভুলবে না, তার একমাত্র পরিচয় বাঙ্গালী বলে, ভুলবে না বাংলার মাটিকে, বাংলার জলহাওয়ায় সে বড় হয়েছে, বাংলার মাটি জলহাওয়ার সঙ্গেই তার দৈনন্দিন সংযোগ। এই বাহ্যিক সংযোগের অন্তস্থলে রয়েছে একটা সত্য, স্থায়ী ও মৌলিক সম্পর্ক আর বাঙ্গালীর জাতীয়তা সেই সত্য, স্থায়ী ও মৌলিক সম্পর্কের ওপর প্রতিষ্ঠিত। অন্যান্য দেশের সঙ্গে আমাদের যে বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্ক স্থাপিত হতে পারে তাতেও আমাদের এই নির্দিষ্ট জাতীয়তা আরও সমৃদ্ধ ও বিকশিত হয়ে উঠবে। কারণ দেওয়া আর নেওয়াই হল জাতীয়তার গুণ। বিভিন্ন জাতির মধ্যে অপরিহার্য্য সংঘর্ষ—যা নিয়ে কিছু লোক খুব হৈ চৈ করে—সম্পর্কে বলা যেতে পারে যে, জাতিতত্ব কিছুটা বিরোধ ও সংঘর্ষ ঘটায়। কিন্তু জাতিতে জাতিতে যুদ্ধ হচ্ছে বলে আমরা কি জাতীয়তা বিসর্জন দেব? এই যুক্তি অনুসরণ করে আমার প্রশ্ন, ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে কলহ

হচ্ছে বলে ব্যক্তিসত্তা কি আমরা লোপ করে দেব? এ ধরণের তর্ক করা বোকামি। সমস্ত মতভেদ ও বিরোধ সত্বেও মানুষ তার মানবিকতার বিকাশ করবেই, মিলনের পথ খুঁজে পাবে। জাতির পক্ষেও সেই কথা। আজকের শত শত যুদ্ধ ও বিরোধের মধ্য দিয়ে বিশ্বের জাতিগুলি কদমে কদমে এগিয়ে যাবে ঈশ্বর নির্দিষ্ট মিলন ও শান্তির মন্দিরের দিকে।

কিন্তু যদিও প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে মিলন ঘটবে না, কোন কৃত্রিম বা আধ্যাত্মিক সংযোগ সম্ভব হবে না তাদের মধ্যে তবু আমি আরও অনেকের সঙ্গে বিশ্বাস করি যে এই দুই সত্তার মধ্যে গভীরতর সংযোগ সাধিত হবে। এখন সেই সংযোগের রূপ কি হবে? এ প্রশ্নটি দুটি দিক থেকে বিচার করা যেতে পারে—জাতীয়তা এবং সরকার ও প্রশাসন ব্যবস্থা। দ্বিতীয় দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে, বাঙ্গালী ও ইংরেজ নিজস্ব জাতীয় চরিত্রের বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে চলবে তবে উচ্চ প্রশাসনিক ব্যবস্থা ও সরকার গঠনের সময় এ দুয়ের মধ্যে পরম মিলন ঘটতে বাধ্য।

* * * *

মোট কথা, আমাদের দেশের প্রকৃত কল্যাণ সাধন করতে হলে আমাদের জাতীয় জীবনে নব জাগরণের দিকে নজর রাখতে হবে; নজর রাখতে হবে জাতীয় ইতিহাসের অবিচ্ছিন্ন ধারার দিকে; আমাদের জাতীয় জীবন ও জাতীয় ইতিহাসের গতির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সেই সব পরিবেশের উন্নয়নের জন্য আমাদের ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে।

* * * *

ইংরেজীয়ানার অনুকরণ আমাদের পাগল করেছে; আমাদের জীবনের প্রত্যেক ক্ষেত্রে, প্রত্যেক প্রয়াসে তার পায়ের কালো ছাপ

দেখতে পাই। মন্দিরের স্থান নিয়েছে সম্মেলন; আর্ত ত্রাণের জন্য আমরা নাটক মঞ্চস্থ করি, বিচিত্রানুষ্ঠান করে পয়সা সংগ্রহ করি। অনাথ আশ্রমের জন্য লটারীর ব্যবস্থা আমরা করি। দেশের জাতীয় ও স্বাস্থ্যকর খেলাধূলা ছেড়ে দিয়ে বিদেশ থেকে আমদানী করা সব ধরণের জিনিষ চালু করেছি। পোষাকে, চিন্তায়, মনোভাবে ও কৃষ্টিতে আমরা সঙ্কর হয়ে পড়েছি এখন রক্তেও সঙ্করতা আমরা প্রাণপণ চেষ্টা করছি। পাশ্চাত্য আদর্শ অনুকরণ করতে গিয়ে আমরা অর্থ একটি উদ্দেশ্য সাধনের উপায় এই শিক্ষা ভুলে অর্থই একমাত্র উদ্দেশ্য বলে যে মনে করব তাতে আর আশ্চর্য্য কি? কিন্তু এখনও আমাদের সাবধান হতে হবে, কান পেতে শুনতে হবে বঙ্কিমের সেই বিজ্ঞ সাবধান বাণী—যে বাণী প্রথম উচ্চারিত হওয়ার পর আদৌ শ্রুত হয় নি।

* * * *

তাহলে আমাদের মন্ত্র হল—মিলিত ও ঐক্যবদ্ধ কাজ। কিন্তু আমাদের পরিকল্পনা কি হবে? আপনারা যদি অনুমতি করেন তাহলে একটি পরিকল্পনার কাঠামো দিতে পারি—যা নিজে থেকে আমার মনে এসেছে। সরকার আমাদের প্রদেশগুলিকে বিভিন্ন জেলায় ভাগ করেছেন—আমাদের কাজের জন্য এই সীমা নির্দেশ মেনে নেওয়াই ভাল হবে। আমাদের প্রথম কাজ হবে, প্রত্যেক জেলায় গ্রামগুলিতে কতগুলি পল্লীগোষ্ঠী বা সংঘ গঠন করা। কোন গ্রাম আয়তনে যথেষ্ঠ বড় ও জনাকীর্ণ হলে সেটিই একটি সংঘ হয়ে দাঁড়াবে। আর ছোট গ্রাম হলে কতগুলি গ্রাম একত্র করে একটি গোষ্ঠী বা সংঘ গড়া হবে। তারপর প্রত্যেক সংঘের অন্তর্ভূক্ত প্রাপ্ত বয়স্ক পুরুষদের সংখ্যা গণনা করতে হবে। তাঁরাই হবেন পল্লীসভার সদস্য এবং তাঁরাই পাঁচজনকে নির্বাচিত করবেন পঞ্চায়েত বা কার্য্যনির্বাহক কমিটির জন্য। পল্লীগোষ্ঠীর প্রশাসনের ভার এই পঞ্চায়েতের থাকবে। পল্লীর পরিষ্কার

পরিচ্ছন্নতা, জল সরবরাহ, নৈশ বিদ্যালয় স্থাপন, শিল্প ও কৃষি শিক্ষা, অর্থাৎ পল্লীগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক উন্নয়নের ভার সম্পূর্ণরূপে পঞ্চায়েতের থাকবে। তাছাড়া, প্রত্যেক গ্রামে জনগণের গোলা থাকবে। প্রত্যেক জোতদারকে নিজের জমির আয়তন অনুপাতে এই গোলায় শস্য দান করতে হবে। খরা ও খাদ্যাভাব ঘটলে এই গোলার থেকে শস্য নিয়ে লোকদের খাওয়াতে হবে। ছোটখাট দেওয়ানি ও ফৌজদারী মামলা নিষ্পত্তি করার অধিকার এই পঞ্চায়েতগুলির থাকবে। কিন্তু বড় মামলার ক্ষেত্রে পঞ্চায়েত জেলার ফৌজদারী ও দেওয়ানি আদালতে মামলাটি পাঠাবে। পঞ্চায়েতের জবানী বাদী বা প্রতিবাদী পক্ষের একমাত্র জবানী বলে গৃহীত হবে।

আমরা আমাদের অধিকার দাবী করছি। শুধু এগিয়ে আসুন ও একযোগে সাড়া দিন। আমরা এই অধিকার দাবী করছি, আমি জানি ঐক্যবদ্ধ জাতির ঐক্যবদ্ধ দাবী কোন সার্বভৌম শক্তিই ঠেকিয়ে রাখতে পারে না। শুধু এগিয়ে আসুন ও সমবেতভাবে আপনার দাবীর পুনরাবৃত্তি করুন।

পরিশিষ্ট—২

স্বাধীনতার অর্থ

[আমেদাবাদে কংগ্রেস অধিবেশনের সভাপতির ভাষণ থেকে উদ্ধৃতি]

…আমি এমন একটা শহর থেকে আসছি যাকে সরকারের ক্রোধের পূর্ণ দাপট সহ্য করতে হয়েছে। আমার মনে হয় ইংলণ্ডের যুবরাজকে স্বাগতম জানাতে জনগণকে বাধ্য করার জন্যই রাজনৈতিক জীবনের কণ্ঠরোধের ব্যবস্থা করা হয়েছে। কিন্তু ২৪শে সেপ্টেম্বর কলকাতার অবরুদ্ধ আত্মা যুবরাজকে অভ্যর্থনা জানাবে। কলকাতায় যে নির্মল ও পবিত্রতর আন্দোলন সবে শুরু হয়েছে আমি সেখান থেকে এসেছি। এ বিষয়ে জাগতিক জ্ঞান আমি যদি দিতে নাও পারি আমি অন্তত আপনাদের কাছে এই আন্দোলন সফল করার অসীম উদ্দীপনা ও দৃঢ় সঙ্কল্পের কথা বলতে পারি।

*   *   *   *

প্রথমত, স্বাধীনতার অর্থ সকল প্রকার নিষেধের অনুপস্থিতি নয়।…দ্বিতীয়ত, স্বাধীনতা বলতে যে সর্বক্ষেত্রে নির্ভরতার অবসান বোঝায়, তাও নয়।…যদিও স্বাধীনতা ও নিষেধ এবং স্বাধীনতা ও নির্ভরতার মধ্যে আপাত বিরোধিতা না থাকলেও যে নিষেধে স্বাধীনতা অস্বীকৃত হয় না তার অস্তিত্বের পেছনে জনগণের সমর্থন অবশ্যই থাকা দরকার। আর স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গতি সেই নির্ভরশীলতা রাখতে পারে যা জনগণ স্বেচ্ছায় করে আত্মরক্ষার জন্য।

তাহলে স্বাধীনতা কি? স্বাধীনতার সংজ্ঞা নির্দেশ করা অসম্ভব। কিন্তু তা ব্যাখ্যা করা যায় এভাবে—স্বাধীনতা হল এমন এক অবস্থা, এমন এক পরিবেশ যাতে কোন জাতির পক্ষে নিজ সত্তা উপলব্ধি ও নিজ ভাগ্য বিধান সম্ভব। বিভিন্ন জাতি তাদের জাতীয়ত্ব ও স্বতন্ত্র সত্তা অলঙ্ঘিত ও অকলুষিত রাখার উদ্দেশ্যে স্বাধীনতার জন্য আন্দোলন করেছিল তারই উত্তেজক কাহিনীতে মানব ইতিহাস পূর্ণ। আধুনিক কালের উদাহরণস্বরূপ ফিনল্যাণ্ড, পোল্যাণ্ড আয়ার্ল্যাণ্ড, মিশর ও ভারতের উল্লেখ করা যেতে পারে। এরা প্রত্যেকেই বিদেশী সংস্কৃতি চাপিয়ে দেওয়ার বিরুদ্ধে দৃঢ়তার সঙ্গে সংগ্রাম করেছে।

* * * *

তাই আমাদের দাবী হল স্বাধীনতা। কারণ আমরা পাশ্চাত্য সভ্যতার শিক্ষনীয় বিষয় দেখে সঙ্কোচবোধ না করে এবং পশ্চিম আমাদের ওপর যে সব প্রতিষ্ঠান চাপিয়ে দিয়েছে তাতে ব্যাহত না হয়ে আমাদের স্বতন্ত্র সত্তার বিকাশ ও আমাদের মনোমত ভবিষ্যৎ গড়ার দাবী করছি। কিন্তু এখানে একটি কণ্ঠস্বর আমাকে বাধা দিচ্ছে। সে কণ্ঠস্বর ভারতের কবি রবীন্দ্রনাথের। তিনি বলেন, "পাশ্চাত্য সংস্কৃতি আমাদের দ্বারদেশে। আমরা কি তাকে সেখান থেকে ফিরিয়ে দেব? আমরা কি স্বীকার করব না যে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সংস্কৃতির মিলনেই বিশ্বের মুক্তি?" আমি স্বীকার করছি ভারতীয় জাতীয়তাবাদকে বাঁচতে হলে অন্যান্য জাতি থেকে তাকে বিচ্ছিন্ন থাকলে চলবে না। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সমালোচনার উত্তরে আমি দুটি মন্তব্য করতে চাই। প্রথমত, কোন অতিথিকে বরণ করার আগে আমাদের একটা নিজস্ব গৃহ থাকা দরকার। দ্বিতীয়ত, পাশ্চাত্য কৃষ্টি নিজের মধ্যে গ্রহণে প্রস্তুত হওয়ার আগে ভারতীয় কৃষ্টিকে অবশ্যই নিজেকে আবিষ্কার করতে হবে। আমার মতে স্বাধীন হওয়ার আগে প্রকৃত সংমিশ্রণ কিছুতেই ঘটতে পারে না,

যদিও দাস সুলভ অনুকরণ ঘটতে পারে এবং তা ঘটেছেও। ভারতের সাংস্কৃতিক বিজয় প্রায় সম্পূর্ণ হতে চলেছে; তার রাজনৈতিক বিজয়ের তা অনিবার্য্য ফল। ভারতের অবশ্যই তা প্রতিরোধ করতে হবে। জাতীয় জীবনের স্পন্দন ঘটা চাই। তারপর আমরা দুই সভ্যতার মিলনের কথা বলতে পারি।

আর একটা আপত্তি খণ্ডন করতে হবে। এ আপত্তি এসেছে আমার নরমপন্থী বন্ধুদের কাছ থেকে। তাঁদের বলতে শুনি, "তুমি ত মেনে নিচ্ছ যে স্বাধীনতা একটা উদ্দেশ্য নয় বরং উদ্দেশ্য সাধনের উপায়মাত্র। উদ্দেশ্য যখন নিয়ন্ত্রণ তখন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে তোমার ভাগ্য গড়ার কাজ করতে চাও না কেন?" আমার জবাব হল, ভারত যতদিন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ছত্রতলে থাকবে ততদিন একাজ শুরু করা যেতে পারে না। ভারতের হৃদয় গ্রামে গিয়ে দেখুন, ভারতীয়েরা গড়ে কিভাবে জীবন ধারণ করে। ওরা বলিষ্ঠ ও নির্ভীক, ওদের সম্বন্ধে যে কোন দেশ গর্ববোধ করতে পারে। কিন্তু পরাধীনতার অনিবার্য্য ফলস্বরূপ অবনতির চিহ্ন তাদের মুখে চোখে স্পষ্ট ফুটে উঠেছে; তাদের ললাটলিপি হল বর্ণ সমস্যা, তুচ্ছ বিষয়ে কলহ এবং মামলা করার জন্যই মামলা চালিয়ে যাওয়ার অসীম আগ্রহ। তাহলে সেইসব প্রতিষ্ঠান এখন কোথায় যেগুলি ওদের স্বনির্ভর ও স্বয়ংসম্পূর্ণ করেছিল? কোথায় সেই জীবন যা তাদের জীবিকা নির্বাহে এবং সেই সঙ্গে পূর্ব পুরুষের ধর্মবিশ্বাস অক্ষুণ্ণ রাখতে সাহায্য করেছিল?

আমার মনে হয় প্রকাশ্য কংগ্রেসে আমাদের গাম্ভীর্য্যের সঙ্গে ঘোষণা করা উচিত যে, স্বাধীনতা প্রত্যেক জাতির সহজাত, এবং ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট যে সিদ্ধান্তই করুক না কেন তাতে বিচলিত না হয়ে নিজের সত্তার বিকাশ সাধন এবং ভাগ্য গড়ার অধিকার ভারতের আছে। আমি মনে করি, যে কোন শক্তি ভারতীয় জাতির আত্মোপলব্ধি ও আত্মচরিতার্থতায় কোনভাবে বাধা দেবে বা বিঘ্নিত

করবে তাকেই ভারতের শত্রু বলে আমরা জানব এবং অবশ্যই তাকে বাধা দেব। আমি ইংলণ্ডের সঙ্গে সহযোগিতা করতে রাজী আছি কিন্তু একটিমাত্র শর্তে, ভারতের এই সহজাত অধিকার তাকে মেনে নিতে হবে। এ স্বীকৃতি আপনারা ভারত শাসন আইনের কোথাও দেখতে পাবেন না। ভারতে ব্রিটিশ প্রভুত্ব টিকিয়ে রাখতে আমি অন্তত সাহায্য করব না। কিন্তু আমার নরমপন্থী বন্ধুরা বলছেন, যদিও ভারতীয় জনগণের স্বাধীনতা—যে অর্থে আমি শব্দটি বুঝি—পার্লামেণ্টের আইনে স্বীকৃত হয়নি, আমরা যদি সংস্কার ব্যবস্থা কার্য্যকরী করি তাহলে আমাদের স্বাধীনতা দিতে অস্বীকার করার ক্ষমতা পার্লামেণ্টের হবে না। আমি আমার বন্ধুদের বিজ্ঞতা সম্বন্ধে সন্দেহ বা তাদের দেশপ্রেম অস্বীকার করছি না তবে আমার মতে এ প্রশ্নটি সম্পূর্ণ অবান্তর। আমার বক্তব্য হল, বিশদ বিবরণ সম্পর্কে ইংরেজ সরকারের সঙ্গে মিটমাট করতে আমি যত উদগ্রীবই হই না কেন—এবং মহান স্বার্থত্যাগে যতই প্রস্তুত থাকি না কেন—আমার কাছে যা মৌলিক প্রশ্ন বলে মনে হয়েছে তা নিয়ে কোন মিটমাট আমি করব না। স্বাধীনতা আমার জন্মগত অধিকার এবং আমার দাবী হল সেই অধিকার কিস্তিতে বা টুকরো টুকরো করে স্বীকার করলে চলবে না, তাকে স্বীকার করতে হবে সামগ্রিক ও পূরোপূরি ভাবে। জয়লাভ যে আমাদের হবে তা আমি সন্দেহ করি না কিন্তু মনে করুন আমরা যদি ব্যর্থ হই তাহলে আমাদের অন্তত জাতীয় আত্মসম্মান ও মর্য্যাদা অলঙ্ঘিত রাখতে হবে। যে অসম্মানের ওপর ভারত শাসন আইন প্রতিষ্ঠিত আমরা অন্তত তা দূর করতে পারতাম। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস ও মন্ত্রিগণের—যাঁরা শাসন সংস্কার আইনটিকে বাস্তবে রূপায়িত করেছেন—মধ্যে যে পার্থক্য তা হল মৌলিক। কংগ্রেসের দৃষ্টি চূড়ান্ত বিষয়ের দিকে নিবদ্ধ, যাতে ভারতীয় জনগণের স্বাধীনতা স্বীকৃত নয় এমন সব কিছুকে একদম মিথ্যা বলে সে বর্জন করবে। অন্যদিকে মন্ত্রিগণের নজর তাঁদের ভারপ্রাপ্ত বিভাগের দিকে; তাঁরা আশা করেন, এইসব

দপ্তর ভালভাবে চালাতে পারলেই স্বাধীনতা পাওয়া যাবে।

*　　*　　*　　*

এই তাহলে হল সেই পরিকল্পনা—যা মন্ত্রিগণ কার্য্যকরী করেছেন। আর নরমপন্থীরা আমাদের গম্ভীরভাবে আশ্বস্ত করেছেন যে স্বরাজের অপ্রয়োজনীয় সংঘর্ষের অবসান ঘটাতে অত্যন্ত ইচ্ছুক হলেও আমি সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করার ভিত্তিস্বরূপ এই আইন গ্রহণের সুপারিশ আপনাদের করতে পারি না। আমি অসম্মান দিয়ে শান্তি কিনতে চাই না। যতদিন ভারত শাসন আইনের প্রস্তাবনা বজায় থাকবে আর আমাদের নিজস্ব কাজকর্ম নিয়ন্ত্রণ, নিজস্ব সত্তার বিকাশ ও নিজেদের ভাগ্য বিধানের আমাদের অধিকার, আমাদের সহজাত অধিকার স্বীকৃত হবে না ততদিন আমি শান্তির কোন শর্ত বিবেচনা করব না।

যুদ্ধের একটিমাত্র পদ্ধতি আমাদের সামনে রয়েছে, তা হল অসহযোগ ; এবং এই কার্য্যসূচীই আমরা কংগ্রেসের পর পর দু অধিবেশনে গ্রহণ করেছি। আমরা অসহযোগ নীতিতে অনুরাগী, এর নৈতিক দিক নিয়ে আমার আলোচনার প্রয়োজন নেই।

...জাতীয়তাবাদ নীতির এই হল সারবস্তু—যার জন্য লোকে তাদের জীবন দিতে প্রস্তুত হয়েছে। জাতীয়তাবাদের অর্থ অন্যান্য জাতি থেকে স্বতন্ত্র ও বিচ্ছিন্ন এক সত্তার আক্রমণাত্মক ঘোষণা। বরং এ হল বিশ্ব মানবিকতার অঙ্গস্বরূপ আত্ম-চরিতার্থতা, আত্মশাসন ও আত্মোপলব্ধির আকাঙ্ক্ষা। শুধুমাত্র এই আকাঙ্ক্ষা দিয়েই মানুষ নিজেকে পরিপূর্ণ করতে পারে, নিজেকে সংযত করতে পারে, নিজেকে জানতে পারে। তাই শুধু তারা ইংরেজ বলেই ইংরেজের সঙ্গে সহযোগিতা করতে অস্বীকার করা হচ্ছে, অসহযোগিতার প্রকৃত

অর্থ তা নয়। ভারতীয় জাতির নিজস্ব সত্তার বিকাশে যে কোন শক্তি বা প্রতিষ্ঠান বাধা দেবে বা তার আত্মোপলব্ধি বিঘ্নিত করবে তার সঙ্গে সহযোগিতা কখনই করা হবে না, এই হল অসহযোগিতার অর্থ। পশ্চিমের কৃষ্টি বলে পাশ্চাত্য কৃষ্টি বর্জন করা অসহযোগিতার উদ্দেশ্য নয়। কিন্তু অসহযোগিতা মনে করে সর্বান্তঃকরণে গ্রহণের আগে বর্জন অবশ্যই দরকার।

*　　*　　*　　*

তাহলে অসহযোগ কি? মিঃ স্টোকেসের উক্তিতে সে প্রশ্নের ভাল উত্তর পাওয়া যাবে—"এ হল নিবারণযোগ্য অমঙ্গল ঘটানোতে হাত না মেলানো; এ হল অবিচার অনুমোদন বা তাতে অংশ গ্রহণ করতে অস্বীকার; এ হল প্রতিকারযোগ্য অন্যায়কে স্বীকার বা ন্যায় বিধানের সঙ্গে সম্পূর্ণ অসঙ্গত কোন অবস্থার কাছে নতি স্বীকারে অস্বীকার। এবং তার ফলে তাদের সঙ্গে কাজ করতে অস্বীকার করা—যারা স্বার্থ বা উদ্দেশ্য সাধনের কারণে অন্যায় করে চলেছে বা তা চিরকাল করতে চায়।"

কিন্তু অনেকে বলছেন যে সম্পূর্ণ নীতিটি নেতিবাচক নীতি, হতাশার নীতি। স্বীকার করছি, আকারে নীতিটি নেতিবাচক কিন্তু বিষয়বস্তুর দিক থেকে বিচার করলে, আমি বলছি, তা স্বীকৃতিসূচক। আমরা ভাঙ্গি, গড়ার জন্য; ধ্বংস করি, নতুন সৃষ্টির জন্য; বর্জন করি, গ্রহণের জন্য। এ হল মানব প্রয়াসের পূর্ণ ইতিহাস। পরাধীনতা যদি মন্দ হয় তাহলে যে কোন শক্তি আমাদের পরাধীনতা স্থায়ী করার চেষ্টা করবে তার সঙ্গে অসহযোগ করতে আমার বাধ্য। এ হল এর নেতিবাচক দিক। কিন্তু এর স্বীকৃতিবাচক দিক হল স্বাধীন হওয়ার, যে কোন মূল্যে স্বাধীনতা অর্জনে আমাদের দৃঢ় সঙ্কল্প এই নীতি যে হতাশাব্যঞ্জক এ কথাও আমি স্বীকার করি না। এ নীতি হল আশার নীতি, আস্থার নীতি, ঈপ্সিত ফল লাভে এর

সাফল্যে অসীম বিশ্বাসের নীতি। কারাগারে নিয়ে যাবার সময় নির্য্যাতিতদের মুখের দিকে তাকালেই দেখতে পাবেন জয় ইতিমধ্যে আমাদের করায়ত্ত হয়েছে। মহম্মদ আলি ও সৌকত আলির মত নির্ভীক ও কর্মতৎপর লোক শুধু শুধু কষ্টভোগ করেন নি; বিশ্বের অন্যতম সাহসী ব্যক্তি লালা লাজপত রায় শুধু শুধু আমলাতন্ত্রের আদেশপত্র তাদের মুখে ছুড়ে দিয়ে দৃঢ় পদবিক্ষেপে কারাগারের দিকে এগিয়ে যাননি।

* * * *

তাহলে এই দর্শনই হল অসহযোগ আন্দোলনের ভিত্তি—জাতি হিসেবে আমাদের বিকাশ ও আত্মচরিতার্থতার যে শত্রুভাবাপন্ন শক্তি বাধা দেবে তাকে অবিরাম প্রতিহত করা, তাকে ঘৃণা না করে অমঙ্গলকে অমঙ্গল বলেই গণ্য করা এবং শক্তির উদ্ভাবিত সমস্ত যন্ত্রণা সহ্য করা।

…কয়েকস্থানে গোলযোগ হয়েছে বলে আমাদের আন্দোলনের মোল সত্যের বিরুদ্ধে যুক্তি খাড়া করা যায় না, সাহসের সঙ্গে সঙ্গে আমরা এই পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়ে ভবিষ্যতে যাতে তার পুনরাবৃত্তি না হয় সেজন্য ব্যবস্থা অবলম্বন করব। কিন্তু তা বলে আমি আপনাদের অসহযোগ আন্দোলন থেকে সরে দাঁড়াবার পরামর্শ দিতে পারি না, দেবও না। সাম্প্রতিক ধরপাকড় সত্বেও ভারত যে শান্ত রয়েছে তাতেই এটি প্রমাণিত হয়েছে যে, বম্বের শিক্ষা ব্যর্থ হয়নি। সম্প্রতি সাহস, সহ্য শক্তি ও উল্লেখযোগ্য আত্মসংযমের যে প্রকাশ ঘটেছে তাতে আমার মনে হয়, অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের সাফল্য ও প্রয়োজনীয়তা প্রমাণিত হয়েছে। এই মনোভাব যদি আরও বিকশিত হয় ও শেষ পর্য্যন্ত বজায় থাকে তাহলে কোনকিছুই আমাদের অগ্রগতি রোধ করতে পারে না।

* * * *

…লর্ড রিডিং স্পষ্টতই ভুল উক্তি করেছেন যে কলকাতা এবং ভারতের অন্যত্র ধরপাকড় দেশের সাধারণ ফৌজদারি আইন

অনুসারেই করা হচ্ছে।...ভুল বা ঠিক হোক কংগ্রেস তার একমাত্র বৈধ রাজনৈতিক হাতিয়ার স্বরূপ অসহযোগ নীতি গ্রহণ করেছে। তাকে আইন ভাঙ্গা বলে না। ভুল হোক, ঠিক হোক, কংগ্রেস বিদেশী দ্রব্য বিশেষত বিদেশী কাপড় বর্জন করার সিদ্ধান্ত করেছে। একে আইনভাঙ্গা বলা চলে না। ঠিক হোক, ভুল হোক কংগ্রেস ইংল্যাণ্ডের যুবরাজকে স্বাগত জানাতে অস্বীকার করেছে। এও তো আইনভাঙ্গা নয়। এখন কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যম ছাড়া কিভাবে কাজ করতে পারে? অথচ এই প্রতিষ্ঠান-গুলিকে আপনারা ভারতীয় ফৌজদারী বিধি সংশোধনী আইন অনুসারে অবৈধ ঘোষণা করেছেন। এইসব স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের ওপর আঘাত হেনে আপনারা কংগ্রেস প্রচার কার্য্যকে—যা আপনারা স্বীকার করতে বাধ্য, বেআইনী নয়—আঘাত করেছেন। আমরা যদি ধরে নিই যে আপনি মনে করেন আমাদের মধ্যে আপনার মতই দেশপ্রেম বর্ত্তমান তাহলে আপনার আদেশ অমান্য ও কারাবরণে আমাদের দৃঢ়সঙ্কল্প দেখে অবাক হচ্ছেন কেন? আমি জোরের সঙ্গে বলছি আপনিই আইন ভেঙ্গেছেন, আমরা ভাঙ্গিনি। যে আইনে প্রজার বাক ও কর্মস্বাধীনতা—যতক্ষণ না তা দেশের সাধারণ ফৌজদারী আইন বিরোধী হয়—স্বীকৃত সে আইন লঙ্ঘন করেছেন আপনি। আপনি সেই আইন লঙ্ঘন করেছেন যাতে সভা অনুষ্ঠানের—যতক্ষণ না তা অবৈধ জনসমাবেশে পরিণত হয়—প্রজার অবাধ অধিকার স্বীকৃত হয়েছে। প্রজার এই সাধারণ বৈধ অধিকারগুলি আপনি লঙ্ঘন করেছেন। এবং আমি আপনাকে মনে করিয়ে দিতে চাই যে এইসব প্রাথমিক দাবীগুলি মেনে নেওয়ার ওপরে প্রজার আনুগত্য নির্ভর করে।

কিন্তু বলা হচ্ছে যে এইসব সমিতি আইন শৃঙ্খলা রক্ষার ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করছে। তা যদি করে থাকে তাহলে তার জন্যে রয়েছে সাধারণ ফৌজদারী আইন এবং সেটি এ বিষয়ে যথেষ্ট। কলকাতায়

কোন হিংসাত্মক কাজ হয়েছে বলে আমি শুনিনি। অন্তত এ বিষয়ে পুলিশের কাছে কোন নালিশ করা হয়নি। হিংসার অভিযোগ সম্বন্ধে তদন্ত করা যায়। সেজন্য সে অভিযোগ দায়ের করা হয়নি। কিন্তু ভীতি প্রদর্শনের অভিযোগ করা সহজ কারণ সে সম্বন্ধে তদন্ত করা যায় না। আমি শুধু কর্তৃপক্ষদের একটা প্রশ্ন করতে চাই, "ভীতি প্রদর্শনের কোন ঘটনা সম্বন্ধে পুলিশের কাছে কি নালিশ করা হয়েছে?" কলকাতার 'রাজভক্তদের' অসহযোগীরা ভীতি প্রদর্শন করেছেন এমন নির্দিষ্ট কোন অভিযোগ স্থানীয় সরকার কি তদন্ত করে পেয়েছেন? সাধারণ অভিযোগের কথা বলছি না কারণ তা সহজেই করা যায়। জনৈক ইংরেজ সাংবাদিক কলকাতায় এক ইংরেজী দৈনিক পত্রিকায় "নমিনিস আম্ব।" এই ছদ্মনামে মত প্রকাশ করেন যে, কলকাতায় হরতাল জনগণ স্বেচ্ছায় করেছে। গত ১৪শে নভেম্বর 'ক্যাপিটাল' পত্রিকায় "ডিচার্স ডায়েরী"তে পড়লাম—"জনগণ ইচ্ছেমত মেনে নিয়েছিল কিন্তু কেউ একটু সতর্কতার সঙ্গে লক্ষ্য করলে দেখতেন বেশীর ভাগ লোক শুধু যে স্বেচ্ছায় এই নতুন জুলুম মেনে নিয়েছে তা নয়, সরকার নাস্তানাবুদ হওয়াতে তারা উল্লাসবোধ করছিল।" তাই যদি হয় তাহলে ভারতীয় ফৌজদারী বিধি সংশোধনী আইনের ১৬নং ধারা অনুসারে ঘোষণার কি কারণ থাকতে পারে? গত ১৭ই নভেম্বর কলকাতায় যে অবস্থা ছিল তা কি ইংলণ্ডের—যেখানে বিরাট ধর্মঘট চলছে—অবস্থা থেকে মন্দতর ছিল? আপনি কি বলতে চান যে ধর্মঘট ও পিকেটিং বন্ধ করার মত ক্ষমতা ইংলণ্ডের মন্ত্রীসভার আছে? না, ভদ্রমহোদয়গণ ভারতীয় ফৌজদারী বিধি সংশোধনীয় আইন প্রয়োগের প্রকৃত উদ্দেশ্য অসহযোগীদের ভীতি প্রদর্শনের হাত থেকে রক্ষা করা নয় বরং কংগ্রেস ও অসহযোগ আন্দোলন ধ্বংস করা। এই ভীতি প্রদর্শনের জবাব আপনাদের দিতে হবে।

সরকারের আরেকটা উদ্দেশ্য আছে। তাহল চোখ রাঙ্গানী, ভীতিপ্রদর্শন ও শক্তি প্রয়োগ করে ইংলণ্ডের যুবরাজের কলকাতা

পরিদর্শন সফল করে তোলা। আপনাদের পক্ষ থেকে যুবরাজকে আমি ব্যক্তিগতভাবে সশ্রদ্ধ শুভেচ্ছা জানাবো। ইংলণ্ডের রাজ পরিবারের সঙ্গে আমাদের কোন বিবাদ নেই। কিন্তু তিনি এখানে আসছেন এমন এক শক্তির দূত হয়ে যার সঙ্গে সহযোগিতা করব না বলে আমরা স্থির করেছি। তাই আমরা তাঁকে অভ্যর্থনা জানাতে পারি না। কোনও রকম আনন্দ অনুষ্ঠানে যোগ দেবার মনোভাবও আমাদের নেই। আমাদের জাতীয় অস্তিত্ব এবং নিজস্ব পদ্ধতিতে জীবনযাত্রা নির্বাহ ও আমাদের অধিকার মতো আমাদের ভাগ্য গড়ার মৌলিক অধিকারের জন্য আমরা সংগ্রাম করছি। আমাদের সেই মৌলিক অধিকার স্বীকার করতে যে শক্তি প্রত্যাখ্যান করেছে তারই দূতকে জাতীয় অভ্যর্থনা আমাদের পক্ষে ভণ্ডামি হবে। যুবরাজকে জাতীয় অভ্যর্থনা জানাতে অস্বীকার করে আমরা তাঁকে বা ইংলণ্ডের রাজ পরিবারকে অসম্মান করিনি। এতে আমলাতন্ত্রের সঙ্গে সহযোগিতা না করার আমাদের দৃঢ়সঙ্কল্প প্রকাশ পেয়েছে মাত্র।

পরিশিষ্ট—৩

অসহযোগ ও পরিষদে প্রবেশ

[১৯২২ সালের ডিসেম্বর মাসে গয়ায় অনুষ্ঠিত কংগ্রেস অধিবেশনে সভাপতির ভাষণ]

ভ্রাতা ও ভগিনীগণ,

আজ আপনাদের সামনে দাঁড়িয়ে এক বিরাট ক্ষতিতে আমার মন অভিভূত হয়ে পড়েছে, সকলের এবং আমাদের প্রত্যেকের মনে যা হচ্ছে তা ভাষায় রূপ দিতে আমি আদৌ পারব না। আমলাতন্ত্রের সঙ্গে স্মরণীয় সংগ্রাম করার পর মহাত্মা গান্ধীকে গ্রেপ্তার করে কারাগারে নিক্ষেপ করা হয়েছে। এ বছর কংগ্রেসের অধিবেশন পরিচালনায় তাঁর নির্দেশ আমরা পাব না। কিন্তু শত্রুর ঘাঁটিতে বসে তিনি যে মনোভাব প্রদর্শন করেছিলেন, আমলাতন্ত্রের প্রতিভূদের প্রতি যে অবজ্ঞা ছুড়ে দিয়েছিলেন তা আমাদের প্রেরণা যোগাবে। অনুরূপ শোক, মর্য্যাদা ও গাম্ভীর্য্যপূর্ণ কাহিনী পাঠ করতে হলে আপনাদের দু'হাজার বছর পিছিয়ে যেতে হবে। নাজারেথের যীশু এক বিদেশী ট্রাইব্যুনালের সামনে দাঁড়িয়েছেন বিচারের জন্য। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ, জনগণকে "বিপথে" নিয়ে গেছেন তিনি।

"যীশু গভর্ণরের সামনে দাঁড়ালেন এবং গভর্ণর তাঁকে প্রশ্ন করলেন, 'তুমি কি ইহুদীদের রাজা?' যীশু বললেন, 'আপনিই বলছেন সে কথা।'

"তারপর প্রধান পুরোহিতগণ ও বয়োবৃদ্ধেরা তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেন। যীশু তার উত্তরে কিছুই বললেন না।

"তখন পাইলেট বললেন, তোমার বিরুদ্ধে ওরা অত কথা বলল তা কি তুমি শুনতে পেলে না?

"তিনি একটি কথারও জবাব দিলেন না। গভর্ণর তাতে খুবই আশ্চর্য্য হলেন।"

মহাত্মা গান্ধী ভিন্ন পন্থা অবলম্বন করেছিলেন। তিনি স্বীকার করেন যে তিনি দোষী এবং তাঁর অপরাধ সরকারী অভিশংসকের অভিযোগ থেকে বড়, তা উল্লেখ করেন। কিন্তু তিনি বলেন, আমলাতন্ত্রের আইন লঙ্ঘন করে তিনি ভগবানের আইন মান্য করছেন। অনুমান করি, যে বিচারক তাঁর বিচার করে কারাদণ্ড দিয়েছেন তিনি পন্টিয়াস পাইলেটের মতই আশ্চর্য্য হয়েছেন।

মহাত্মা গান্ধী সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও কার্য্যকরী করা উভয় ক্ষেত্রেই মহান। দেশের হয়ে তিনি শেষ যে মনোভাব প্রদর্শন করেন সে মহত্তের তুলনা নেই। তিনি নিঃসন্দেহে বিশ্বের মহত্তম ব্যক্তিদের অন্যতম। তাঁকে বিশ্বের প্রয়োজন এবং তাঁকে "গুরুত্বপূর্ণ পদাধিকার" লোকেরা, "স্বার্থান্বেষী" লোকেরা—যীশুর আমলের স্ক্রাইব ও ফ্যারিশীদের মত—যদি ঠাট্টা করে, তিনি এখন ও চিরকাল জাতির কাছে স্মরণীয় হয়ে থাকবেন, যে জাতিকে নিয়ে গেছেন এক জয় থেকে আর এক জয়ের পথে।

ভদ্রমহোদয়গণ, আমরা এক সঙ্কটময় মুহূর্তে রয়েছি এবং যে প্রকৃত কারণে জনগণ এবং আমলাতন্ত্র ও তাঁদের ভারতীয় বন্ধুদের

মধ্যে বিভেদের সৃষ্টি হয়েছে সে সম্বন্ধে আলোচনা করা অত্যাবশ্যক। গত বছর প্রায় এই সময় চণ্ডনীতি শুরু হয় এবং তা চলাকালে এই কারণটি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এই চণ্ডনীতি সমর্থন এবং কোন কোন ক্ষেত্রে তাতে উস্কানি দেন নরমপন্থী নেতারা যাঁরা সরকারের কার্য্যনির্বাহক। যাঁরা সরকারকে সমর্থন করেছিলেন তাঁদের বিরুদ্ধে অসাধুতা বা দেশপ্রেমের অভাবের অভিযোগ আমি করছি না। আমি বলছি, আইন শৃঙ্খলার যুদ্ধনাদেই তাঁরা অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন। এইরূপ মনোভাবের মূলে চিন্তা বিভ্রম আছে, এই আমার বিশ্বাস বলেই আইন শৃঙ্খলার এই অজুহাত নিয়ে আলোচনা করতে চাই। বস্তুত বিশ্বের সর্বত্র আমলাতন্ত্রের শেষ সম্বল 'আইন ও শৃঙ্খলা'।

শুধু আমলাতন্ত্র নয়, তাঁদের ধ্বজাধারী নরমপন্থী দলও গাম্ভীর্য্যের সঙ্গে জানিয়েছেন, জনগণের প্রথম প্রয়োজন আপোষ মীমাংসার ভিত্তিতে গঠিত সরকার এবং সাংবিধানিক পদ্ধতিতে—যার মানে আমি বুঝি সংবিধান সম্মত পদ্ধতি–ছাড়া অভাব অভিযোগ পেশ করার অধিকার প্রজাবৃন্দের নেই। তাঁরা বলেন, 'যদি তোমরা দেশের আইন বজায় রাখতে সক্রিয় সহযোগিতা করতে না পার তাহলে দায়িত্বশীল নাগরিক হিসেবে তোমাদের কর্তব্য হল নিষ্ক্রিয়ভাবে তা মেনে নেওয়া। তোমাদের কাছে সরকার একমাত্র প্রত্যাশা করে অপ্রতিরোধ।" আমলাতন্ত্রের এই হল সমগ্র দর্শন—সরকারের পক্ষে আইন ও শৃঙ্খলা বজায় রাখা আর প্রজাদের পক্ষে নিষ্ক্রিয় বাধ্যতা ও অপ্রতিরোধের মনোভাব। কিন্তু বিজয়ী উইলিয়ম থেকে শুরু করে দ্বিতীয় জেমস পর্য্যন্ত প্রত্যেক ইংরেজ নৃপতির রাজনৈতিক দর্শন কি তাই ছিল না? রোমানফ, হয়েনজোলার্ন ও বোর্বোঁদের কি সেই একই রাজনৈতিক দর্শন ছিল না? কিন্তু স্বাধীনতা যেখানেই এসেছে, এসেছে আইন ও শৃঙ্খলার নামে ঘোষিত সমস্ত আইন ভঙ্গ করে। সরকার যেখানে স্বেচ্ছাচারী

ও অত্যাচারী এবং জনগণের মৌলিক অধিকার যেখানে অস্বীকৃত সেখানে আইন ও শৃঙ্খলার কথা বলা বৃথা।

আপাতদৃষ্টিতে এই নীতিটি ইংল্যাণ্ড থেকে এই দেশে এসেছে। এই নীতির সত্যতা যাচাই করার জন্য ইংরেজের ইতিহাসের প্রসঙ্গ উত্থাপন করছি। ইতিহাসে আছে ইংলণ্ডের অধিকাংশ অত্যাচারী রাজা—যাঁরা জনগণের ওপর যথেচ্ছাচার করেছিলেন—জনগণের কল্যাণ এবং আইন ও শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য কাজ করার প্রস্তাব করেছিলেন। নর্মানদের আমল থেকে শুরু করে ষ্টুয়ার্টদের আমল পর্য্যন্ত ইংরেজী স্বৈরতন্ত্র এই আইন ও শৃঙ্খলার মাধ্যমেই একটি সাংবিধানিক রূপ পরিগ্রহের চেষ্টা করেছিল। প্রথম চার্লস তাঁর প্রাণদণ্ডের ঠিক আগে এক করুণ ভাষণে এই সম্পূর্ণ নীতিটি সংক্ষেপে বিবৃত করেন। তিনি বলেন, "যে কোনও পদাধিকারী লোকের মতই আমি জনগণের স্বাধীনতা ও মুক্তি কামনা করি। কিন্তু আমি জানাতে চাই, তাদের মুক্তি ও স্বাধীনতা বলতে সরকারের হাতে সেই আইনগুলির ভার ছেড়ে দেওয়া বোঝায় যে আইনবলে তাদের জীবন ও সম্পত্তি তাদের নিজস্ব হতে পারে। সরকার পরিচালনায় তাদের কোন অংশ থাকতে পারে না; এটা তাদের নয়। প্রজা ও রাজা, দুটি সম্পূর্ণ পৃথক জিনিস।" এ থেকে আরও স্পষ্ট করে আইন ও শৃঙ্খলা নীতি ব্যাখ্যা করা যেত না। যদিও ইংরেজ নৃপতিরা সংবিধান সম্মত পদ্ধতিতে শাসন করেছেন—তাঁদের কাজ আইনের বিধান এবং পূর্ববর্তীর আচরণ দ্বারা সমর্থিত হয়েছে—প্রজারা চিরকাল দাবী করেছে যে তাদের মৌলিক অধিকার প্রয়োগ এবং রাজার কাছ থেকে তা বলপূর্বক বা বিদ্রোহ করে কেড়ে নেওয়ার অবাধ অধিকার তাদের আছে। ১৫ই জুন ১২১৫ তারিখে রাজা জন যখন ম্যাগনা কার্টায় স্বাক্ষর দিতে বাধ্য হলেন সেইদিন এই আইন ও শৃঙ্খলার নীতি প্রচণ্ড

আঘাত পেল। এই সনদের ৬১নং ধারাটি আমাদের উদ্দেশ্যের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ কারণ এতে রাজাকে সনদ মেনে চলতে বাধ্য করার জন্য প্রজার বিদ্রোহ করার অধিকার স্বীকৃত হয়। ইংরেজী সাংবিধানিক ইতিহাসের প্রখ্যাত লেখক অ্যাডামস বলেন, ১২১৫ সালে ইংলণ্ডের সংবিধানের ভিত্তিস্বরূপ যেমন শর্তমূলক বিদ্রোহ বিদ্যমান ছিল, আজও তা আছে। কিন্তু আইন ও শৃঙ্খলার নীতি রূঢ় আঘাত পেলেও একেবারে নির্মূল হয় নি; মধ্যবর্তীকালে রাজা অর্থ সংগ্রহের—শুধু পরোক্ষ কর ধার্য্য করে নয়, জোর করে ঋণ ও দান আদায় করে—অধিকার দাবী ও তা জোর করে নেন। এবং প্রায়ই বিধান সম্বন্ধীয় অধিকাংশ কাজ করতেন—শুধু ক্ষমতা লোপ করে নয়, রাজকীয় ঘোষণা দ্বারাও। হালামের ভাষায়, "বর্তমান আইনগুলির পূর্ণ প্রয়োগের জন্য রাজা শুধু অতিরিক্ত ক্ষমতা দাবী করেন নি, চেয়েছিলেন চূড়ান্ত ক্ষমতা—যা মাঝে মাঝে স্বৈরতন্ত্র বলে অভিহিত হত—যা বৈধ অধিকারের সীমা অতিক্রম করত 'শুধু জনগণের নিরাপত্তার জন্য'। আর তা ঘটত যখনই পরিষদ মনে করত যে জনগণের নিরাপত্তা বিপন্ন হচ্ছে। ষ্টুয়ার্টদের আমলে রাজা যে সব ক্ষমতা দাবী করেন সেগুলি আদালত বৈধ বলে স্বীকার করে নেন। অ্যাডামসের ভাষায়, "বিচারের নামে হত্যা চালিয়ে যাবার যন্ত্র হয়ে উঠল আইন।" মনে রাখা দরকার যে, আইন ও শৃঙ্খলা বজায়ের পদ্ধতিই রাজার হাতে সমস্ত ক্ষমতা তুলে দিতে সাহায্য করে। রাজকীয় কোষাধ্যক্ষ বারবার ঘোষণা করেন যে 'জনগণের সাধারণ কল্যাণের জন্য' কর ধার্য্যের ক্ষমতা রাজার আছে। অ্যাডামস বলেন, ষ্টুয়ার্ট রাজারা তাঁদের সব কাজের জন্যই বৈধ সমর্থন খুঁজে বের করতেন। তাছাড়া ইতিহাস ছিল রাজাদের পক্ষে।

কিন্তু সাধারণ লোক এই আইন ও শৃঙ্খলা নিশ্চিত প্রয়োগের সম্মুখীন হয়েছিল কিভাবে? তারা পার্লামেণ্টের ভেতরে ও

বাইরে সমান অসহযোগ চালিয়ে যেত। পার্লামেন্টের ভেতরে, তাদের অভিযোগ না মিটলে তারা রাজার বরাদ্দের পক্ষে ভোট দিতে অস্বীকার করত। রাজা পাল্টা জবাব দিলেন নিজের উদ্যোগে বাণিজ্য শুল্ক বৃদ্ধি করে এবং আদালত তা স্বীকার করে নিল। কমন্স সভায় এই মর্মে এক প্রস্তাব গৃহীত হল যে, যারা ঐ বর্দ্ধিত শুল্ক দেবে তাদের "ইংলণ্ডের স্বাধীনতার বিশ্বাসঘাতক ও শত্রু" বলে গণ্য করা হবে বিপ্লব যে ঘটতে চলেছে সে সম্বন্ধে সন্দেহের কোন অবকাশ ছিল না। রাজা চার্লস বিপদে পড়ে অধিকার সংক্রান্ত বিলে রাজকীয় সম্মতি দান করলেন। এই বিলটি অসহযোগীদের বিজয় সূচনা করে কারণ দেশ শাসনে কোনরূপ অংশ গ্রহণ করতে অস্বীকার করে তাঁরা রাজাকে তাঁদের অধিকার মেনে নিতে বাধ্য করেন। এরপরে ১৬২৯ ও ১৬৪০ সালের মধ্যে যেসব ঘটনা ঘটল তাতে রচিত হল ইংলণ্ডের ইতিহাস। এই বিল গৃহীত হওয়া সত্বেও রাজা বাণিজ্য শুল্ক আদায় করতে লাগলেন আর ইলিয়ট ও তাঁর বন্ধুদের বিচার শুরু হল। তাঁরা মামলা লড়তে অস্বীকার করে এবং তার ফল রাজার স্বৈরতন্ত্রের পক্ষে অমঙ্গলজনক হয়। রাজা বন্দর কর ধার্য্য করলেন। নানা স্থানের প্রধান কনস্টেবলরা জানালেন যে পার্লামেন্টের অনুমতি বিনা কোন লোকের কর পরিমাপ বা তার কাছ থেকে কর গ্রহণের অধিকার শেরিফদের নেই। জনগণ কর দিতে অস্বীকার করায় তাদের গবাদি পশু খোঁয়াড়ে ধরে নিয়ে যাওয়া হল কিন্তু সেগুলির কোন ক্রেতা পাওয়া যায় নি। "যখন সাধারণভাবে রাজ্যের কল্যাণ ও নিরাপত্তার প্রশ্ন দেখা দেয় এবং সারা রাজ্য বিপদাপন্ন"—লক্ষ্য করুন এই ফর্মূলা হুবহু ভারত শাসন আইনে অনুকরণ করা হয়েছে—"তখন রাজা তাঁর রাজ্যের সকল প্রজাকে রাজ্যের প্রতিরক্ষা ও এই ধ্বংস থেকে রক্ষার"—সেই একই ফর্মূলা—"জন্য জাহাজ, লোক, রসদ ও অস্ত্রশস্ত্র যোগাতে আদেশ দিতে

পারেন কি না এবং জনগণ অস্বীকার বা অবাধ্যতা দেখালে আইনবলে তাদের বাধ্য করাতে পারেন কি না" রাজা সে বিষয়ে রাজস্ব আদালতের অভিমত জানতে চান। রাজা আরও জানতে চান, এই ধরণের পরিস্থিতিতে বিপদ পরিমাপ এবং তা কখন ও কিভাবে প্রতিরোধ করতে হবে তা স্থির করার একমাত্র বিচারক রাজা হতে পারেন কি না। বিচারকেরা হাঁ সূচক জবাব দেন এবং এই রায় হ্যাম্পডেন আনীত বিখ্যাত মামলাগুলিতে বজায় রাখেন।

আমি একটি বিষয়ের ওপর জোর দিতে চাই, তাহল ষ্টুয়ার্টগণ ও পার্লামেণ্টের মধ্যে দীর্ঘ ও তিক্ত সংগ্রাম চলাকালে ষ্টুয়ার্টেরা আইন ও শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য কাজ করেছিলেন এবং আইন ও ইতিহাস তাঁদের পক্ষে ছিল। গৃহযুদ্ধের প্রারম্ভে ছুটি দল যে প্রশ্নে ভাগ হয়ে গেল তা হল—রাজা আইন ও শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য প্রজাদের নিষ্ক্রিয় বাধ্যতা কি দাবী করতে পারেন? বা প্রজার কি প্রতিরোধ করার অধিকার আছে—যদিও সেই প্রতিরোধের ফলে বিশৃঙ্খলা দেখা দিতে ও আইন লঙ্ঘিত হতে পারে। পার্লামেণ্ট সমর্থকেরা জনগণের অধিকার ও মর্য্যাদা, পার্লামেণ্টের কর্তৃত্ব ও স্বাধীনতা, ব্যষ্টির স্বাধীনতা, প্রতিরোধের অধিকার ও রাজাকে রাজপদ ত্যাগ ও সিংহাসনচ্যুত করার অধিকার দাবী করেন। এককথায়, তাঁরা রাষ্ট্রের অত্যাচারের বিরুদ্ধে মানুষের পক্ষে ছিলেন। রাজার সমর্থকগণ আইন ও শৃঙ্খলার মাধ্যমে প্রজার কাছ থেকে নিষ্ক্রিয় বাধ্যতা ও অপ্রতিরোধ পাওয়ার অধিকার রাজার আছে বলে দাবী করেন। এককথায়, তাঁরা ব্যষ্টির স্বাধীনতার বিরুদ্ধে রাষ্ট্রের অত্যাচার ও বাধ্যতামূলক সহযোগিতা অর্জনের পক্ষে ছিলেন।

বিষয়টি নিষ্পন্ন হয় পার্লামেণ্টের অনুকূলে। কিন্তু প্রত্যেক লড়াইতে যা হয়ে থাকে তাই হল—ব্যষ্টি স্বাধীনতার জয় ক্ষণস্থায়ী

হয়েছিল মাত্র। ব্যষ্টি স্বাধীনতার দিক থেকে বিচার করলে যদিও গৃহযুদ্ধের ফল মারাত্মক হয়েছিল এবং ব্যষ্টি স্বাধীনতা আরও নিশ্চিত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করার জন্য যদিও আর একটি বিপ্লবের প্রয়োজন হয়েছিল, "প্রজা রাজার চুলচেরা বিচার করেছে—মানুষ যেমন মানুষের বিচার করে—এই উপলব্ধি লোকাচার ও প্রাচীন-যুগীয় শ্রদ্ধার শৃঙ্খল থেকে মানবমনের মুক্তি—যা অত্যন্ত ধীরে ধীরে হচ্ছিল—ত্বরান্বিত করল।"

১৬৮৮ সালের রক্তপাতহীন বিপ্লব ইংলণ্ডে নিয়ে এল আইনের সেই শাসন যা আইন ও শৃঙ্খলা বজায় রাখার একমাত্র ভিত্তি। দীর্ঘ পার্লামেণ্ট যে কাজ শুরু করেছিল এবং প্রথম চার্লসের প্রাণদণ্ডের ফলে যা ব্যাহত হয়েছিল তা এই বিপ্লবে সমাপ্ত হল। কিন্তু ১৬৮৮ সালের শান্তিপূর্ণ বিপ্লব ঘটেছিল কি করে? এ বিপ্লব সম্ভব হয়েছিল প্রভুত্ব অগ্রাহ্য করে এবং একটি নীতি দৃঢ়তার সঙ্গে অনুসরণ করে—তাহল, কর্তৃপক্ষের ব্যাপক, স্বেচ্ছাচারী বা বিবেচনামূলক অবরোধকারী ক্ষমতা প্রতিরোধ করার অবিচ্ছিন্ন অধিকার প্রজার আছে।

১৬৮৮ সালের বিপ্লব যে নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল তার বিজয়সূচক প্রকাশ ঘটল ডাঃ সাচেভেরেলের বিখ্যাত মামলায়। ধর্মোপদেশ দেওয়ার সময় ডাঃ সাচেভেরেল বলেছিলেন, "আমাদের সরকারের মহান নিরাপত্তা এবং সেই নিরাপত্তার স্তম্ভের ভিত্তি হল পরম প্রভুত্বের প্রতি প্রজাবৃন্দের অবিচলিত আনুগত্য, আইনসঙ্গত সকল কিছুর চূড়ান্ত শক্তির কাছে বিনাশর্তে নতি স্বীকার ও কোন অজুহাতে প্রতিরোধ করা যে বেআইনী সেই উপলব্ধি।" এ হল নিষ্ক্রিয় বাধ্যতা ও অপ্রতিরোধের নীতি—সেই আইন ও শৃঙ্খলার নীতি যা আজ দেশে প্রত্যেক দেশি বিদেশী আমলা ঘোষণা করেছেন। প্রজার কর্তব্য ও সরকারের অধিকার সম্বন্ধে এই নাকি শেষ কথা।

কিন্তু লক্ষ্য করুন ইংলণ্ডে ১৭১০ সালে এই সমস্যাটির সমাধান কি ভাবে হয়েছিল। ব্যক্তি স্বাধীনতা বিধ্বংসী এই ধরণের অভিমত প্রকাশের জন্য ডাঃ সাচভেরেলকে কমন্স সভায় অভিযুক্ত এবং লর্ড সভায় তাঁকে ভোটাধিক্যে দোষী সাব্যস্ত করা হয়। বিচার চলাকালে সেসব প্রদত্ত ভাষণ খুবই চিত্তাকর্ষক। আমি সেই ভাষণগুলি থেকে কয়েক ছত্র উল্লেখ করতে চাই। স্যার যোশেফ জাকিল তাঁর ভাষণে বলেন, "রাজার কর্তৃত্ব ও প্রজার আনুগত্যে পরিমাপের একমাত্র মাপকাঠি আইন হওয়ায় সেই আইনের অস্তিত্ব ও কার্য্যকারিতা নির্ভর করে সাধারণের সম্মতির ওপর। সাধারণের সম্মতি ছাড়া অন্য কোন ভিত্তির ওপর তা প্রতিষ্ঠিত করলে সেই বাধ্যবাধকতার অবসান ঘটবে। সাধারণের সম্মতির এই ধারণা রাজা ও জনসাধারণকে আইন মানতে বাধ্য করে। ······মহোদয়গণ, অন্তহীন অপ্রতিরোধের নীতির ভাবগত অবসান সারা জাতি ঘটিয়েছে বিপ্লবের মাধ্যমে, পার্লামেণ্টে বিভিন্ন আইন প্রণয়ণ করে সেই নীতি বর্জনের বাস্তব প্রকাশ সাধন করা হয়েছে। ····· সেজন্য আমি শুধু এ কথাই বলব, একথা কখনই মনে করা যেতে পারে না যে নিজের ধ্বংসের জন্য এক স্বেচ্ছাচারী ক্ষমতা এবং সরকারের সংবিধানের—যা প্রতিষ্ঠা ও রক্ষার জন্যই আইনের সৃষ্টি—বিলোপ সাধনের উদ্দেশ্যে আইন রচনা করা হয়েছিল।" মিঃ ওয়ালপোল সম্পূর্ণ যুক্তিটি এক কথায় প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, "বিনাশর্তে নিষ্ক্রিয় অন্তহীন বাধ্যতার নীতি প্রথম আবিষ্কৃত হয়েছিল স্বেচ্ছাচারী ও অত্যাচারী শক্তির সমর্থনের জন্য। কোন না কোন সময়ে ঐ নীতি প্রয়োগের ইচ্ছা না থাকলে কোন সরকার কখনই তার বিকাশে চেষ্টা বা তাকে সমর্থন করেন নি।" আইন ও শৃঙ্খলা নীতির বিরুদ্ধে কোনও যুক্তি এর চেয়ে স্পষ্ট ও দৃঢ়তার সঙ্গে পেশ করা যায় না। তাঁর যুক্তি হল, আইন ও শৃঙ্খলা যদি

স্বৈরতন্ত্রের শক্তি সংহত ও তার হাত আরও শক্তিশালী করার পদ্ধতি হয়ে থাকে তাহলে নীতিটি কখনই সৎ হতে পারে না। আমি আর একটি মাত্র উদ্ধৃতি দিচ্ছি। এটি মেজর জেনারেল ষ্টানহোপের ভাষণ থেকে—"চূড়ান্ত অপ্রতিরোধ নীতি প্রসঙ্গে বলতে পারি, নীতিটি যে যুক্তির আইন, প্রকৃতির আইন এবং সর্বকালের সর্বদেশের রীতিনীতির সঙ্গে সঙ্গতিহীন তা যুক্তি দিয়ে প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করা নিষ্প্রয়োজন। প্রকৃতপক্ষে নাগরিক ও ধর্মীয় সংবিধান আক্রান্ত ও অত্যাচারিত হলে বিশ্বের সকল জাতি, সকল দেশ ও সকল যাজক সম্প্রদায় কিভাবে ব্যবহার করেছিলেন তা দেখালেই উক্ত সত্য উপলব্ধি করা যাবে।"

তাহলে এই হল ইংলণ্ডের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাস। ইংরেজেরা যে আইন ও শৃঙ্খলা নীতির প্রতি নতি স্বীকার করে তাঁদের মৌলিক অধিকারের স্বীকৃতি পান নি, এ সিদ্ধান্ত অনিবার্য্য হয়ে পড়ে। আমি যে পর্য্যালোচনা করলাম তা থেকে কতগুলি সিদ্ধান্তে আসা যায়। প্রথমত জনগণের সম্মতির ভিত্তিতে রচিত না হলে কোন বিধিই আইন হতে পারে না। দ্বিতীয়ত, এ ধরণের সম্মতির অভাব হলে সেই আইন মানার জন্য বাধ্যবাধকতা জনগণের নেই। তৃতীয়ত, জনগণের বিনানুমতিতে রচিত শুধু নয়, আইন যদি জনগণের মৌলিক অধিকার আক্রমণ করে তাহলে সেগুলি প্রত্যাহার করতে বাধ্য করার জন্য বলপ্রয়োগ বা বিদ্রোহ করার অধিকার জনগণের আছে। চতুর্থত, স্বৈরতন্ত্র বজায় রাখার জন্য আইন ও শৃঙ্খলার অজুহাত চিরকাল দেওয়া হয় ও হয়েছে। শেষ সিদ্ধান্ত হল, আইনের প্রকৃত শাসন শুরু হওয়ার আগে আইন বা শৃঙ্খলা কোনটিই থাকতে পারে না।

প্রশ্নটি গুরুত্বপূর্ণ বলে এ বিষয়ে আমি বিশদ আলোচনা করলাম। অনেক নরমপন্থী আছেন যাঁরা এখনও মনে করেন যে

প্রত্যেক রাজভক্ত প্রজার উচিত হল আইন ও শৃঙ্খলা বজায় রাখাতে সরকারকে সাহায্য করা। আজ প্রত্যেক ভারতীয়ের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা অনেকটা নির্ভর করছে কর্তৃত্বাসীন ব্যক্তিদের ব্যাপক, স্বেচ্ছাচারী বা বিবেচনামূলক ক্ষমতা প্রয়োগের ওপর। যেখানে এ ধরণের ক্ষমতা অনুমোদিত হয়, আইনের শাসন সেখানে অস্বীকৃত। আইন ও শৃঙ্খলার এই বিধ্বস্ত নীতি কি পরিমাণে স্থির মস্তিষ্ক ও শিক্ষিত লোকদের মনে প্রভাব বিস্তার করে তা জানতে হলে দমনাত্মক আই গুলি সম্বন্ধে তদন্ত করার জন্য নিযুক্ত কমিটির রিপোর্ট পড়লেই চলবে। এই রিপোর্টে আপনারা না পাবেন দেশ প্রেমিকের দর্শন, না পাবেন রাজনীতিজ্ঞের জ্ঞান। বরং দেখবেন সেই অতি বিজ্ঞাপিত অথচ যা নিয়ে ভুল বোঝাবুঝি কম হয়নি. সেই শব্দ দুটি—'আইন ও শৃঙ্খলা'র প্রতি অতি ভক্তি। ১৮১৮ সালের তৃতীয় বিধি সংশোধিত হয়ে সংবিধি পুস্তকে স্থান পাবে কেন? কারণ ভারতের সীমান্ত রক্ষা এবং দেশীয় রাজ্যগুলির প্রতি ভারত সরকারের দায়িত্ব পালনের জন্য এমন আইন অবশ্যই প্রণয়ন করতে হবে যাতে কর্তৃপক্ষ বিশেষ কয়েকজন লোকের- যাঁরা কোনরূপ ফৌজদারি আইনের আওতায় না পড়লেও তাঁদের গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ দরকার—গতিবিধি ও কার্য্যকলাপ নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা পান। ১৯০৮ সালে ভারতীয় ফৌজদারি বিধি সংশোধনী আইন ও ১৯১১ সালের রাজদ্রোহমূলক সভা নিরোধ আইন সংবিধি পুস্তকে বজায় থাকবে কেন? না, আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য। রিপোর্টদাতা এই পণ্ডিত ভদ্রমহোদয়গণ মোটেই ভাবছেন না যে, এই বিধিগুলি কর্তৃপক্ষের হাতে নিয়ন্ত্রণের ব্যাপক, যথেচ্ছাচারী বা বিবেচনামূলক ক্ষমতা তুলে দিয়ে এমন এক পরিবেশ সৃষ্টি করছেন যেখানে প্রত্যেক ব্যক্তির কর্তব্য হল এই আইনবিহীন আইনগুলির অত্যাচার প্রতিরোধ করা। এই বিধিগুলিই আইন ও শৃঙ্খলাভঙ্গকারী কারণ আইন ও শৃঙ্খলা আসে আইনের শাসনের ফলে। যেখানে আইনের শাসনের অস্তিত্ব অস্বীকার করা হয়, সেখানে আপনি মুখ ফিরিয়ে

বলতে পারেন না, "আইনানুগত নাগরিক হিসেবে আপনাদের কর্তব্য হল আইন মান্য করা।"

আমাদের জাতীয় ইতিহাসে গত কয়েক বছরে আইন ও শৃঙ্খলা প্রচুর পরিমাণে পেয়েছি। জাতির প্রতি শেষ প্রকাশ্য অপমান হল, ফৌজদারী বিধি সংশোধনী আইনের অধিকার বলে কংগ্রেসী স্বেচ্ছাসেবকদের ন্যায্য কাজ বেআইনী ও অপরাধমূলক ঘোষণা করে কর্তৃপক্ষের আদেশ জারী। আমাদের নরমপন্থী বন্ধুগণ তা সমর্থন করেন। তাঁদের যুক্তি হল, আইন-অনুগত প্রজার কর্তব্য হল আইন ও শৃঙ্খলা সমর্থন ও রক্ষা। আগেই বলেছি, নীতিটি এসেছে ইংলণ্ড থেকে। কিন্তু আমি কি একটা প্রশ্ন করতে পারি, আমলাতন্ত্র ও তার বন্ধুরা কি এমন কোন নতুন যুক্তি আজ প্রদর্শন করছেন যা ষ্টুয়ার্টরা অনুরূপ প্রাঞ্জলতার সঙ্গে ব্যাখ্যা করেন নি? ষ্টুয়ার্টরা যখন রাজার পক্ষে বিঘ্নকর সকল ব্যক্তিকে কারাদণ্ড দেবার বিবেচনা মূলক ক্ষমতা অন্যায়ভাবে গ্রহণ করেন তখন তাঁরা অজুহাত স্বরূপ বলেছিলেন যে, জাতির নিরাপত্তার জন্য এ ক্ষমতার প্রয়োজন। জাতির নিরাপত্তার জন্য এ ক্ষমতা কখনও প্রয়োগ করা হয়নি বলেই যে ইংলণ্ডে এর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ দেখা দিয়েছিল তা নয়, ব্যক্তি স্বাধীনতার অস্তিত্বের সঙ্গে সঙ্গতিবিহীন বলেই তা প্রতিরোধ করা হয়েছিল। ষ্টুয়ার্টরা যখন ঘোষণা ও অন্যান্য ক্ষমতা খর্ব ও বাতিল করার উদ্দেশ্যে ব্যাপক শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে আইন প্রণয়নের দাবী করেন তখন তাঁরা বলেছিলেন জনগণের নিরাপত্তার জন্যই তা প্রয়োজন। ইংরেজ জাতি রাজাকে সে অধিকার দিতে অস্বীকার করে তার কারণ এই নয় যে এ ধরণের আইন জনগণের নিরাপত্তার জন্য নিষ্প্রয়োজন ছিল বরং তাদের প্রতিরোধের কারণ ছিল, জাতির নিজের আইন প্রণয়নের মৌলিক অধিকারের সঙ্গে রাজার ঐ দাবী কিছুতেই সহাবস্থান করতে পারে না। আজ বৃটিশ ভারতের নিরাপত্তা বা শান্তি বা স্বার্থের প্রয়োজনে কোন বিল অনুমোদনের

যে অধিকার গভর্ণর জেনারেলের রয়েছে তা কি ষ্টুয়ার্টদের অধিকার দাবী থেকে কোন অংশে পৃথক? বস্তুত গভর্ণর জেনারেল এবং প্রাদেশিক লাটদের যে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে তার সঙ্গে অদ্ভুত মিল রয়েছে, টিউডর ও ষ্টুয়ার্টেরা যেসব ক্ষমতা দাবী করেছিলেন সেগুলির সঙ্গে। ষ্টুয়ার্টেরা স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে রাজস্ব সংগ্রহের অধিকার যখন দাবী করেন তখন তাঁরা বলেছিলেন রাজ্যের সাধারণ কল্যাণ ও নিরাপত্তার উদ্দেশ্যে এবং সারা রাজ্যের বিপদ ঘটলেই তাঁরা ঐ ক্ষমতা প্রয়োগ করবেন নয়তো নয়। এই অধিকারকে ইংলণ্ডে বাধা দেওয়া হয় তার কারণ এই নয় যে ষ্টুয়ার্টদের গৃহীত রাজস্ব রাজ্যের কল্যাণ ও নিরাপত্তার জন্য প্রয়োজন ছিল না। এই কারণেই বাধা দেওয়া হয়েছিল যে, জনগণের প্রতিনিধিগণ জনগণের কল্যাণের জন্য যে কর ধার্য্য করবেন শুধুমাত্র তাই দেওয়াই জনগণের মৌলিক অধিকার। এই মৌলিক অধিকারের সঙ্গে রাজার এই অধিকারের কোন সামঞ্জস্য নেই। আজ বিধানসভার বিনা অনুমোদন সত্ত্বেও কোন বিশেষ দাবীর জন্য বরাদ্দ ব্যয় প্রজার স্বার্থে ও নিজ দায়িত্ব পালনের জন্য অত্যাবশ্যক বলে মঞ্জুর করার যে ক্ষমতা প্রাদেশিক লাটকে দেওয়া হয়েছে তা কি ষ্টুয়ার্টদের দাবী থেকে কোন অংশে পৃথক? প্রত্যেকের কাছে এটা স্পষ্ট হওয়া উচিত যে আমরা আইনের শাসনে বাস করছি না। আর ইংলণ্ডের ইতিহাস ঘোষণা করেছে যে যখন কর্ত্তৃপক্ষের হাতে নিয়ন্ত্রণের বিবেচনামূলক বিরাট ক্ষমতা কর্ত্তৃপক্ষদের হাতে দেওয়া হয় তখন আইন ও শৃঙ্খলা বজায় রাখার কথা বলা বৃথা। ইংলণ্ডের পৌরুষ "আইন ও শৃঙ্খলা" ভণ্ডামিকে সাফল্যের সঙ্গে প্রতিরোধ করেছিল। আজ যদি ভারতের পৌরুষ থাকে তাহলে ভারতীয় আমলাতন্ত্রের অনুরূপ কপটতা সাফল্যের সঙ্গে প্রতিরোধ করবে

ইংল্যাণ্ডের ইতিহাস থেকে বিশদ উদ্ধৃতির কারণ হলো, যারা জনপ্রিয় আন্দোলনে ভয় পেয়ে "আইন ও শৃঙ্খলা"র আওয়াজ

তুলেছেন এবং যাঁরা মনে করেন যে মহান ভারতীয় জাতির বিকাশ ঐ ইতিহাসের ধারা অনুসরণ করেই হবে তাঁদের অধিকাংশের কাছে এই ইতিহাসের একটা আবেদন আছে। আমি অবশ্য ইতিহাসের নজির ধরে "আইন ও শৃঙ্খলা"র অজুহাতের বিরোধিতা করছি না। আমার যুক্তি হলো, প্রত্যেক ব্যক্তির এবং প্রত্যেক জাতির সত্যের ওপর দাঁড়িয়ে আইনহীন আইনের বিরুদ্ধে দৃঢ় প্রতিরোধ জানাবার অবিচ্ছিন্ন অধিকার আছে। যীশুখৃষ্টের সময় শনিবার জনগণের উপোস করার বিধান ছিল কিন্তু পুরোহিতের বেলায় সে বিধান খাটত না। যীশু সেই বিধান সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা অবলম্বন করেছিলেন তা নিউ টেষ্টামেণ্ট গ্রন্থে বলা হয়েছে।

"সেই সময় যীশু শনিবার শস্য ক্ষেতের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিলেন। তাঁর শিষ্যগণ ক্ষুধার্ত ছিল, তাঁরা ক্ষেত থেকে শস্য উঠিয়ে খেতে লাগলেন। ইহুদী ধর্মযাজকগণ তা দেখে তাঁকে বলেন, দেখ তোমার শিষ্যেরা শনিবার এমন কাজ করছে যা করা বিধান সঙ্গত নয়।

"কিন্তু যীশু তাঁদের বলেন, ডেভিড যখন ক্ষুধার্ত হয়েছিলেন তিনি এবং তাঁর সঙ্গীরা কি করেছিলেন তা কি তোমরা পড়নি?

"তিনি কি মন্দিরে প্রবেশ করে পবিত্র রুটি খাননি যা তাঁর বা তাঁর সঙ্গীদের পক্ষে বিধান সঙ্গত ছিল না? একমাত্র পুরোহিতদেরই তো সেই অধিকার রয়েছে।

"বা তোমরা কি আইন পুস্তকে পড়নি যে পুরোহিতরা শনিবারের পবিত্র বিধান লঙ্ঘন করেও কি করে নির্দোষ থাকবে?

আসল সত্য হলো আইন ও শৃঙ্খলা মানুষের জন্য, মানুষ আইন ও শৃঙ্খলার জন্য নয়। জাতীয়তার বিকাশ এক পবিত্র কর্ত্তব্য। এবং সেই কর্ত্তব্যে যা কিছু বাধা ঘটাবে তাকে জাতীয়তার গতিবেগ

ও শক্তি দিয়ে দৃঢ় করতেই হবে। অতএব সেই কর্ত্তব্যে বাধা ঘটাবার জন্য আপনি যদি কোন নীতি চাপিয়ে দেন তাহলে সেই নীতিকে অবশ্যই যেতে হবে। আপনি যদি আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা ও রক্ষার জন্য আইন ও শৃঙ্খলা নীতির সাহায্য নেন তাহলে সকল আইনানুগত নাগরিকের সম্মান তা পেতে বাধ্য। কিন্তু আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা বা রক্ষার জন্য সে নীতি গ্রহণ না করে বরং তা ধ্বংস ও আক্রমণ করার জন্যই তা প্রয়োগ করেন তাহলে তাকে সম্মান করার কোনরূপ বাধ্যবাধকতা আমাদের থাকবে না। কারণ কোন একটি উচ্চতর আইন, স্বাভাবিক আইন, ঈশ্বরের আইন আমাদের বাধ্য করবে তাকে বাধা দিতে। যখনই দেখি আইন ও শৃঙ্খলার পবিত্র নামে এমন একটা কিছু পেশ করা হচ্ছে যা জাতির বৃদ্ধি, উন্নয়ন ও আত্ম উপলব্ধিতে বাধা দিচ্ছে তখনই বিনা দ্বিধায় আমি ঘোষণা করি যে, এই আইন ও শৃঙ্খলা মানুষের শ্লীলতাহানিকর এবং ঈশ্বরের অপমান।

আমার নরমপন্থী বন্ধুগণ আইন ও শৃঙ্খলার যুদ্ধনাদে প্রতারিত হলেও আমি তা শুনে আনন্দ পাই। এর অর্থ হলো আমলাতন্ত্র বিপদাপন্ন এবং তাঁরা সে বিপদ উপলব্ধি করেছেন। বিনা কারণে একটা মিথ্যা বিষয়কে তুলে ধরা হয় না। আর মিথ্যা বিষয়কে তুলে ধরলেই আমার অন্তরে আশা ও সাহস জাগে। আমি স্বদেশবাসীকে বলি ধৈর্য্য ধর আর দাবীর জন্য চাপ দাও। আইন ও শৃঙ্খলার বিপদজ্ঞাপক ঘণ্টা বাজান হলেও স্বাধীনতা এগিয়ে আসে। সারা বিশ্বে আমলাতন্ত্রের এই হলো ইতিহাস।

ইতিমধ্যে আমাদের কর্ত্তব্য হবে আমাদের আদর্শ অক্ষুন্ন রাখা। আমাদের কোনমতে ভুললে চলবে না যে আমরা এক বিরাট সন্ধিক্ষণে এসে দাঁড়িয়েছি, আমাদের চারিদিকে বিশ্বের শক্তিগুলি কাজ করছে আর স্বাধীনতা সংগ্রামে জয়লাভ এখনও বাকী।

তাহলে আমাদের সামনে কোন আদর্শ আমরা রাখব ? সর্বপ্রথম আদর্শ হল জাতীয়তাবাদ। এখন, জাতীয়তাবাদ কি ? আমার ধারণায় জাতীয়তাবাদ হল এমন এক পদ্ধতি যার মাধ্যমে কোন জাতি নিজেকে প্রকাশ করে, নিজেকে খুঁজে পায়। এবং তা সম্ভব হয় অন্যান্য জাতি থেকে বিচ্ছিন্ন থেকে নয়, অন্যান্য জাতির সঙ্গে বিরোধ করেও নয়। বরং একটা বিরাট পরিকল্পনার অংশ স্বরূপ যার ফলে নিজেকে প্রকাশ ও নিজেকে খুঁজে পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য জাতির আত্ম-প্রকাশ ও আত্মোপলব্ধিতে সে সহায়তা করে। বৈচিত্র্য ঐক্যের মতই বাস্তব সত্য। বিশ্ব ঐক্য প্রতিষ্ঠার জন্য প্রত্যেক জাতির পক্ষে নিজের পথে এগিয়ে গিয়ে আত্মপ্রকাশ ও আত্মোপলব্ধি চরিতার্থ করা অত্যাবশ্যক। আমি যে জাতীয়তার কথা বলছি তার সঙ্গে ইউরোপের বর্তমান জাতীয়তাবোধের মিল আছে, এমন ভুল আপনারা করবেন না। ইউরোপের জাতীয়তাবাদ এক আক্রমণাত্মক জাতীয়তাবাদ, স্বার্থপর জাতীয়তাবাদ, লাভ ক্ষতির বাণিজ্যিক জাতীয়তাবাদ। ফ্রান্সের লাভ, জার্মানীর ক্ষতি ; আবার জার্মানীর লাভ, ফ্রান্সের ক্ষতি। অতএব জার্মানীকে ঘৃণা করে ফরাসী জাতীয়তাবাদ পুষ্ট হয় আবার ফ্রান্সকে ঘৃণা করেই জার্মান জাতীয়তাবাদের পুষ্টি। সেখানে এখনও এ উপলব্ধি আসেনি যে মানবিকতাকে আঘাত ও তার ফলে ফ্রান্সকে আঘাত না করে জার্মানীকে আঘাত করা যায় না ; তেমনি মানবিকতার ওপর আঘাত হেনে এবং তার ফলে জার্মানীকে আঘাত না করে ফ্রান্সকেও আঘাত করা যায় না। এই হল ইউরোপীয় জাতীয়তাবাদ ; আমি এই জাতীয়তাবাদের কথা আজ আপনাদের বলছি না। আমি মনে করি যে প্রত্যেক জাতি বিরাট ঐক্যের একটি বিশেষ প্রবাহ কিন্তু কোন জাতি যোগ্যতা অর্জন এবং সেই সঙ্গে মানবিকতার সঙ্গে আপন সাদৃশ্য না খুঁজে পাওয়া পর্য্যন্ত কখনই চরিতার্থতা লাভ করতে পারে না। অতএব জাতীয়তার আসল সমস্যা হল সেই নির্দিষ্ট প্রবাহ খুঁজে বের করা এবং নিয়তির সম্মুখীন হওয়া। আপনারা

যদি সেই প্রবাহ খুঁজে পান এবং অতীতের সঙ্গে অবিচ্ছিন্ন যোগ সাধনে সক্ষম হন তাহলে আত্ম-প্রকাশের পালা শুরু হয়েছে এবং কোন কিছুই জাতীয়তার বিকাশে বাধা দিতে পারবে না।

ভারতের ইতিহাসের পাতায় পাতায় একটা মহান উদ্দেশ্যকে ধীরে ধীরে বিকশিত হতে দেখি। এই বিরাট দেশের ওপর দিয়ে আন্দোলনের ঝড় বয়ে গিয়েছে। আপাত দৃষ্টিতে শত্রুভাবাপন্ন শক্তি সৃষ্টি করলেও প্রকৃতপক্ষে তা প্রাণশক্তির সঞ্চার ও জনগণের জীবন গড়েছে এক মহান জাতিরূপে। আর্য্য ও অনার্য্যের সংমিশ্রণ যদি ঘটে থাকে, তা হয়েছে এক জাতি গঠনের উদ্দেশ্যে। ব্রাহ্মণ্য-বাদের মহান কৃষ্টি ভারতকে একসূত্রে গ্রথিত করতে সক্ষম হয় এবং প্রকৃতপক্ষে তা ছিল ঐক্য বিধানের প্রচণ্ড শক্তি। বৌদ্ধধর্ম ব্রাহ্মণ্য শক্তির প্রতিবাদ করলেও একই বিরাট ঐতিহাসিক উদ্দেশ্য মিটিয়েছে। মগধ থেকে তক্ষশীলা পর্য্যন্ত বিস্তৃত বিরাট বৌদ্ধ সাম্রাজ্য শুধু যে ভারতীয় ঐক্যের বনিয়াদ বিস্তৃততর করেছিল তা নয়, হিমালয়ের ওপরে, সমুদ্রের ওধারে সৃষ্টি করেছিল বৃহত্তর ভারত—যার গুরুত্ব হয়ত কম নয় - যার ফলে এই পবিত্র সহর--- যেখানে আমরা মিলিত হয়েছি—এশিয়ার বিভিন্ন জাতির লক্ষ লক্ষ লোকের কাছে তীর্থস্থান হয়ে উঠেছে। তারপর এল বিভিন্ন জাতীয় মুসলমান—কিন্তু তাঁদের সংস্কৃতি এক এবং সেই একই সংস্কৃতির উত্তরাধিকারী তাঁরা। কিছুকাল মনে হয়েছিল তাঁরা এসেছেন ভাঙ্গার জন্য, ভারতীয় জাতীয়তাবাদের শত্রু। কিন্তু মুসলমানগণ ভারতে তাঁদের ঘর বাঁধলেন এবং ভারতীয় জীবনে নতুন দৃষ্টিভঙ্গী ও চমৎকার প্রাণশক্তির সঞ্চার করেন। অসীম বিজ্ঞতার সঙ্গে পল্লী—যা হল প্রকৃত ভারত—জীবনযাত্রায় হস্তক্ষেপ করেন নি। এই নতুন দৃষ্টিভঙ্গী ভারতের প্রয়োজন ছিল। দুটি শাখা নদী যদি মিলে থাকে, তা শুধু নিজেদের পরিপূর্ণতার ও ভারতীয় ইতিহাসের নিয়তির সম্মুখীন হওয়ার জন্য। তারপর এল ইংরেজ তাদের

বিদেশী কৃষ্টি, বিদেশী পদ্ধতি নিয়ে। তারা ভারতের ক্রমবর্দ্ধমান জাতীয়তাবোধের ওপর রূঢ় আঘাত হানল কিন্তু সেই আঘাত ঐক্য বিধায়ক পদ্ধতিগুলিকে সফল করেছে, ইতিহাসের উদ্দেশ্য পূর্ণ করেছে। মহান ভারতীয় জাতীয়তা এখন আমাদের দৃষ্টিপথে। ইতিমধ্যে সে হাত বাড়িয়েছে হিমালয়ের ওপরে শুধু এশিয়ায় নয়, সারা বিশ্বে—আক্রমণাত্মক মনোভাব নিয়ে নয়, নিজের স্বীকৃতি দাবী করে, নিজস্ব অবদানের প্রতিশ্রুতি নিয়ে। আমি জোরের সঙ্গে বলতে চাই, জাতীয়তার আদর্শ ও বিশ্বশান্তির মধ্যে কোন শক্রতা নেই। বিশ্বশান্তি বিধানের একমাত্র পদ্ধতি হল জাতীয়তাবাদ। জাতীয়তার বিকাশের জন্য যেমন ব্যক্তির পূর্ণ ও অবাধ বিকাশ প্রয়োজন তেমনি বিশ্বশান্তির জন্য পূর্ণ ও অবাধ জাতীয়তা বিকাশের প্রয়োজন। ইউরোপের আক্রমণাত্মক জাতীয়তাবাদই বিশ্বশান্তির অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু কোন জাতির পক্ষে নিজের ক্ষতি না করে অন্য জাতির ক্ষতি করা সম্ভব নয়, এ সত্য একবার উপলব্ধি হলেই মানবিকতার সমস্যার সমাধান ঘটবে। মানবিকতার যাতে বিকাশ ঘটে, আত্মপ্রকাশ ও আত্মোপলব্ধি তা করতে পারে সেজন্য প্রত্যেক জাতির উন্নয়ন, আত্মপ্রকাশ ও আত্মোপলব্ধি প্রয়োজন, এই হল জাতীয়তাবাদের মূল সত্য। আমার বিশ্বাস, জাতীয়তাবাদের এই সত্য স্থায়ী হবে—যদিও জাতিগুলি আসল বিষয় ভুলে গিয়ে পরস্পরের সঙ্গে ঝগড়া করছে। আমার যদি ভুল না হয়ে থাকে তাহলে স্বার্থপরতা ও আত্মরক্ষার অনুভূতিই শেষ পর্য্যন্ত এই সমস্যার সমাধান ঘটাবে। বর্তমানের সঙ্কীর্ণ ও ভ্রান্ত স্বার্থপরতা নয়, কিন্তু এমন স্বার্থপরতা যা মনন সমৃদ্ধ ও বিশিষ্ট মনোভাবের দ্বারা রূপান্তরিত হয়ে বিশ্বব্যাপ্ত হয়ে পড়েছে, এমন স্বার্থপরতা যা বিশ্বের বিভিন্ন জাতিকে শেখাবে যে, প্রতিবেশীকে দাবাবার প্রয়াসের মধ্যে নিজের ধ্বংস ও দমনের বীজ থাকে।

অতএব আমাদের মধ্যে জাতীয়তার মনোভাব বৃদ্ধি করতে হবে।

স্বরাজের পথেই ভারতীয় জাতির প্রকৃত উন্নয়ন রয়েছে। প্রায়ই প্রশ্ন করা হয়, স্বরাজ কি? স্বরাজের সংজ্ঞা নিরূপণ করা যায় না এবং তা কোন শাসনব্যবস্থা বলে মনে করা ভুল হবে। বিশ্বে সাম্রাজ্য ও স্বরাজ শব্দ দুটির মধ্যে বিরাট পার্থক্য রয়েছে। জাতীয় মনের স্বাভাবিক প্রকাশ হল স্বরাজ। মনের সেই বাহ্যিক প্রকাশের আওতায় পড়ে—পড়া নিশ্চয়ই উচিত—একটা জাতির পূর্ণ জীবন-ইতিহাস। তবু এ কথা সত্য যে জাতির প্রকৃত উন্নয়ন শুরু হলেই, স্বরাজ শুরু হয়। কারণ, আগেই বলেছি, স্বরাজ হল জাতির মনের স্বাভাবিক প্রকাশ। অতএব অন্য দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে জাতীয়তার প্রশ্ন স্বরাজেরই প্রশ্ন। আজ ভারতে সকল প্রশ্নের ঊর্ধ্বে যে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে তা হল স্বরাজের প্রশ্ন।

এখন পদ্ধতি সম্বন্ধে বলব। আমি আবার বলছি, যে শাসন ব্যবস্থা—যা প্রকৃতপক্ষে স্বরাজের ভিত্তি হতে পারে—অর্জনের জন্য আমরা চেষ্টা করছি তা একমাত্র যে অহিংস অসহযোগের মাধ্যমে পাওয়া যায় তা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়েছে। অসহযোগিতার দর্শন সম্বন্ধে আলোচনার আদৌ কোন প্রয়োজনীয়তা নেই। যে সব বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে প্রশ্নটি বিবেচনা করা যায় আমি শুধু সেগুলির উল্লেখ করব। জাতীয় দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে অসহযোগ হল, জাতির নিজের শক্তি সংহত ও নিজের পায়ে দাঁড়াবার প্রয়াস। নৈতিক দৃষ্টিকোণ অনুসারে অসহযোগ হল আত্মশুদ্ধি ও জাতির বিকাশ তথা মানবিকতার কল্যাণের পক্ষে ক্ষতিকর কিছু থেকে সরে দাঁড়াবার পদ্ধতি। আধ্যাত্মিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে স্বরাজের অর্থ হল সেই বিচ্ছিন্নতা সাধনার ভাষায় যাকে বলা হয় 'প্রত্যাহার', স্বরাজ হল, আমাদের প্রকৃতি বহির্ভূত সমস্ত শক্তি থেকে সরে দাঁড়ান। এই বিচ্ছিন্নতা, এই সরে আসার প্রয়োজনীয়তা আছে—এইভাবেই আমাদের গোপন গর্ভ থেকে জাতির আত্মা বেরিয়ে আসবে দীপ্ত গৌরবে। এ প্রসঙ্গে

বেশী কিছু বলতে চাই না। কিন্তু ধারণাযোগ্য সকল দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে অহিংস অসহযোগ স্বরাজের পথে চলার প্রকৃত পদ্ধতি তা স্বীকার করতেই হবে।

তবে কেউ কেউ অহিংসা নীতির সার্থকতা সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। আমি একথা অস্বীকার করতে পারি না যে, দেশের ভেতরে ও বাইরে একদল ভারতীয় আছেন যাঁদের মতে অহিংসা হল কল্পনার বস্তু এবং তার বাস্তব রূপায়ণ সম্ভব নয়। তাঁদের মতে স্বরাজ লাভের একমাত্র উপায় হল শক্তি ও হিংসা প্রয়োগ। যাঁরা এই মতে বিশ্বাস করেন তাঁদের সাহস, স্বার্থত্যাগ ও দেশপ্রেম সম্বন্ধে কখনই আমি প্রশ্ন করি না। আমি জানি, তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ তাঁদের আদর্শের জন্য নির্য্যাতন সহ্য করেছেন। কিন্তু নীতির কথা ছেড়ে দিলে ইতিহাস বারবার শক্তি ও হিংসার মাধ্যমে বিপ্লবের চূড়ান্ত ব্যর্থতা প্রমাণ করে দিয়েছে। যাঁরা নীতিগতভাবে অহিংসা গ্রহণ করেছেন আমি তাঁদেরই একজন। এবার দ্রুততার প্রশ্নটি বিবেচনা করা যাক। হিংসাত্মক পদ্ধতিতে স্বরাজ লাভ কি সম্ভব? ইতিহাস তার উত্তরে সজোরে জানিয়েছে, 'না'। বিশ্বের জোরালো বিপ্লবগুলির দিকে তাকান।

ফরাসী বিপ্লবের ইতিহাস, প্রথম দিকে রাজা ও সম্ভ্রান্ত শ্রেণীর সঙ্গে প্রতিনিধিমূলক বিধান পরিষদ ও সশস্ত্র প্যারিসের সংগ্রামের ইতিহাস। দু পক্ষই হিংসা অবলম্বন করে। একদল নেয় বেয়নেট, অন্যদল বর্শা। বর্শা জিতল কারণ বেয়নেট ছিল অনিশ্চিত হাতে। তারপর, হিংসার মাধ্যমে জয়লাভ ঘটলে যা হয়, তাই হল। জনপ্রিয় দল দুভাগে ভাগ হয়ে গেল—জিরোনডিন ও জ্যাকোবিন। আবার শক্তি প্রয়োগের পালা। জিরোনডিনেরা প্রদেশগুলিকে সশস্ত্র বিদ্রোহের আহ্বান জানাল, আর জ্যাকোবিনেরা প্যারিসকে। প্যারিস নিকটবর্তী ও অধিকতর শক্তিশালী হওয়ার ফলে জিরোন-

ডিনেরা পরাজিত হল এবং তাদের গিলোটিন করা হয়। জ্যাকোবিনেরা ক্ষমতা দখল করল। কিন্তু তাদের মধ্যে আত্মকলহ শুরু হতে বেশী সময় লাগেনি। প্রথমে রোবস্‌পিয়ের ও দাঁতন হারবার্ট ও শ্যমেতেকে গিলোটিন করলেন। তারপর দাঁতনের পালা। শেষে রোবস্‌পিয়েরকে গিলোটিন করলেন কোলোট, বিলাওড ও তালিয়ে। আবার অন্যেরা এসে এঁদের নির্বাসিত করেন সুদূর দক্ষিণ আমেরিকায়। জিরোডিন ও জ্যাকোবিনদের মধ্যে সামান্য মতভেদ থাকলেও, জ্যাকোবিনদের বিভিন্ন শাখার মধ্যে আদৌ কোন মতানৈক্য ছিল না। ওদের একমাত্র প্রশ্ন ছিল, কোন শাখা ফ্রান্স শাসন করবে? শক্তি, বৃহত্তর শক্তির কাছে নতি স্বীকার করেছে এবং শেষে নেপোলিয়নের আমলে ফ্রান্স আবার চতুর্দশ লুইয়ের অনুরূপ বা হয়ত তা থেকেও খারাপ স্বৈরতন্ত্র ভোগ করল। আর স্বাধীনতা সম্বন্ধে বলা যায়, চতুর্দশ বা পঞ্চদশ লুইয়ের আমলে ফ্রান্স যে স্বাধীনতা ভোগ করছিল তা থেকে বেশী স্বাধীনতা দুর্দ্ধর্য জন নিরাপত্তা কমিটি ও নেপোলিয়নের কাছ থেকে পায়নি। প্রেইরিয়ালের আইন নিঃসন্দেহে লেটার্স দ্য ক্যাচে থেকে জঘন্যতর ছিল। আর জনগণ? পণ্ট অ স্যাঞ্জে, প্লাসে দ্য গ্রীভ, কারখানার শেডে মার্সিয়ার শ্রমিকদের খেতে দেখেছিলেন। প্রত্যেকের দৈনিক রুটির বরাদ্দ কমতে কমতে দেড় আউন্সে দাঁড়িয়েছে। "প্রত্যেক প্লেটে তিনটি ঝলসান হেরিং মাছ, সামান্য ভিনিগারে ভেজা পেঁয়াজের কুচি ছড়ান; সেই সঙ্গে কিছুটা সেদ্ধ খেজুর এবং এক বাটি জলের মধ্যে কয়েক দানা মুসুর ডাল ভাসছে। এই সামান্য খাদ্য খাচ্ছে একশ করে লোক। রুটি নেই সঙ্গে, এই সামান্য খোরাক তাদের তীব্র ক্ষিদে ও পেটের তুলনায় অত্যন্ত কম।" কার্লাইল গম্ভীর হয়ে বলেছিলেন, "সেইন নদীর প্রচুর জল সেই ঘাটতি মেটাবে।" এ প্রসঙ্গে কারলাইলের অবিস্মরণীয় আর্ত্ত চীৎকার— "হায় পরিশ্রমী মানুষ, দীর্ঘ ছবছর ধরে বিদ্রোহ ও আবর্ত্তের মধ্যে দিয়ে সাহসের সঙ্গে সংগ্রাম করে তাহলে তোমার কিছুই লাভ

হয়নি। ঈশ্বরের মহিমাময় সোণালী রক্তিম সন্ধ্যায় তুমি শুধু হেরিং মাছ আর জল খাচ্ছ। মানুষের সঙ্গে মানুষের ব্যবহারের ফলে এই পৃথিবী যদি অভাবের, অশ্রুর—তাও কোমল অশ্রু নয়—অশ্রুর উপত্যকায় পরিণত হয় তাহলে পৃথিবী ঊষা ও গোধূলির রক্তিম আভায় এত সুন্দর হলো কেন? ব্যষ্টিল ধ্বংস, ব্রান্সউইকদের বিতাড়ন পৃথিবী ও নরকের ছোট বড় সকল ক্ষমতার সম্মুখীন হয়েছে সাহসের সঙ্গে এবং অনেক সহ্য করছে তা কি শুধু এই বৈঠকখানার প্রজাতন্ত্রের জন্য! সামন্ততান্ত্রিক অভিজাত সম্প্রদায় প্রবলবেগে মিলিয়ে গেছে এবং এখন স্বাভাবিক গতিতে টাকার থলের আভিজাত্য এসে পৌঁছেছে। বর্ত্তমান মুহূর্ত্তে সমস্ত ইউরোপীয় সমাজ এই পথে চলেছে। স্পষ্টতই এ আভিজাত্য আরও নিম্ন প্রকৃতির। শতগুণে নিম্নতর মানের—এ পর্য্যন্ত নিম্নতম পর্য্যায়ের আভিজাত্য হল তা।" আজও ফ্রান্স স্বরাজের দিকে ক্লান্ত পায়ে টেনে টেনে এগিয়ে চলেছে।

ইংলণ্ডের ইতিহাস সেই একই সত্য প্রমাণ করে। ১২১৫ সালে ব্যরনদের বিদ্রোহ রাজার হাত থেকে ক্ষমতা কেড়ে নিয়েছিল বা নিতে চেয়েছিল। কিন্তু ক্ষমতা গিয়ে পড়লো অভিজাত সম্প্রদায়ের হাতে আর ব্যরনদের এই জয়ের কোন অংশই পেল না গণতন্ত্র। অতএব, জনৈক ঐতিহাসিকের মতে সেই মহান সনদ স্বাধীনতার সনদ না হয়ে কতগুলি খেয়াল খুশীর সনদ হয়ে দাঁড়ালো। প্রথম চার্লসের রাজত্বকালে বিদ্রোহের ফলে এমন একনায়কের সৃষ্টি হলো যিনি স্বাধীনতা দমন করলেন। দীর্ঘ পার্লামেণ্ট যে কাজ সুরু করেছিল তা রাজার প্রাণদণ্ডের পর বিপ্লবের ফলে বাধা পায়। সেই কাজ শেষ করার জন্য প্রয়োজন হয় আর এক বিপ্লবের—এবার রক্তপাত-হীন বিপ্লব। সে কাজ যে এখনও শেষ হয়েছে তা মানতে আমি রাজী নই। অবিরাম শ্রেণী সংঘর্ষ ও অর্থনৈতিক অবিচার কখনই সেই স্বাধীনতার পরিচায়ক নয় যা ইংলণ্ড দাবী করেছিল। আমি

আবার বলছি, কোন জাতিই শক্তিপ্রয়োগ ও হিংসার মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জনে সফল হয়নি। আসল তত্ত্ব হলো, ক্ষমতার প্রতি মোহ অলজ্ঘনীয় এবং যাঁরা সেই ক্ষমতা হিংসার মাধ্যমে অর্জন করেন তাঁদের তা বজায় রাখার জন্য হিংসাই অবলম্বন করতে হয়। হিংসাকে যারা প্রয়োগ করে হিংসা তাদের নৈতিক অবনতি ঘটায়। একবার ক্ষমতা পাওয়ার পর তা ছেড়ে দেওয়া তাদের পক্ষে সহজ নয়। পূর্বসূরীদের ক্ষমতা নিজেদের হাতে রেখে তাদের কাজ চালিয়ে যাওয়া ওদের পক্ষে সহজতর হয়। হিংসা প্রয়োগের সঙ্গে যে নৈতিক অবনতি অঙ্গাঙ্গী জড়িত তার স্থান অহিংসায় নেই। ইটালী ও রাশিয়ায় বিপ্লবগুলি সেই একই নীতির উদাহরণ। ম্যাজিনীর প্রেরণায় গ্যারিবল্ডী ও কাভূর ইটালীতে যে বিপ্লব এনেছিলেন তাতে স্বরাজলাভ হয়নি। ইটালী স্বাধীনতা এখনও সম্পূর্ণ রূপ লাভ করেনি এবং আজ সেখানে নরনারী আরেকটি বিপ্লবের প্রতীক্ষায় রয়েছে। এর পরিণামে যদি হিংসাত্মক যুদ্ধ বাধে তাহলে আবার এর উদ্দেশ্য ব্যর্থ হবে। তবে শেষ পর্য্যন্ত স্বাধীনতা ও অহিংসা জয়লাভ করবে।

রাশিয়ার বর্ত্তমান বিপ্লব খুবই চিত্তাকর্ষক সমীক্ষার বস্তু। রাশিয়ার অনিচ্ছুক প্রতিভার ওপর মার্কসীয় দর্শন ও বিশ্বাস জোর করে চাপিয়ে দেওয়ার প্রয়াসের ফলে সেই বিপ্লব বর্ত্তমান রূপ নিয়েছে। হিংসা আবার ব্যর্থ হবে। আমি যদি পরিস্থিতিটি সঠিক পর্য্যালোচনা করে থাকি তাহলে রাশিয়ায় প্রতিবিপ্লব ঘটবে। কার্ল মার্কসের সমাজতন্ত্র থেকে মুক্তি লাভের জন্য রাশিয়ার আত্মা সংগ্রাম করবে। হয়তো এক স্বাধীন আন্দোলন ঘটবে। হয়তো বা বর্ত্তমান আন্দোলনের মধ্যেই সেই স্বাধীনতা অর্জনের ক্ষমতা নিহিত রয়েছে। ইতিমধ্যে ভাগ্য দাঁড়িপাল্লায় থরথর করে কাঁপছে।

আমি বিপ্লবে বিশ্বাস করি কিন্তু আমি আবার বলছি,

হিংসা স্বাধীনতার পরাজয় সাধন করে। অহিংস বিপ্লবের গতি মন্দতর হলেও নিশ্চিততর বটে। ধীরে ধীরে জাতির আত্মা বিকশিত হয় আর পায়ে পায়ে জাতি এগিয়ে চলে স্বরাজের পথে। অন্তত ভারতের স্বাধীনতা লাভ করা যেতে পারে একমাত্র অহিংস অসহযোগিতার পদ্ধতি দ্বারা। যাঁরা মনে করেন এ পদ্ধতি বাস্তবে রূপায়িত করা সম্ভব নয় তাঁদের আকালী আন্দোলনের কথা চিন্তা করার জন্য অনুরোধ করছি। অমৃতসরে আহতদের দেখতে গিয়ে ওদের মুখে যখন শুনলাম যে ক্রোধোদ্রেকের প্রবল উত্তেজনা থাকা সত্বেও তাঁরা কেউই হিংসার বদলে হিংসা অবলম্বনের ইচ্ছা প্রকাশ করেন নি, মনে মনে বললাম, "এই ত হল অহিংসার জয়।"

অহিংসা অলস স্বপ্ন নয়। মহাত্মা গান্ধী শুধু শুধু বলেন নি, "তরবারি কোষবদ্ধ করো।" সত্যের পূজারী যাঁরা, তাঁরা অবশ্যই মহাত্মার কথা শুনবেন, যেমন অন্যেরা শুনেছিলেন আরও জোরালো স্বর দু হাজার বছর আগে।

এই পদ্ধতিতে স্বরাজ লাভের চেষ্টা করে ভারতীয় জাতিকে প্রচণ্ড দমনের সম্মুখীন হতে হল। আজ আমাদের সাফল্য ও ব্যর্থতা পরিমাপের দিন এসেছে। চণ্ডনীতি প্রসঙ্গে বলতে পারি, এ প্রশ্নের জবাব দেওয়া সহজ। এই আন্দোলনের আত্মা ধ্বংসের জন্য যে চণ্ডনীতির সূত্রপাত হয়েছিল ও অবিরাম চালিয়ে যাওয়া হয়েছে, জাতি তার ওপরে যে জয়ী হয়েছে সে বিষয়ে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই।

কিন্তু যে প্রশ্ন অনেকের মনে আলোড়ন সৃষ্টি করছে তা হল, আমরা কি অহিংস অসহযোগিতায় সাফল্য লাভ করেছি? দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি, এ প্রশ্নের পেছনে চিন্তা বিভ্রম অনেকটা রয়েছে। আন্দোলন হয় সফল হবে, নয়ত ব্যর্থ হবে, এটা ধরা হয়। অথচ

মানব আন্দোলনের—আমি খাঁটি আন্দোলনের কথা বলছি—প্রকৃত সত্য হল, তা কখনই পূরোপূরি সফল বা বিফল হয় না। প্রত্যেক প্রকৃত আন্দোলন শুরু হয় এক আদর্শ নিয়ে, আর আদর্শ সব সময়েই কৃতিত্বের চেয়ে মহান। ফরাসী বিপ্লবের কথা ধরুন। তা কি সফল হয়েছিল? তা কি ব্যর্থ হয়েছিল? এর কোনটি ঘোষণা করা মারাত্মক ঐতিহাসিক ভুল হবে। ভারতে অসহযোগ আন্দোলন কি সার্থক হয়েছে? হাঁ। যখন দেখি এই বিরাট দেশের সর্বত্র স্বরাজ চেতনা এই আন্দোলন জাগিয়েছে, এর বিরাট সাফল্যে তখন আর কোন সন্দেহে থাকে না। এ জাগরণের বাস্তব ফলের—দেশের মুক্তহস্তে অর্থদান, ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি ও বিলিতি কাপড় বর্জন—কথা চিন্তা করলেই এই আন্দোলনের সাফল্য উপলব্ধি করা যায়। আমি আর এক ধাপ এগিয়ে বলতে পারি, এই আন্দোলনের বাস্তব সফলতার আরও নিদর্শন হল সারা দেশে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, আদালত ও সংশোধিত পরিষদগুলির বেইজ্জতি। আমাদের স্বদেশবাসীদের দুর্বলতার জন্যই সেগুলি এখনও চালু আছে। এই প্রতিষ্ঠানগুলির অবসান ঘটাবার দৃঢ় সঙ্কল্প দেশ ইতিমধ্যে ঘোষণা করেছে। তবে একথা অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে আর এক দৃষ্টিকোণ—যখন আমরা গাণিতিক মনোভাব নিয়ে আমাদের সাফল্য পরিমাপ করছি—থেকে বিচার করলে আমাদের সামনে এসে দাঁড়ায় এক নিদারুণ সত্য, "অল্প হয়েছে, অনেক কিছু বাকী"। এখনও অনেক কিছু করতে হবে। অহিংসাকে আরও দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত এবং তার ক্ষেত্র বিস্তৃত করতে হবে। আমরা দৃঢ়তা অবলম্বন করব কিন্তু আমাদের কাজ ন্যায়সঙ্গত হবে। স্বার্থত্যাগের মনোভাব আরও শক্তিশালী করতে হবে আর আগের তুলনায় ভাঙ্গাগড়ার কাজ আরও জোরে চালিয়ে যেতে হবে। আমি সমালোচকদের বলি, স্বীকার করি নানা ক্ষেত্রে আমরা বিফল হয়েছি কিন্তু যেসব ক্ষেত্রে আমরা সাফল্য অর্জন করেছি সেখানে আমাদের সফলতা আপনারা কি স্বীকার করবেন না?

নরমপন্থীরা আমাদের দোষ দেন দেশের তরুণদের নষ্ট করার জন্য। বলা হয়, আমরা পুত্রদের পিতার অবাধ্য হতে, ছাত্রদের শিক্ষকের অবাধ্য হতে এবং প্রজাদের সরকারের অবাধ্য হতে শিখিয়েছি। আমরা দোষ স্বীকার করছি। আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য প্রত্যেক আধ্যাত্মিক আন্দোলনকে যুক্তি হিসেবে তুলে ধরতে পারি। স্বয়ং যীশুখৃষ্টের বিচার হয়েছিল জনগণকে নষ্ট করার অভিযোগে। তিনি যে উত্তর দিয়েছিলেন তা যেমন জোরালো তেমনি শিক্ষামূলক—

"মনে করো না যে, আমি পৃথিবীতে শান্তি দিতে এসেছি; আমি শান্তি নয়, তরবারি দিতে এসেছি।

"কারণ আমি এসেছি পিতা ও পুত্রের মধ্যে, মাতা ও কন্যার মধ্যে, শ্বশ্রূ ও বধূর মধ্যে বিরোধ সৃষ্টির জন্য।"

বলা হয়, মুখে প্রেমের বাণী নিয়ে আমরা আসলে ঘৃণার বাণী প্রচার করছি। এরকম জঘন্য মিথ্যা এর আগে উচ্চারিত হয় নি। আমরা হয়ত ভালবাসতে পারি নি, আমরা হয়ত নিজেদের হারিয়েছি—কেউ কেউ ঘৃণায়—কিন্তু তা শুধু আমাদের দুর্বলতা ও অসম্পূর্ণতা প্রমাণ করে। আমরা যা করেছি তা দেখে নয়, আমাদের আদর্শ দেখে আমাদের বিচার করুন। যেখানেই আমরা আদর্শচ্যুত হয়েছি সেটাই আমাদের দুর্বলতা বলে গণ্য করুন। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের পক্ষ থেকে আমি ভণ্ডামির অভিযোগ অস্বী র করছি। যাঁরা আমাদের ত্রুটি সম্বন্ধে সদা উদগ্রীব তাঁদের কাছে আমার বিনীত নিবেদন, "বন্ধুগণ, আমরা যদি দুর্বল হয়ে থাকি, আপনারা আমাদের সঙ্গে যোগ দিয়ে শক্তিশালী করে তুলুন। নেতারা যদি অকেজো হয়ে থাকেন, এগিয়ে এসে আমাদের নেতৃত্ব করুন, নেতারা সরে দাঁড়াবেন। আপনারা যদি আদর্শে

বিশ্বাস না করেন, তাহলে শুধু শুধু আদর্শের কথা তুলে সব সময় আমাদের সমালোচনা করেন কেন? আমরা কতটা আদর্শচ্যুত হয়েছি তা জানাবার জন্য কোন সমালোচকের প্রয়োজন নেই। যেদিকে আমি তাকিয়েছি সেখানেই দুর্বলতার প্রমাণ পেয়েছি; কিন্তু আমাদের মানবিক দুর্বলতার ত্রুটি, আমাদের অসম্পূর্ণতা সত্বেও আমি সাহসের সঙ্গে বলতে পারি যে আমাদের জয়লাভ সুনিশ্চিত এবং আমলাতন্ত্র জানে যে আমাদের জয়লাভ সুনিশ্চিত।

অহিংস অসহযোগ পদ্ধতি নিশ্চিত ফলপ্রসূ হলেও আমাদের দেখতে হবে দেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে তার কিভাবে সুষ্ঠু প্রয়োগ করা যায়। যাঁরা মনে করেন দেশের আত্মা মৃত এবং অহিংস অসহযোগ আর .ম্ভব নয়, আমি তাঁদের সঙ্গে একমত নই। এ বিষয়টি সম্বন্ধে আমি গভীর চিন্তা করেছি, আমি পরিষ্কার জানাতে চাই, সন্দেহ বা হতাশার ভাব মনে আনার আদৌ কোন কারণ ঘটেনি। আজ জনগণকে বাইরে থেকে দেখলে তাদের সঠিক পরিচয় পাওয়া শক্ত। তাদের দেখলে মনে হয় ক্লান্ত এবং ক্লান্তিবোধ আংশিকভাবে তাদের ঘিরে ধরেছে। কিন্তু এই বাহ্যিক স্তব্ধতার নিচে দেখা যাবে জাতির প্রাণ আন্দোলন সুরু হওয়ার সময়ের মতই সজোরে ও আশার সঙ্গে স্পন্দিত হচ্ছে। জাতির শক্তিকে সংহত করতে হবে। তাদের শক্তি উদ্দীপিত করার জন্য আমাদের একটি কর্মসূচী স্থির করতে হবে যাতে স্বরাজের পথে আমাদের যাত্রা ত্বরান্বিত হয়। আমি কার্য্যসূচীর—যা আমার মতে দেশের জন্য ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রস্তাব করা উচিত—বিষয়গুলি এবার পর পর বলছি।

স্বরাজ সরকারের অধীনে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের কি অধিকার থাকবে তার স্পষ্টতর ঘোষণা দিয়ে কংগ্রেসের বছরের কাজ

শুরু করা উচিত। হিন্দু ও মুসলমানদের প্রসঙ্গে বলতে পারি, লক্ষ্ণৌ চুক্তি আরও স্পষ্টভাবে ও দৃঢ়তার সঙ্গে সমর্থন করতে হবে। এবং সেই সঙ্গে প্রত্যেক সম্প্রদায়ের অধিকার আরও দৃঢ়তার সঙ্গে স্বীকার করতে এবং অন্যের অনুকূলে প্রত্যেক স্বার্থত্যাগের জন্য প্রস্তুত হতে হবে। বিষয়টি পরিষ্কার করার জন্য একটা উদাহরণ দিচ্ছি। প্রত্যেক ভক্ত মুসলমান মসজিদের সামনে কোন গীতবাদ্য পছন্দ করেন না, এবং প্রত্যেক ধর্মপ্রাণ গোঁড়া হিন্দু গো-হত্যায় আপত্তি প্রকাশ করেন। ভারতের হিন্দু ও মুসলমানেরা কি এমন এক পবিত্র চুক্তি করতে পারেন না যাতে মসজিদের সামনে গীতবাদ্য হবে না এবং কোন গোহত্যা হবে না? অন্যান্য উদাহরণও দেওয়া যেতে পারে। প্রত্যেক সম্প্রদায় যাতে কতগুলি কারণে স্বার্থত্যাগ করতে পারে সেজন্য একটি পরিকল্পনা রচনা করতে হবে যারফলে উভয় সম্প্রদায় কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে স্বরাজের পথে অগ্রসর হতে পারে। অন্যান্য সম্প্রদায় যেমন শিখ, খ্রীষ্টান ও পার্শীদের প্রসঙ্গে বলতে পারি, হিন্দু ও মুসলমানকে—যারা জনগণের মধ্যে গরিষ্ঠ সংখ্যক—প্রস্তুত থাকতে হবে স্বরাজ প্রশাসনে লঘিষ্ঠ সংখ্যক সম্প্রদায়কে তাদের আনুপাতিক হারের তুলনায় আরও বেশী অংশ দেবার জন্য। আমি প্রস্তাব করি, প্রত্যেক সংখ্যালঘুর দায়িত্ব স্পষ্ট স্বীকার করে নিয়ে—যাতে তাদের সকল সন্দেহের অবসান এবং বর্ত্তমানে তাদের মনে যে শঙ্কা দেখা দিয়েছে তা দূর হয়—এই সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে একটি প্রকৃত চুক্তি সম্পাদন করা কংগ্রেসের উচিত। আমার এ কথা না বললেও চলবে যে খ্রীষ্টান বলতে শুধু ভারতীয় নয়, ইঙ্গ-ভারতীয় ও অন্যান্য যারা ভারতে ঘর বেঁধেছেন তাদের সকলকেই বোঝায়। যে চুক্তির কথা আমি উল্লেখ করলাম তার প্রয়োজনীয়তা চিরকাল ছিল। কিন্তু বর্তমানে যে কাজ আমাকে করতে হবে তার পরিপ্রেক্ষিতে এই চুক্তি বিশেষ

প্রয়োজন।

আমি আরও মনে করি যে গত দুবছর ধরে বিচ্ছিন্ন থাকার যে নীতি আমরা অনুসরণ করেছিলাম তা এখন পরিত্যাগ করতে হবে। প্রত্যেক দেশেই বেশ কিছু সংখ্যক স্বাধীনতার নিঃস্বার্থ পূজারী আছেন যাঁরা প্রত্যেক দেশকে স্বাধীন দেখতে চান। তাদের সহযোগিতা ও সহানুভূতি না পেলে আর চলবে না। আমার মতে আমেরিকা ও ইউরোপের সমস্ত দেশে কংগ্রেসের সংস্থা প্রতিষ্ঠা করা উচিত। বিশ্ব আন্দোলনের সঙ্গে আমাদের সংযোগ এবং সারা বিশ্বের স্বাধীনতা প্রেমিকদের সঙ্গে আমাদের অবিরাম যোগাযোগ রাখতেই হবে।

এ থেকে আরও গুরুত্বপূর্ণ হল বৃহৎ এশীয় সংঘে – যা গঠিত হতে চলেছে, দেখতে পাচ্ছি – ভারতের অংশগ্রহণ। সর্ব-ইসলাম আন্দোলন কিছুটা সঙ্কীর্ণ ভিত্তিতে শুরু হলেও তা এশিয়ার সমস্ত মানুষের বৃহৎ সংঘ গঠনের জন্য পথ ছেড়ে দিয়েছে বা দিতে চলেছে সে বিষয়ে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। এ সংঘ এশিয়ার অত্যাচারিত জাতিগুলির সংঘ। ভারত কি এই সংঘের বাইরে থাকবে? স্বীকার করি, আমাদের স্বাধীনতা আমাদেরকেই অর্জন করতে হবে কিন্তু ভারত ও এশিয়ার বাকী অংশ, না ভারত ও বিশ্বের সমস্ত স্বাধীনতা অনুরাগী মানুষের মধ্যে এই ধরণের বন্ধুত্ব ও প্রেম, সহানুভূতি ও সহযোগিতার বন্ধন বিশ্ব শান্তি আনবেই। বিশ্ব শান্তি বলতে আমি বুঝি প্রত্যেক জাতির স্বাধীনতা। আর এক ধাপ এগিয়ে আমি বলতে পারি, অন্যান্য জাতি দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ থাকলে বিশ্বের কোন জাতিই প্রকৃত স্বাধীন থাকতে পারে না। যে নীতি আমরা এ পর্য্যন্ত অনুসরণ করে এসেছি তা আমাদের কাজের—যা করবার দায়িত্ব আমরা নিয়েছিলাম—

জন্য একান্ত প্রয়োজন ছিল এবং আমি সর্বান্তঃকরণে সেই নীতি সমর্থন করেছিলাম। স্বরাজলাভ বা এক বছরের মধ্যে স্বরাজ-লাভের নির্ভরযোগ্য ভিত্তি স্থাপনের আশাতেই এ ধরণের শক্তি সমাবেশের একান্ত প্রয়োজন হয়েছিল। আজ সেই কাজের জন্যই চাই উদারতর সহানুভূতি ও ব্যাপক দৃষ্টিভঙ্গী।

আমরা বিরাট পরিবর্তনের সন্ধিক্ষণে এসে দাঁড়িয়েছি, বিশ্বের শক্তিগুলি আজ আমাদের ওপর কাজ করছে। কামাল পাশার জয়লাভে এশিয়ার বন্ধন মুক্তি ঘটেছে এবং সারা মহাদেশে নতুন জীবন স্পন্দন দেখা দিয়েছে। প্রমিথিউস "তার অন্তরে বাণী" দিয়েছিলেন এবং তার চিন্তা "উপত্যকার বহু অরণ্যের মত যার মধ্য দিয়ে ঘূর্ণিঝড় ও বৃষ্টির তাণ্ডব বয়ে গেছে।" ইউরোপীয় প্রত্যেক দেশে জনগণের প্রকৃত স্বাধীনতার জন্য আন্দোলন, পরাধীন জাতিগুলির মনে এক আশ্চর্য্য পরিবর্তন এনে দিয়েছে। যা আগে একটা মোটামুটি আদর্শ ছিল আজ তা বাস্তব রাজনীতির আওতায় এসে পড়েছে। ভারতীয় জাতি তার প্রকৃত রূপ খুঁজে পেয়েছে। এই সময়ে আমাদের দাবী পুনর্বিবেচনা ও পুনরায় উত্থাপন করা উচিত। পাঞ্জাবের অন্যায় সম্বন্ধে আমাদের দাবী আবার পেশ করতে হবে কারণ তার অনেকগুলি মেটান হয়েছে। খিলাফৎ সম্বন্ধে আমাদের দাবী পুনরায় বিবেচনা করতে হবে কারণ তার কতগুলি ইতিমধ্যে মেটান হয়েছে এবং আমরা আশা করি লসান কমিশনের কাজ শেষ হওয়ার আগেই এ বিষয়ে আমাদের কোন দাবী অমীমাংসিত থাকবে না। স্বরাজের জন্য আমাদের দাবী আরও বস্তুনিষ্ঠভাবে আমাদের পেশ করতে হবে। স্বরাজের প্রকৃত ভিত্তি হতে পারে এমন সরকার রচনার স্পষ্ট পরিকল্পনা কংগ্রেসকে পেশ করতে হবে। এ পর্য্যন্ত আমরা এ ধরণের সরকারের কোন রূপরেখা দিই নি। সুপরামর্শ

অনুযায়ীই তা আমরা করি নি কারণ স্বরাজের মনস্তাত্ত্বিক দিকটার প্রতি আমরা সমস্ত নজর দিয়েছিলাম। কিন্তু আজ পরিস্থিতি বদলিয়েছে। স্বরাজের আকাঙ্খা আমাদের অধৈর্য্য করে তুলেছে। আমরা যে শাসন ব্যবস্থা দাবী করছি তার একটি স্পষ্ট পরিকল্পনা দেশের কাছে পেশ করা কংগ্রেসের কর্তব্য। আগেই বলেছি, স্বরাজের সংজ্ঞা নির্দেশ করা যায় না এবং কোন বিশেষ শাসন ব্যবস্থার সঙ্গে তাকে ভুল করলে চলবে না। তবু জাতির পূর্ণ মানসিক অভিব্যক্তির প্রয়োজন। এ ধরণের দাবী উত্থাপন আর বিলম্বিত করা যায় না। যদিও স্বরাজের পূর্ণ বাহ্যিক প্রকাশ বলতে জাতির সমগ্র জীবন ইতিহাস বোঝায়।

এই ধরণের শাসন ব্যবস্থার বিশদ পরিকল্পনা দান এ ভাষণের আওতায় পড়েনা তবে সেই শাসন ব্যবস্থার রূপ কেমন হবে সে সম্বন্ধে আমার মত না জানিয়ে পারছি না। যে সরকার জনগণের জন্য, জনগণের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত নয় তা কখনই স্বরাজের প্রকৃত ভিত্তি বলে বিবেচিত হতে পারে না। আমি এ বিষয়ে দৃঢ় নিশ্চিত যে সংশোধনীয় সরকার জনগণের জন্য ও জনগণের দ্বারা গঠিত নয়। আমাদের মধ্যে অনেকে বিশ্বাস করেন যে মধ্যবিত্ত শ্রেণী জনগণের জন্য স্বরাজ অর্জন করবে। কোন শ্রেণী আন্দোলনকে স্বরাজের আন্দোলনে কোনকালে পরিবর্তিত করার সম্ভাবনায় আমার আস্থা নেই। আজ যদি ব্রিটিশ পার্লামেন্ট দায়িত্বশীল কেন্দ্রীয় সরকার সহ প্রাদেশিক স্বায়ত্বশাসন মঞ্জুর করেন আমি অন্তত তার প্রতিবাদ করব। কারণ তারফলে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর হাতে সমস্ত ক্ষমতা গিয়ে পড়বে। মধ্যবিত্ত শ্রেণী সে ক্ষমতা যে পরে ছেড়ে দেবে তা আমি বিশ্বাস করি না। বর্তমানের সাদা আমলাতন্ত্রের বদলে ভারতীয় মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আমলাতন্ত্র যদি আত্মপ্রকাশ করে

তাতে ভারতের কি লাভ হবে? আমলাতন্ত্র হল আমলাতন্ত্রই এবং আমলাতন্ত্রের অস্তিত্বের সঙ্গে স্বরাজ ধারণার কোন সঙ্গতি নেই। যতক্ষণ না জনগণ স্বরাজ অর্জনে আমার সঙ্গে সহযোগিতা করছে স্বরাজ সম্বন্ধে আমার আদর্শ ততক্ষণ পূর্ণ হবে না। অন্য যে কোন প্রয়াস অনিবার্য্যভাবে সেই পরিণতি টেনে আনবে যাকে, ইউরোপীয় সমাজতাত্ত্বিকেরা বুর্জোয়া সরকার বলেন। ফ্রান্সে, ইংলণ্ডে এবং ইউরোপের অন্যান্য দেশে মধ্যবিত্ত শ্রেণী স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করেছিল এবং তারফলে ক্ষমতা এখনও তাদের হাতে। ক্ষমতা দখল করেছে বলে এখন তারা তা ত্যাগ করতে অনিচ্ছুক। আজ যদি সারা ইউরোপে প্রকৃত স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম লেগে থাকে তার কারণ হলো ইউরোপের জাতিগুলি শক্তি সঞ্চয় করেছে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর কাছ থেকে ক্ষমতা ছিনিয়ে নেওয়ার জন্য। ইউরোপীয় ইতিহাসের সেই অধ্যায়ের পুনরাবৃত্তি করতে আমি চাই না। বিশ্বের সামনে অহিংসার মাধ্যমে স্বরাজ এবং জনগণের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত স্বরাজের আলো দেখাবে ভারতবর্ষ।

আমার মতে, প্রাদেশিক স্বায়ত্বশাসন বা কেন্দ্রীয় দায়িত্ব থেকে অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ হলো ক্ষুদ্র স্থানীয় কেন্দ্রগুলির বাস্তব স্বায়ত্বশাসন ও পল্লী জীবন সংগঠন। এ দুয়ের মধ্যে আমাকে একটি বেছে নিতে বলা হলে আমি বিনা দ্বিধায় স্থানীয় কেন্দ্রগুলির স্বায়ত্বশাসন চাইব। তাবলে আপনারা যেন এ মনে করবেন না, আমি চাইছি পল্লী কেন্দ্রগুলি বিচ্ছিন্ন সংস্থা হোক। সহযোগিতা ও সংহতির মাধ্যমে তাদের মধ্যে যোগ সাধন করতে হবে। আপাতত প্রাদেশিক সরকারগুলি ও ভারত সরকারের হাতে ক্ষমতা থাকবে। কিন্তু এই আদর্শ চিরকালের জন্য গৃহীত হবে যে, প্রাদেশিক বা ভারত সরকারের কেন্দ্রীয় কর্তৃত্ব শুধু পরামর্শ দানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ

থাকবে। নিয়ন্ত্রণমূলক অবশিষ্ট ক্ষমতা তাদের থাকবে কিন্তু তা প্রয়োগ করা হবে প্রয়োজনবোধে ও যথেষ্ট রক্ষাকবচের ব্যবস্থা করার পর। আমি বলছি একমাত্র এই স্থানীয় কেন্দ্রগুলিকে শাসনের ক্ষমতা দিলেই প্রকৃত স্বরাজ লাভ সম্ভব। আমি প্রস্তাব করছি, জাতির অনুমোদনযোগ্য সরকারের পরিকল্পনা রচনার উদ্দেশ্যে একটি কমিটি গঠন করা কংগ্রেসের উচিত।

ইউরোপের সর্বোন্নত চিন্তাধারা মিথ্যা ব্যক্তিত্ববাদ—যা ইউরোপীয় কৃষ্টি ও প্রতিষ্ঠানসমূহের ভিত্তি—থেকে সরে এসে যেদিকে যাচ্ছে, তা হল ভারতে পল্লী সংগঠনের প্রাচীন আদর্শ। এই চিন্তাধারা অনুসারে ভোট বাক্স ও বিরাট জনতার আধুনিক গণতন্ত্র ব্যর্থ হয়েছে কিন্তু প্রকৃত গণতন্ত্র এখনও যাচাই করা হয় নি। আধুনিক ইউরোপীয় চিন্তাধারা অনুসারে প্রকৃত গণতন্ত্র কি ?

প্রকৃত গণতন্ত্রের ভিত্তি স্থাপিত হবে ক্ষুদ্র কেন্দ্রগুলির মধ্যে ; ক্রমে ক্রমে বিকেন্দ্রীকরণ—যাতে বোঝায় শক্তি আগে কেন্দ্রীভূত হয়েছিল—নয়, ক্ষুদ্র স্বাধীন কেন্দ্রগুলি ক্রমেক্রমে একত্রিত করে একটি জীবন্ত সুসমঞ্জস সামগ্রিক সত্তা গড়ে তোলা হবে। কোন যান্ত্রিক কৌশল নয়, মানব রাষ্ট্র চাই। আমরা প্রকৃত গতিশীল প্রতিষ্ঠান ও সংস্থার বৃদ্ধি চাই, কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্রের অধিকতর নিশ্চল স্থায়িত্ব চাই না।

ইউরোপীয় চিন্তাধারার সুর হেগেলের দর্শনে প্রকাশ পায়। তিনি বলেন, "মানব প্রতিষ্ঠান অনড় বাহ্য জগৎভুক্ত নয়, তা হল মন ও উদ্দেশ্যের জগতের এবং সেইজন্যই গতিশীল ও আত্মোন্নয়ন সাধক।"

ব্যক্তি থেকে "একীভূত রাষ্ট্র" যে প্রকৃত ও স্বাভাবিক বিকাশের

এক অবিরাম পদ্ধতি তা আধুনিক ইউরোপীয় চিন্তাধারা পরিষ্কার করে দিয়েছে। সার্বভৌমত্ব (স্বরাজ) হল এক আপেক্ষিক ধারণা। "ব্যষ্টি যে পরিমাণে নিজেকে বিকশিত, নিয়ন্ত্রিত ও নিজের বিভিন্ন প্রকৃতিকে একীভূত করতে পারে সেই পরিমাণে নিজের ওপর সে সার্বভৌমত্ব লাভ করে"—তার স্বরাজ পায়। ব্যষ্টি থেকে আমরা উপনীত হই "ঐক্যবদ্ধ প্রতিনিধিত্বে"—যা হল একীভূত রাষ্ট্রের প্রকৃত ভিত্তি। একীভূত রাষ্ট্র আবার বিশ্ব-রাষ্ট্রের প্রকৃত আদর্শ আমাদের সামনে তুলে ধরে। ঐক্যবদ্ধ প্রতিবেশিত্ব বলতে কিন্তু সংলগ্ন অঞ্চলের জনগণের দৈহিক সান্নিধ্য থেকে অনেক বেশী কিছু বোঝায়। এজন্য প্রয়োজন প্রতিবেশিত্ব চেতনা বলতে যা বোঝায় তার বিবর্তন। অন্যভাবে বলতে গেলে প্রশ্ন করতে হয়, প্রতিবেশী জীবনে সৃষ্ট শক্তি কি করে আমাদের পূর্ণ নাগরিক ও জাতীয় জীবনের অংশ হতে পারে?" এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার দায়িত্ব গণতন্ত্র এখন নিয়েছে। যে পদ্ধতির প্রস্তাব করা হয়েছে তা হল সমষ্টিগত সম্মতি সৃষ্টি করা। আজ যে গণতন্ত্র বর্তমান তা শুধু যোগ অঙ্কের দ্বারা একটা সাধারণ সম্মতি লাভের প্রয়াস। প্রকৃতপক্ষে, এর অর্থ হল বিভিন্ন সম্মতির মধ্যে সংঘর্ষ, যার মীমাংসা হয় শুধুমাত্র সংখ্যাধিক্যের জোরে। নতুন গণতন্ত্র এই যোগ পদ্ধতি অনুমোদন করে না। প্রতিবেশী সত্তার বিভিন্ন ইচ্ছা যাতে এক সমষ্টিগত সম্মতিরূপে বিকশিত হয় সেজন্য বিশদ উপায় ও পদ্ধতি আবিষ্কারের ওপরই আধুনিক গণতন্ত্র জোর দিয়ে থাকে। এ পন্থা, যোগ অঙ্কের পন্থা নয়, বরং ঐক্যবদ্ধ হওয়ার পদ্ধতি। এভাবে প্রতিবেশী সম্বন্ধে চেতনার যে জাগরণ ঘটে তা যেন অবশ্যই প্রতিবেশী সত্তার সাধারণ সমষ্টিগত ইচ্ছার প্রকাশ ঘটায়। সেই একই পদ্ধতিতে কতগুলি প্রতিবেশী কেন্দ্রের সমষ্টিগত সম্মতি একত্রীভূত করে তাকে সমগ্রজাতির সাধারণ সমষ্টিগত ইচ্ছার রূপ দেওয়ার

সুযোগ দিতে হবে। শুধুমাত্র অনুরূপ একত্রীকরণের পদ্ধতির সাহায্যেই রাষ্ট্রসংঘ প্রকৃত রাষ্ট্রসংঘ হতে এবং বিশ্বরাষ্ট্রের কল্পনা বাস্তবে রূপ পেতে পারে।

এই সমগ্র দর্শনটি ব্যষ্টি বিবর্তনের ধারণার ওপর প্রতিষ্ঠিত। ভাব হল, "ব্যক্তির শক্তি মুক্ত করো"। রাষ্ট্র সম্বন্ধে সাধারণ ধারণার সঙ্গে প্রকৃত ব্যক্তিত্বের—যে জীবনের সচেতন দায়িত্ব ব্যষ্টির এবং যাকে সে সবকিছুই সমর্পণ করে—আদৌ কোন মিল নেই। এই চিন্তাধারা অনুসারে "প্রতিনিধিত্বমূলক সরকার, দল সংগঠন, সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসন, তাদের সবকিছু বাড়াবাড়ি নিয়ে শুকনো কাঠে পরিণত হয়েছে। তার বদলে, সাধারণ ধারণা, সাধারণ উদ্দেশ্য ও সমষ্টিগত সম্মতির জন্মদান ও তা সার্থক করে তোলার জন্য নিরপেক্ষ দল সংগঠন অত্যাবশ্যক।" এর অর্থ হল ব্যক্তিসত্তার প্রকৃত উন্নয়ন ও প্রসার। বর্তমান প্রতিষ্ঠানগুলি মানুষকে যন্ত্রে পরিণত করেছে। ব্যষ্টির ওপর প্রতিষ্ঠিত না হলে কোন সরকার সফল হবে না, কোন সরকার সম্ভব নয়। 'নিউ ষ্টেট' গ্রন্থের প্রতিভাময়ী লেখিকা বলেন, এ পর্য্যন্ত আমরা ব্যষ্টিকে দেখিনি। আমাদের অ্যাংলো স্যাকসন ইতিহাস হল তাকে খুঁজে বের করার প্রয়াসের কাহিনী। আমরা প্রতিনিধিত্বমূলক পদ্ধতির মাধ্যমে তাকে খুঁজেছিলাম কিন্তু তাকে পাইনি। প্রত্যেক পুরুষকে এবং পরে প্রত্যেক নারীকে ভোটাধিকার দিয়ে আমরা তার কাছে পৌঁছতে চেয়েছিলাম কিন্তু সে আমাদের কাছ থেকে এখনও পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে। এখন প্রত্যক্ষ সরকার ব্যষ্টিকে খুঁজছে।" আরেক জায়গায় সেই লেখিকা বলেছেন, "এইভাবে দল সংগঠন আমাদের শুধুমাত্র সংখ্যার প্রভুত্ব থেকে মুক্তি দেয়, এইভাবে গণতন্ত্র কাল ও স্থানের ঊর্দ্ধে উঠে যায়। আধ্যাত্মিক শক্তিরূপে ছাড়া তাকে অন্য কোনভাবে হৃদয়ঙ্গম করা যায়

না। সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসন নির্ভর করে সংখ্যার ওপর। আর গণতন্ত্র নির্ভর করে সমাজ যে কতকগুলি একক প্রতিষ্ঠানের সমষ্টি নয় বরং মানবিক সম্পর্কের একটি বিস্তৃত জাল, এই সুপ্রতিষ্ঠিত ধারণার উপরে ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে গণতন্ত্র জন্মায় না, এ হলো প্রকৃত সমষ্টিগত ইচ্ছার প্রকাশ যাতে প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার সমগ্র জটিল জীবনটি দান করতে হবে—কোন একটি সময় প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার পূর্ণ প্রকাশ করতেই হয়। অতএব গণতন্ত্রের নির্য্যাস হলো সৃষ্টি। গণতন্ত্রের পদ্ধতি হলো দল সংগঠন।" এই চিন্তাধারা অনুসারে ব্যক্তিসত্তার উন্নয়ন ও প্রসার ছাড়া জীবন্ত রাষ্ট্র সম্ভব নয়। রাষ্ট্র নিজেই স্থাণু নয়, খামখেয়ালিতে তা সৃষ্ট হয় না। "এ এক পদ্ধতি উন্নয়নের বিভিন্ন স্তরের প্রকাশের জন্য অবিরাম আত্মসংশোধন। সেই পরিবর্তনে প্রত্যেকে এবং সকলে এমন নমনীয় হবে যে অবিরাম রূপ পরিবর্তন অবিরাম বৃদ্ধির হাত ধরাধরি করে চলে।" ব্যক্তিসত্তা ও দল ও জাতি যে পরস্পর বিরোধী নয় এই পরিষ্কার ধারণার ফলেই তা সম্ভব হতে পারে। এইসব গুলিকে একটি সচেতন সমগ্রতায় একীভূত করার অর্থ হল ব্যক্তির ইচ্ছাকে সারা জাতির সাধারণ ও সমষ্টিগত ইচ্ছার মধ্যে মিলিয়ে দেওয়া।

নতুন গণতন্ত্রের এই আদর্শকে সাধারণ ইউরোপীয় চিন্তাধারা মেনে নেয়নি কিন্তু বর্তমানে যে সব সমস্যা ইউরোপকে পীড়িত করছে তাদের সমাধান অন্য কোনভাবে সম্ভব নয় বলে মনে হয়। এই আদর্শ যা আজ বহু বাস্তববাদী রাজনৈতিকের কাছে অবাস্তব বলে মনে হচ্ছে নিকট ভবিষ্যতে তা যে প্রকৃত আদর্শ বলে গৃহীত হবে সে বিষয়ে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। সেই একটি লেখিকার রচনা থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে বলছি, "বাস্তব রাজনীতিতে বাস্তব বলতে এখন কিছুই নেই।"

প্রকৃত তথ্য হল, আধ্যাত্মিক ভিত্তির অভাবে ইউরোপের সমস্ত প্রগতিশীল আন্দোলন বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে। এই লেখিকা যে সে বিষয়ের উল্লেখ করেছেন তা সত্যই আন্দোলনের বিষয়। তিনি বলেন, "আমাদের দৈনন্দিন জীবন কি অপবিত্র এবং এর উর্দ্ধে আমরা যতটা উঠতে পারি ততটাই কি পবিত্র জীবন আমরা পাই? তাহলে রাজনীতি যে পর্য্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে তাতে আশ্চর্য্য হবার কিছু নেই। কিন্তু আজকের মানুষের ধর্মবিশ্বাস তাই নয়। আমরা আমাদের জীবনের পবিত্রতায় বিশ্বাস করি, আমরা বিশ্বাস করি ভগবান চিরকাল মানুষের রূপ ধরে আসেন। তাই মানবিকতা এবং সকল মানুষের সাধারণ দৈনন্দিন জীবনে আমরা বিশ্বাস করি।"

গত পনের বছর ধরে আমি স্বদেশবাসীর কাছে জীবন সম্বন্ধে আমার যে মত প্রকাশের চেষ্টা করে আসছি তার সঙ্গে উক্ত জীবন দর্শনের যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে। সকল সত্যের বড় সত্য হলো ভগবানের বাইরের লীলা প্রকাশ পায় ইতিহাসে। ব্যক্তি, সমাজ, জাতি, মানবিকতা সবই সেই এক লীলার ভিন্নরূপ। প্রকৃত সত্য এবং বস্তুনিষ্ঠ স্বায়ত্বশাসনের পরিকল্পনা অন্য কোন জীবন দর্শনের ভিত্তিতে রচিত হতে পারে না। বর্ত্তমান মুহূর্ত্তে এই সত্য উপলব্ধিই একান্ত আবশ্যক। এই হল ভারতীয় দর্শনের আত্মা এবং এই আদর্শের দিকেই সম্প্রতি ইউরোপীয় চিন্তাধারা ধীরে ধীরে কিন্তু নিশ্চিতভাবে এগোচ্ছে।

সরকার গঠনের পরিকল্পনা ও রচনাকালে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির দিকে নজর দিতে হবে—

(১) ভারতে প্রাচীন পল্লী ব্যবস্থা অনুযায়ী স্থানীয় কেন্দ্রগুলি গঠন;

(২) এই পল্লীকেন্দ্রগুলিকে একত্রিত করে বৃহত্তর থেকে অধিকতর বৃহৎ দলগঠন ;

(৩) অনুরূপ বৃদ্ধির ফলে একীভূত রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা ;

(৪) পল্লীকেন্দ্র এবং বৃহত্তর দলগুলির স্বাধীন সত্তা বজায় থাকবে ; এবং

(৫) নিয়ন্ত্রণের অবশিষ্টাংশ ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে থাকবে। তবে শুধুমাত্র বিশেষ ক্ষেত্রে সেই ক্ষমতা প্রয়োগ করা চলবে এবং সেই উদ্দেশ্যে উপযুক্ত রক্ষা কবচের ব্যবস্থা করতে হবে যাতে স্থানীয় কেন্দ্রের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ থাকে এবং সেই সঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকারও প্রকৃত ঐক্যবিধায়ক রাষ্ট্র হয়ে উঠতে পারেন। প্রধানত পরামর্শ দানই হবে এ ধরণের কেন্দ্রীয় সরকারের সাধারণ কাজ।

সরকারের রূপ সম্পর্কে আমি যে প্রস্তাব করলাম তার জের টেনে বলতে পারি এই স্থানীয় কেন্দ্রগুলির সংগঠনের কাজ এখনই সুরু করতে হবে। বর্তমান সাব-ডিভিশনে বা আরও ক্ষুদ্র ভাগ নিয়ে স্থানীয় কেন্দ্র গঠন করা যেতে পারে। বৃহৎ কেন্দ্র সুবিধামত গড়া যেতে পারে। একবার স্থানীয় অঞ্চল—"প্রতিবেশীদল"—গড়তে পারলে আমরা সম্মিলিত চিন্তার অভ্যাস সৃষ্টি করব এবং সমস্ত স্থানীয় সমস্যার সমাধানের ভার তাদের হাতে তুলে দেব। আজ এই স্থানীয় কেন্দ্রগুলির মাধ্যমে সরকার পরিচালনার কাজ সুরু না করার কোন কারণ দেখিনা। তারা কর্তৃত্বের জন্য জনগণের সহযোগিতার ওপর নির্ভর করবে। আর স্বেচ্ছা সহযোগিতা বাধ্যতামুলক সহযোগিতার—যা ভারতীয় আমলাতান্ত্রিক শাসনের ভিত্তি—চেয়ে অনেক ভাল। আমার মনে যে পরিকল্পনা আছে তার বিশদ বিবরণ দেবার স্থান এটি নয়। কিন্তু আমি মনে করি শুধু

সরকার গঠনের পরিকল্পনা রচনা নয়, এই পরিকল্পনা কিভাবে অবিলম্বে কার্য্যকরী করা যায় তা নির্দেশ করার জন্য একটি কমিটি গঠন অত্যাবশ্যক।

পরবর্তী যে কাজের উল্লেখ আমি করতে চাই তা হল বিধান পরিষদ বর্জন। দুঃখের বিষয় এ প্রশ্নটি পরিবর্তন বা অপরিবর্তনের বিতর্কের অঙ্গ হয়ে উঠেছে। আমার মনে হয় একটা ভুল ধারণার ওপরেই বিতর্কটি গড়ে উঠেছে। কার্যসূচীর কোন পরিবর্তন হওয়া উচিত কিনা তা নিয়ে প্রশ্ন নয়। প্রকৃত প্রশ্ন হল, আমাদের এই অত্যন্ত প্রিয় আন্দোলনের সাফল্যের জন্য কয়েক ক্ষেত্রে আমাদের কার্য্যকলাপের গতি পরিবর্তন প্রয়োজন কিনা। বিষয়টি আমি ব্যাখ্যা করছি। বার্দোলি প্রস্তাবের কথা ধরুন। স্কুল কলেজ বর্জন বিষয়ে বার্দোলি প্রস্তাবে আমাদের কার্য্যকলাপের গতি পরিবর্তন করা হয়েছিল কিন্তু তাতে কোনমতেই বর্জন প্রত্যাহারের কথা বলা হয় নি। স্বরাজ বছরে ছাত্রদের সরকারী স্কুল কলেজ থেকে বের করে আনার পরিকল্পনা ছিল এবং জাতীয় স্কুল সুরু হলে সেগুলিকে ঐসব ছাত্রদের "দুর্বলতার" সুবিধা দেওয়া হচ্ছে বলে গণ্য করা হয়েছিল। মহাত্মা গান্ধীর ভাষায় উদ্দেশ্যটি "শিক্ষামূলক" নয়, "রাজনৈতিক" ছিল। বার্দোলি প্রস্তাবে জাতীয় শিক্ষার প্রধান কাজ হিসাবে স্কুল কলেজ প্রতিষ্ঠার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। উদ্দেশ্যটি "শিক্ষামূলক" এবং কংগ্রেস যদি এখনও ছাত্রদের সরকারী স্কুল কলেজ থেকে বেরিয়ে আসতে বলে তাহলে তাদের শিক্ষার সুবিধা দিতে হবে অর্থাৎ স্কুল কলেজ বর্জন অব্যাহত থাকলেও আমাদের কার্য্যকলাপের গতি বদলিয়েছে। প্রকৃতপক্ষে, হিংসাত্মক বা অহিংস প্রত্যেক বিপ্লবে এ ধরণের পরিবর্তন অবশ্যই ঘটবে কারণ শুধুমাত্র এ ভাবেই আদর্শের

প্রকৃত সেবা হয়।

তারপর, জনগণ এখনও প্রস্তুত নয় তাই ব্যাপকহারে আইন অমান্য আন্দোলন সম্ভব নয় বলে তদন্ত কমিটির সদস্যগণ সর্বসম্মতিক্রমে যে অভিমত প্রকাশ করেছেন তা আমাদের মনে রাখতে হবে।

স্বীকার করছি, আইন অমান্য আন্দোলনের যে কোন পদ্ধতি গ্রহণে বাধা দানের অনুকূলে আমি নই এবং আমার মতে কংগ্রেসের এই সমস্ত বাধা বাতিল করা উচিত। আমি এখনও বুঝতে পারি না, কোন বিশেষ আইন অমান্য করার জন্য জনগণের অন্তত আশী শতাংশকে বিশুদ্ধ খাদি সজ্জিত হতে হবে কেন। সাধারণ গণ আইন অমান্য আন্দোলনের ততটা পক্ষপাতী আমি নই। আমার মনে হয় এ রকম ধারণা অবাস্তব। কিন্তু বিশেষ ধরণের আইন, যেগুলি প্রখ্যাতভাবে বেআইনী, যে সব আইন "আইন ও শৃঙ্খলার" সৃষ্টজীব, যে সব আইন সমভাবে মানুষ ও দেবতার পক্ষে অসম্মানকর—সেই সব আইন অমান্য আন্দোলন বাস্তব রাজনীতির আওতায় এসে পড়ে। আমার মতে সেই সব আইন অমান্য করার সমস্ত চেষ্টা করা উচিত। একমাত্র সত্যের ওপর দাঁড়িয়েই আমরা স্বরাজকে এগিয়ে আনতে পারি। এ ধরণের আইনের কাছে নতি স্বীকার করলে আমরা সত্যের আশ্রয় থেকে চ্যুত হই। জাতীয় বিকাশের পরিপন্থী ও জাতীয় সত্তার পক্ষে ক্ষতিকর বিধি ও বেআইনী আইনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার মত সত্যবোধ যে জাতির নেই তার আর কি আশা আছে?

আমার মতে, বিধান পরিষদ বর্জনের প্রশ্নটি—যা আজ সারা দেশকে অত্যন্ত আলোড়িত করেছে—আমাদের উল্লিখিত পরিস্থিতির

পরিপ্রেক্ষিতে অবশ্যই বিবেচনা ও মীমাংসা করতে হবে। ভাবের দিক থেকে আমার উল্লিখিত আইন অমান্য আন্দোলন এবং বিধান পরিষদের অবসান বা সংশোধন ঘটাবার উদ্দেশ্য ও প্রকাশ্যে ঘোষিত লক্ষ্য নিয়ে পরিষদে প্রবেশের মধ্যে কোন বিরোধ নেই। পরিষদ বর্জনের বিরোধী আমি নই। আমি শুধু বলতে চাই, সংশোধিত পরিষদ ব্যবস্থা ও তার অন্তর্গত ভারতীয় সিভিল সার্ভিসের ইস্পাত কাঠামো—যা অচল অবস্থা ও নানা দপ্তরের দ্বৈত শাসনে আবৃত—ভারতীয় জাতির প্রকৃতি ও পরিবারের পক্ষে সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত। একটা বিদেশী ব্যবস্থা ভারতীয় জনগণের ওপর জোর করে চাপিয়ে দেওয়ার জন্য ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের এই হল প্রয়াস। স্বরাজের প্রকৃত ভিত্তি রূপে এই বিদেশী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে ভারত বিনা দ্বিধায় অস্বীকার করেছে। আমি প্রায়ই বলেছি যে, আমার কাছে মোটামুটির প্রশ্ন নেই; স্বরাজের প্রকৃত ভিত্তির জন্য আমি অনেক স্বার্থত্যাগ করতে প্রস্তুত। তাছাড়া, সাত বা দশ বা কুড়ি বছরের মধ্যে পূর্ণ স্বাধীনতা পাব কি না এ প্রশ্নটিকেও আমি কোন গুরুত্ব দিই না। একটা জাতির জীবন ইতিহাসে কয়েক বছর কিছুই নয়। কিন্তু আমি বলছি, এ ধরণের একটা ব্যবস্থাকে ভারত কিছুতেই আমাদের স্বরাজের ভিত্তি বলে মেনে নিতে পারে না। অতএব এই বিধান পরিষদগুলির হয় সংশোধন, নয়ত অবসান ঘটাতে হবে। এ পর্য্যন্ত আমরা বাইরে থেকে পরিষদ বর্জন করছিলাম। আমরা অনেক কিছু করতে পেরেছি—পরিষদের মর্য্যাদা হ্রাস পেয়েছে এবং দেশ জানে পরিষদের আসন যাঁরা অলঙ্কৃত করেছেন তাঁরা জনগণের প্রকৃত প্রতিনিধি নন। কিন্তু আমরা অনেক কিছু করা সত্ত্বেও এই বিধান পরিষদগুলি এখনও টিকে

আছে। পরিষদের ভেতর থেকে তা বর্জন করার কাজ কংগ্রেসের কর্তব্য ছিল। সংশোধিত পরিষদ প্রকৃতপক্ষে আমলাতন্ত্রের মুখোশ। তাদের মুখ থেকে টান মেরে এই মুখোশ খুলে দেওয়া আমাদের কর্তব্য মনে করি। আমার মতে বর্জন বলতে প্রত্যাহারের থেকে আরও বেশী কিছু বোঝায়। বিলিতি দ্রব্য বর্জনের অর্থ হল এমন ব্যবস্থা অবলম্বন করা যাতে আমাদের বাজারে বিলিতি দ্রব্য কিছু যেন না থাকে। সংশোধিত পরিষদ বর্জন বলতে আমি বুঝি, এমন ব্যবস্থা অবশ্যই অবলম্বন করতে হবে যাতে স্বরাজের অগ্রগতিতে বাধা দেওয়ার জন্য বিধান পরিষদগুলি যেন বর্তমান না থাকে। এই পরিষদগুলি সাফল্যের সঙ্গে বর্জনের উপায় হল সেগুলির এমনভাবে সংশোধন করা যাতে স্বরাজলাভে তা সাহায্য করে নয়ত তাদের একদম শেষ করা। এভাবে পরিষদ বর্জনের পরামর্শ আমি দেশকে দিচ্ছি।

আমি যে অর্থে পরিষদ বর্জন বুঝি তা অহিংস অসহযোগ নীতির আওতায় পড়ে কিনা তাই নিয়ে দেশে অনেক আলোচনা হয়েছে। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস যে অসহযোগিতা নীতি গ্রহণ ও প্রয়োগ করেছে তার সঙ্গে আমার পদ্ধতির যে বিন্দুমাত্র বিরোধ নেই, সেকথা আমি জোরের সঙ্গে বলতে পারি। আমি কোন তর্কশাস্ত্রসঙ্গত বা দার্শনিক বস্তুনিরপেক্ষ বিষয়ের কথা বলছি না। কংগ্রেস যা অসহযোগ বলে গ্রহণ করেছে আমি সে সম্বন্ধেই বলছি।

প্রথমত আমি কি উল্লেখ করতে পারি যে, আমরা এ পর্য্যন্ত আমলাতন্ত্রের সঙ্গে অসহযোগ করি নি! আমরা এদেশের জনগণকে অসহযোগের জন্য প্রস্তুত করছি মাত্র। আমার উক্তির সমর্থনে অসহযোগ বিষয়ে নাগপুর প্রস্তাব থেকে উদ্ধৃতি দিচ্ছি। শুধু

প্রাসঙ্গিক অংশগুলিই উল্লেখ করব—

"কংগ্রেসের মতে বর্তমান ভারত সরকার দেশের বিশ্বাস থেকে বঞ্চিত হওয়ায় এবং ভারতের জনগণ স্বরাজ প্রতিষ্ঠায় দৃঢ় সংকল্প হওয়ায়······এই কংগ্রেস······অহিংস অসহযোগ পরিকল্পনা পূরোপূরি বা তার অংশবিশেষ—একদিকে বর্তমান সরকারের সঙ্গে স্বেচ্ছায় কোন সম্পর্ক না রাখা এবং অন্যদিকে করদানে অস্বীকার করা—ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস বা নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির নির্দ্ধারিত সময় কার্য্যকরী করতে হবে। ইতিমধ্যে দেশকে তার জন্য প্রস্তুত করার উদ্দেশ্যে কার্য্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বন করে যেতে হবে।"

জাতীয় শিক্ষা, আদালত বর্জন, বিলিতি দ্রব্য বর্জন ইত্যাদি কার্য্যকরী ব্যবস্থা ইতিমধ্যে অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে। অতএব এটা স্পষ্ট যে কংগ্রেস এখনও অসহযোগ প্রয়োগের নির্দেশ না দিয়ে শুধু কতগুলি ব্যবস্থার সুপারিশ করেছে যার ফলে কংগ্রেস নির্দ্ধারিত কোন না কোন সময়ে ভারতীয় জাতি অসহযোগ শুরু করতে পারে।

দ্বিতীয়ত, নীতিটির বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা করা যাক। এর যুক্তি যুক্তধারণা ও দার্শনিক বস্তু নিরপেক্ষ বিষয় নিয়ে নয়, কাজের মধ্যে দিয়ে যে নীতি গড়ে উঠেছে তা দেখে আমার পরিষ্কার মনে হয়েছে যে কংগ্রেস দু ধরণের কাজে রত। কংগ্রেস যা কিছু করেছে তাতে যেমন ধ্বংসের দিক আছে তেমনি আছে সৃষ্টির দিক। আইনজীবী ও আদালত বর্জনের অর্থ হল বর্তমান আইন প্রতিষ্ঠান ধ্বংস করা; আবার পঞ্চায়েৎ গড়ার উদ্দেশ্য হল বিচার ব্যবস্থার সৃষ্টি। স্কুল কলেজ বর্জনের অর্থ শিক্ষা দপ্তর ধ্বংস করা; আবার জাতীয় স্কুল

ও কলেজ প্রতিষ্ঠার অর্থ হল ভারতের তরুণদের জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি করা। বিলিতি কাপড় পুড়িয়ে বিলিতি দ্রব্য বর্জনের অর্থ হল দেশের যা বিলিতি দ্রব্য আছে তা ধ্বংস এবং ভবিষ্যতে বিলিতি দ্রব্য যাতে দেশে না আসে তার ব্যবস্থা করা। অন্যদিকে চরখা ও তাঁতের অর্থ হল জনগণকে দেশী বস্ত্র সরবরাহের সৃজনশীল প্রয়াস। এই নীতি দিয়ে বিচার করলে, পরিষদগুলিকে হয় স্বরাজলাভে সুবিধার জন্য প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত বা একেবারে ধ্বংস করার ইচ্ছা করলে তাতে অন্যায় কি হল ? আমি যে ভাবে পরিষদ বর্জন করতে চাই তাতে ধ্বংস ও সৃষ্টির সেই দ্বিমুখী নীতিরই প্রকাশ দেখা যাবে।

পরিষদ বর্জন এই আন্দোলনের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক দিকের বিরোধী, এমন কথাও বলা হয়েছে। দুটি বিষয় পৃথকভাবে ধরা যাক। অসহযোগের নীতিতত্ত্ব ছাড়াও নৈতিক দিক প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, পরিষদগুলির অবসান ঘটাবার উদ্দেশ্যে সেখানে প্রবেশ করা অন্যায় ও সততার পরিচায়ক নয়। এ যুক্তিতে ধরে নেওয়া হচ্ছে যে সংশোধিত পরিষদ পূরোপূরি আমলাতন্ত্রের সম্পত্তি এবং বলা হচ্ছে যে অন্য লোকের সম্পত্তি নষ্ট করার উদ্দেশ্যে সেখানে যাওয়া আমাদের উচিত হবে না। আমার মনে হয় প্রকৃত তথ্য সম্বন্ধে ভুল ধারণার ফলে এই যুক্তি দেখান হচ্ছে। সংস্কার ব্যবস্থা নিঃসন্দেহে অপর্য্যাপ্ত এবং আমি কখনই স্বীকার করব না যে শাসন সংস্কার আইন ব্রিটিশ পার্লামেন্টের দান। এ হল, মহাত্মা গান্ধীর ভাষায় "জনপ্রিয় আন্দোলনের কিছুটা সুবিধা দান"। আসলে এ হল দুটি বিরোধী শক্তির—জনগণের স্বাধীনতার আকাঙ্খা এবং সেই আকাঙ্খার বিরোধিতা করার আমলাতন্ত্রের অভিপ্রায়—পরিণতি। তার ফলে এটা পূরোপূরি জনপ্রিয় বা আমলাতান্ত্রিক হয়নি। ভারতের জনগণ সংস্কার ব্যবস্থা পছন্দ

করে না। কিন্তু আমলাতন্ত্র যে তা পছন্দ করে না একথা ভুললে চলবে না। দুটি বিরোধী শক্তি বিপরীত দিকে টান দিচ্ছে বলে সংস্কার ব্যবস্থা একটা বিকৃত রূপ নিয়েছে। স্বীকৃত অধিকারগুলি প্রসঙ্গে বলতে পারি এগুলি আমাদের দাবী, আমাদের সম্পত্তি এবং ব্রিটিশ পার্লামেন্টের কাছ থেকে আদায় করে নেওয়া এই দাবীগুলি প্রয়োগ করা আদৌ নীতিহীন বা অন্যায় বা অসৎ হবে না। যে শক্তি সংস্কার ব্যবস্থা সম্ভব করেছিল তারই পরিপূর্ণতার জন্য পরিষদের সংশোধন বা অবসান প্রয়োজন হয়, স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য এর কোন একটি পথ অবলম্বন যদি অনিবার্য্য হয়ে পড়ে তাহলে এর বিরুদ্ধে নীতিহীনতার অভিযোগ কি করে আনা যায়? সহযোগিতার উদ্দেশ্য ঘোষণা করে অথচ অন্তরে পরিষদ ভাঙ্গার অভিপ্রায় নিয়ে আমরা যদি চোরের মত ঢুকতাম তাহলে, স্বীকার করি, এ পন্থা নিঃসন্দেহে অসৎ হতো। আমরা আশা করি মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস ইউরোপীয় কূটনীতি বিসর্জন দিতে পেরেছেন। এখন যখন আমরা খেলি আমাদের হাতের সবকটা তাস টেবিলের ওপর রেখে দিয়েই খেলি।

কিন্তু কেউ কেউ বলেন এতে ধ্বংসের ভাব রয়েছে বলেই অসহযোগিতার দৃষ্টিকোণ থেকে এটি অযৌক্তিক। এই সব দেশপ্রেমিকদের—তাঁদের আমি অত্যন্ত সম্মান করি—মতে আমলাতন্ত্রের অস্তিত্বকে একেবারে উপেক্ষা করে আমাদের জাতীয় জীবন গঠন করাই হবে অসহযোগিতার কাজ। এটি একটি সৎ আদর্শ হতে পারে, যুক্তির দিক থেকে বিচার করলে এই হয়তো অসহযোগিতার অন্তর্নিহিত অর্থ। কিন্তু কংগ্রেস যে অসহযোগ অবলম্বন করেছে তা অতটা যুক্তিপূর্ণ নয়।

আমার কার্য্যসূচী যাচাই করার জন্য অসহযোগের নীতি যদি তুলে ধরা হয় তাহলে কংগ্রেস যে নীতি অনুমোদন, গ্রহণ, ও প্রয়োগ করেছে তাই যেন মাপকাঠি হয় এই আমার দাবী। আগেই বলেছি ঐ নীতি ধ্বংস ও সৃষ্টি দুটিই সমান সমর্থন করে। প্রকৃতপক্ষে, আমাদের বামে, দক্ষিণে চারিদিকে আমলাতন্ত্র বর্ত্তমান থাকার ফলে আমরা যে পরিস্থিতিতে পড়েছি তাতে ধ্বংস না করে সৃষ্টি করা অসম্ভব। একথাও ভুললে চলবে না যে যদি আমরা ভাঙ্গি তা শুধু গড়ার উদ্দেশ্যেই।

একথাও বলা হয়েছে যে পরিষদে প্রবেশ করাটাই অসহযোগ আদর্শের দিক থেকে অসঙ্গত। স্বীকার করছি, এ ধরণের যুক্তি আমি বুঝি না। মনে করুন কংগ্রেস যদি সশস্ত্র বিপ্লব অনুমোদন করত তাহলে আমলাতন্ত্রের দুর্গে প্রবেশ অসহযোগ নীতির দিক থেকে অসঙ্গত কিনা তাই নিয়ে কি তর্ক করা যেত? বস্তুত পরিষদে প্রবেশের লক্ষ্যের ওপরেই অসঙ্গতির অভিযোগ উত্থাপন করা নির্ভর করে। অগ্রগামী সেনাবাহিনী শত্রু পক্ষের এলাকার মধ্যে যখন ঢুকে পড়ে তখন তারা শত্রুর সঙ্গে সহযোগিতা করে না। শত্রু এলাকায় প্রবেশের উদ্দেশ্যের ওপর নির্ভর করে সহযোগিতা বা অসহযোগিতা। যুক্তিটি বিশ্লেষণ করলে এই দাঁড়ায় যে "পরিষদে প্রবেশ" শব্দ দুটি যখনই উল্লেখ করা হবে তখনই বুঝতে হবে এর সঙ্গে সহযোগিতার সম্পর্ক রয়েছে। আবার ভবিষ্যতে পরিষদে প্রবেশের ধারণা অসহযোগিতার সঙ্গে সঙ্গতি-বিহীন বলে ঘোষণা করা হয়। কিন্তু এ হলো চারিটি শব্দের পরিচিত ভ্রমাত্মক যুক্তি। সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করার জন্য পরিষদে প্রবেশ এবং সরকারের সঙ্গে অসহযোগিতা করার জন্য পরিষদে প্রবেশ—এ দুটি হল সম্পূর্ণ বিভিন্ন

প্রস্তাব। প্রথমটি অসহযোগিতা ধারণার সঙ্গে সঙ্গতিবিহীন, পরেরটি সেই ধারণার দিক থেকে অত্যন্ত সঙ্গত।

আমাদের আন্দোলনের আধ্যাত্মিকতার দৃষ্টিকোণ থেকে যে বিরোধিতা এসেছে, সে সম্বন্ধে এবার আলোচনা করা যাক। কোন বিশেষ ধর্মের বিধানের সঙ্গে এই আধ্যাত্মিকতার প্রশ্নটি ভুল করলে চলবে না। পরিষদের সংশোধন বা অবসান করার উদ্দেশ্যে সেখানে প্রবেশের বিরুদ্ধে কোন ধর্মীয় প্রত্যাদেশ আছে বলে আমার জানা নেই। কোরানে যে এ ধরণের নিষেধাজ্ঞা নেই তা আমি বহু মুসলমানের কাছে শুনেছি। অন্য মুসলমান বন্ধুরা বলেছেন যে এ কারণে কিছু অসুবিধা থাকতে পারে কিন্তু এ বিষয়ে কিছু বলার যোগ্যতা আমার নেই। এ প্রশ্নের উত্তর খিলাফতেরা উলেমাদের সাহায্য নিয়ে অবশ্যই দেবেন। উলেমারা যদি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে বর্তমান পরিস্থিতিতে পরিষদে প্রবেশ ধর্মীয় অপরাধ হবে তাহলে কংগ্রেসকে যে বিনা দ্বিধায় সেই সিদ্ধান্ত মেনে নিতে হবে তা বলা নিষ্প্রয়োজন। কারণ এদেশে স্বরাজ লাভের জন্য কোন কাজই হিন্দু মুসলমানের আন্তরিক সহযোগিতা ছাড়া সম্ভব নয়। কিন্তু আমি যে আধ্যাত্মিকতার কথা বলছি তার সঙ্গে কোন বিশেষ ধর্মবিশ্বাস বা ধর্মের সম্পর্ক নেই। এই আধ্যাত্মিকতার দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে স্বরাজলাভে যে কোন বাধা ন্যায়সঙ্গত পন্থায় দূর করাতে কি আপত্তি থাকতে পারে? অসংকোচে আমরা বিলিতি কাপড় পুড়িয়েছি এবং যখন তা পোড়াই, আন্দোলনের আধ্যাত্মিকতায় কোন আঘাত লাগে নি। আধ্যাত্মিকতা কি, সে সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণা নিয়ে শুরু করাই ভাল। ধর্মমত বা নীতির বিধানের কথা বাদ দিয়ে এবং কোন নৈতিক প্রশ্ন না তুলে বলা যেতে পারে, স্বাধীনতা

ও স্বরাজলাভই আধ্যাত্মিকতার ভিত্তি হওয়া উচিত। শুধু মানবিকতা নয়, ভগবানের কাছেও প্রত্যেক মানুষের কর্তব্য কি? তা হল নিজেকে পরিপূর্ণ করার অধিকার। ঈশ্বরের আলোয় জীবন ধারণের অধিকার। আমার কারামুক্তির অল্পদিন পরে এক জনসভায় বলেছিলাম যে, আমাদের সমস্ত জাতীয় কার্য্যকলাপ সত্যের ভিত্তিতে হওয়া উচিত। তারপর থেকে আমায় নানা প্রশ্ন ও প্রহেলিকার সম্মুখীন হতে হয়েছে। সত্যের সংজ্ঞা নির্দেশ করতে আমায় বলা হয়েছে। আমি সত্য বলতে ভয় পেয়েছিলাম বলেই একটা সাধারণ অভিব্যক্তির আশ্রয় নিয়েছি, এমন কথাও বলা হয়েছে। আমি এখনও বলছি, আমাদের জাতীয় কার্য্যকলাপ সত্যের ভিত্তিতে হওয়া চাই। আমি আবার বলছি, রাজনীতিতে বা আমাদের জাতীয় জীবনকে—যা অবিভাজ্য জীবন্ত সত্তা—নানা নির্দিষ্ট খোপে ভাগ করাতে আমি বিশ্বাস করি না। আমি আবার বলছি, জীবনের সংজ্ঞা যেমন আপনারা দিতে পারেন না, তেমনি সত্যের সংজ্ঞাও নির্দেশ করা যায় না। সত্যের যাচাই যুক্তিপূর্ণ সংজ্ঞা দিয়ে করা যায় না। সত্যকে উপলব্ধি করার জন্য যে শক্তিগুলি প্রকট হয়ে ওঠে সেগুলিই হল সত্যের কষ্টিপাথর। সত্য আপনারা যখন অনুভব করেন তখনই আপনারা তা জানতে পারেন। ঈশ্বরের সংজ্ঞা নির্দেশ করা যায় না, সত্যেরও না। কারণ সত্য হল ঈশ্বরেরই প্রকাশ। দু হাজার বছর আগে জনৈক বিচারক বিদ্রূপের সঙ্গে ঈশ্বর পুত্রকে সেই একই প্রশ্ন করেন। তিনি মুখে কোন জবাব দেন নি কিন্তু নিজেকে বলি দেন এবং সত্য প্রকাশিত হয়। আধ্যাত্মিকতার কথা বলতে গিয়ে আমি এই সত্যেরই উল্লেখ করছি। আমার কাছে ইতিহাস ভগবানের প্রকাশ বলে মনে

হয়। আমার মনে হয় ব্যক্তিসত্তা, জাতীয়তা ও বিশ্বমানবিকতা একে অপরের পূর্ণতা সাধনে যে সহায়তা করছে তা হল মানুষের কাছে ভগবানের প্রকাশ। আমার দৃষ্টিতে স্বাধীনতা ও স্বরাজলাভ আমাদের ব্যষ্টি ও জাতি হিসেবে পরিপূর্ণতা লাভের একমাত্র উপায়। আমার কাছে সমস্ত জাতীয় কার্য্যকলাপই বৃহত্তর মানবসমাজের সেবার প্রকৃত উপকরণ। এও মানুষের কাছে ঈশ্বরের প্রকাশ। ঈশ্বর পুত্র বিশ্বে শান্তি নয়, তরবারি এনেছিলেন—মৃত্যু, নীতিহীনতা আর দুর্নীতির শান্তি নয়, সত্যের "বিচ্ছেদকারী তরবারি"। সমস্ত দুর্নীতি, সমস্ত নীতিহীনতার বিরুদ্ধে আমাদের সংগ্রাম করতে হবে। শুধু এভাবেই স্বাধীনতা লাভ করা যাবে। ব্যষ্টি বা জাতি বা বিশ্বমানবের স্বরাজলাভে যে কোন বাধা দেখা দেবে তা ব্যষ্টিকে দূর করতে হবে, সে যদি তার স্বাধীনতা চায়, তা দূর করতে হবে। জাতিকে, যদি সে জাতি আত্মচরিতার্থতা চায়, আর সমগ্র মানব সমাজের উন্নতির জন্য বিশ্বের সকল জাতিকে এই বাধাগুলি দূর করতে হবে। আন্দোলনের আধ্যাত্মিকতা বলতে আমি যা বুঝি, এ যদি তাই হয় তাহলে ভারতীয় জাতি ও স্বাধীনতা লাভের মধ্যে যে সব বাধা আছে তা দূর করতে আমি প্রস্তুত, গোপনে নয়, প্রকাশ্যে, সত্য ও ভগবানের নামে পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে। আধ্যাত্মিকতার এই আদর্শের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে, যে উদ্দেশ্যে আমি পরিষদে প্রবেশের কথা বলেছি, তা সত্যের কারণেই প্রয়োজন বলে মনে হবে। বাকবিতণ্ডার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সবকিছুই এই মাপকাঠি দিয়ে বিচার করতে হবে।

আইন অমান্য তদন্ত কমিটির যেসব সদস্য পরিষদে প্রবেশের অনুকূলে তাঁরা দেশের সামনে যে প্রশ্ন তুলে ধরেছেন তা হল কংগ্রেস

সদস্যদের পরিষদে নির্বাচন প্রার্থী হয়ে দাঁড়াতে হবে। অতএব, শপথ গ্রহণ, সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ ইত্যাদি অন্যান্য প্রশ্ন সম্বন্ধে আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। শপথ গ্রহণ প্রসঙ্গে শুধু এটুকু বলতে পারি, কোন বিশেষ ধর্মের বিধান ছাড়া—যে সম্বন্ধে আমি এখন আলোচনা করতে চাই না—এ বিষয়ে আদৌ কোন অসুবিধা দেখা দেবে না। শপথ গ্রহণ একটি সাংবিধানিক ব্যাপার। রাজা সংবিধানের প্রতিভূ। ঐ শপথ নেওয়া সত্বেও ইংলণ্ডের সংবিধানে অনেক পরিবর্তন সাধন করা হয়েছে। শপথ কি? যাঁরা এই শপথ গ্রহণ করবেন তাঁরা প্রথমত শাসন সংস্কার আইনের অননুমোদিত কোন ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারবেন না। এবং দ্বিতীয়ত বিশ্বস্ততার সঙ্গে, তাঁদের কর্তব্য পালন করবেন। প্রথম বিষয়টি সম্পর্কে বলতে পারি, তার বিরোধিতামূলক এমন কিছু প্রস্তাব আমি করিনি। দ্বিতীয় বিষয়টির ক্ষেত্রে, কোন সদস্য শপথ গ্রহণ করলে আমলাতন্ত্রের প্রতি তিনি বিশ্বস্ততার সঙ্গে কর্তব্য পালনে বাধ্য, এ ধরণের জবরদস্তিমূলক ব্যাখ্যা করা হচ্ছে বলে আমি জানি। আমি শুধু এটুকু বলতে চাই, এই ব্যাখ্যা ন্যায্য বলে প্রমাণিত করার কোন সাংবিধানিক নজির নেই। আমার মনে হয় শপথে যে শব্দগুলি উচ্চারণ করতে হয় তার অর্থ হল শাসন সংস্কার আইন অনুমোদিত ক্ষমতা প্রয়োগ করে নিজ নির্বাচন কেন্দ্রের প্রতি সদস্যের বিশ্বস্তভাবে কর্তব্য পালন। অতএব আমি বুঝতে পারিনা শপথ গ্রহণে আপত্তির কি হেতু থাকতে পারে। কিন্তু সে প্রশ্ন তো বর্তমানে উঠছে না।

পরিষদে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করা যাবে কিনা এবং গেলে আমাদের কি করা উচিত প্রভৃতি নানা ধরণের প্রশ্ন করা হয়েছে। দেশের বর্তমান পরিস্থিতি বিবেচনা করে আমার মনে হয় অসহযোগিদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভের সম্ভাবনা রয়েছে। আমি জানি

ভোটাধিকার লাভে অসুবিধা আছে, যেসব নিয়মের ফলে আমাদের অনেকে পরিষদে প্রবেশ করতে পারবেন না সেগুলিও আমি জানি কিন্তু এসব অসুবিধাসত্ত্বেও আমি বিশ্বাস করি আমরা সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করবই। কিন্তু ১৯২৩ সালে কংগ্রেসের অধিবেশন না হওয়া পর্য্যন্ত এ প্রশ্নটিও উঠতে পারে না। তখন ধারণার ভিত্তিতে নয়, প্রকৃত তথ্যের ওপর নির্ভর করে এ বিষয়ে আলোচনা করা হবে।

সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করলে আমাদের কি করা উচিত, সেই প্রশ্নের উত্তরটি পরিষ্কার। আমাদের সহজাত দাবীর গম্ভীর ঘোষণা জানিয়ে আমরা কাজ শুরু করব। তারপর দাবী করব সেই সংবিধান, যাতে আমাদের অধিকারগুলি অনুমোদিত ও সংরক্ষিত হবে এবং আমাদের মনোমত শাসন ব্যবস্থার জন্য আমাদের দাবী বাস্তবে রূপায়িত করবে। আমাদের দাবীগুলি গৃহীত হলেই সংগ্রাম শেষ। কিন্তু আমি বহুবার বলেছি, আমাদের মনোমত সরকার গঠনে দাবী যদি স্বীকার করে নেওয়া হয় এবং সেই শাসন ব্যবস্থা চালু করে তার প্রকৃত সূত্রপাত করা হয় তাহলে ক্ষমতা পূরোপূরি আমাদের হাতে আজই বা পাঁচ বছরে, এমন কি কুড়ি বছরে দেওয়া হোক তাতে কিছু এসে যায়না তবে যদি আমাদের দাবী না মানা হয় তাহলে পরিষদে প্রত্যেকটি কাজে বাধা দিয়ে আমরা আমলাতন্ত্রের সঙ্গে অসহযোগিতা করব। আমরা কিছুতেই বাজেট গৃহীত হতে দেবনা। প্রত্যেক সম্ভাব্যক্ষেত্রে আমরা পরিষদের কার্য্যকলাপ মুলতুবী রাখার দাবী করব। এবং যে কোন বিল উত্থাপন করলে আমরা ভোটাধিক্যে তা বাতিল করব। প্রকৃতপক্ষে আমরা এমন-ভাবে এগোব যাতে আমাদের দাবী না মেটা পর্য্যন্ত পরিষদের কোন কাজ না হতে পারে। শাসন সংস্কার আইন অনুযায়ী লাটদের হাতে অনুমোদনের জন্য যে বিরাট ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে তা আমি জানি। কিন্তু বিশেষ ক্ষমতা বলে সরকার বাতিল করা যেমন

অসম্ভব তেমনি শুধু অনুমোদনের মাধ্যমেই সরকার চালান অসম্ভব। কয়েকটি ক্ষেত্রে এ ধরণের পদ্ধতি অবলম্বন করা যায়। আমলাতন্ত্র শাসন সংস্কার আইন সমর্পন বা প্রত্যাহার করতে বাধ্য হবে এমন দিন আসবেই। আর প্রত্যেক ক্ষেত্রেই তা হবে জাতির পক্ষে নিশ্চিত জয়লাভ। আমলাতন্ত্র দুটির মধ্যে যেটাই করুক না কেন তাতে আমাদের আদর্শের বাস্তব রূপায়ণ নিকটতর হয়ে উঠবে।

আর একটি প্রশ্ন প্রায়ই করা হয়—এই সংশোধিত পরিষদগুলি শেষ করার পর কি হবে? বিভিন্ন বিধি ভাঙ্গা, ধ্বংসের জন্য কংগ্রেসের প্রতিটি পদক্ষেপের সময় কি সেই একই প্রশ্ন করা যেত না? আমরা যদি শিক্ষা দপ্তর ধ্বংস করতে সক্ষম হতাম তাহলে কেউ কি প্রশ্ন করতেন না, তারপর? আমরা যদি বিচার ব্যবস্থা ধ্বংস করতে পারতাম তাহলে কি সেই একই প্রশ্ন অনুরূপ সঙ্গতভাবে করা হত না? প্রকৃত তথ্য হলো, শুধু ধ্বংসের মাধ্যমে স্বরাজে কখনই আসবে না। আবার এও ঠিক যে ধ্বংস না হলে কোন সৃজনাত্মক কাজই সম্ভব নয়। আমাদের একথা ভুললে চলবে না যে শুধু একাজ বা ও কাজ দিয়ে স্বরাজ লাভ করা যাবেনা। ধ্বংস ও সৃষ্টির সামগ্রিক কাজের মধ্যে জাতি স্বরাজ পেতে পারে। আমরা যদি এই সংশোধিত পরিষদগুলি ধ্বংস করতে সক্ষম হই তাহলে আপনারা দেখবেন যে সারা জাতির মধ্যে একটা নতুন প্রাণচাঞ্চল্য এসেছে। তাঁরা যদি আমাদের পথে আরও বাধার সৃষ্টি করে তাহলে অধিকতর শক্তি ও উদ্দীপনা দিয়ে আমরা সেগুলো দূর করে দেব।

অসহযোগিদের পরিষদে প্রবেশ করতে আমলাতন্ত্র কোনদিনই দেবেনা—তাদের প্রবেশরোধের জন্য নিয়মাবলী তারা বদলাবে—এসব কথাও বলা হয়েছে। অসহযোগিতার কারণ জোরদার করার এর চেয়ে ভাল যুক্তি আর কিছু আমি কল্পনা করতে পারি না। এ ধরণের কোন নিয়ম যদি তৈরী হয় আমি তাকে স্বাগত করব

এবং আমাদের কার্যকলাপের গতি বদলাবো। ভারতের শিশু জাতির বৃদ্ধি ও উন্নয়নের জন্য অবিরাম সংগ্রাম প্রয়োজন। দেশে যে একটা বিরাট অহিংস বিপ্লব চলছে সেকথা ভুললে আমাদের চলবে না। পরিস্থিতি অনুযায়ী আমরা অবশ্যই আমাদের কার্য্যকলাপের গতি পরিবর্ত্তন করব। আজ পরিষদ খোলা আছে, আমরা অবশ্যই সেগুলিকে আক্রমণ করব। কাল যদি সেগুলো বন্ধ থাকে তাহলে সেই পরিস্থিতির সঙ্গে মোকাবিলা করার জন্য আমরা প্রস্তুত থাকব। বৃষ্টি যখন নামে তখন আমরা কি করি? যেদিক থেকে জল আসছে সেদিকেই আমরা ছাতাটা ধরি। আমাদের জাতীয় জীবনের পূর্ণতার জন্য যখনই যেদিকে প্রয়োজন হবে সেদিকেই আমাদের কার্যকলাপের গতি ফেরাতে হবে।

গত দুবছর ধরে বিধান পরিষদগুলিতে যে কাজ চলেছে তাতে অসহযোগিদের পরিষদে প্রবেশ প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। এই সংশোধিত পরিষদ থেকে আমলাতন্ত্র অধিকতর শক্তি সঞ্চয় করেছে এবং যাঁরা পরিষদে প্রবেশ করেছেন তাঁরা সাধারণত আমলাতন্ত্রকে সাহায্য করেছেন। যে তথ্যটি বিবেচনা করা সর্বাধিক প্রয়োজন তা হল করের মাত্রা লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়ে গিয়েছে। যুদ্ধ পূর্ববর্তী বছর ১৯১৩-১৪ সাল থেকে ভারত সরকারের ব্যয়ের মাত্রা প্রচণ্ড বৃদ্ধি পেয়েছে। সে বছর ভারত সরকারের মোট ব্যয়ের পরিমাণ ছিল ৭৯ কোটি ৩৭ লক্ষ টাকা। ১৯২০-২১ সালে তা বেড়ে হয় ১৩৮ কোটি টাকা এবং ১৯২০-২১ সালে—সংশোধিত শাসন ব্যবস্থার প্রথম বছরে—ব্যয়ের পরিমাণ হয় ১৪৯ কোটি টাকা। বর্তমান বছরে ব্যয়ের পরিমাণ আরও বেশী হওয়ার সম্ভাবনা। পরপর এই ব্যয় বৃদ্ধি মেটাবার জন্য ১৯১৬-১৭, ১৯১৭-১৮, ১৯১৯-২০, ১৯২১-২২ ও ১৯২২-২৩ সালে অতিরিক্ত কর ধার্য্য করতে হয়। আগামী বছরে আরও কর দেওয়ার জন্য আমাদের প্রস্তুত থাকতে হবে। অতিরিক্ত কর ধার্য্য করা সত্বেও গত ন বছরের মধ্যে সাত বছর ঘাটতি

বছর ছিল।

সামরিক খাতে ব্যয় বৃদ্ধিই বর্তমান আর্থিক অবস্থার জন্য প্রধানত দায়ী। ১৯১৩-১৪ সালে এই দপ্তরের জন্য ব্যয় করতে হয়েছিল সাড়ে একত্রিশ কোটি টাকা। যুদ্ধের পর ১৯১৯-২০ সালে ব্যয়ের পরিমাণ ছিল সাড়ে সাতাশি কোটি টাকা এবং ১৯২০-২১ সালে আরও এক কোটি টাকা বেড়ে হয় ৮৮½ কোটি টাকা। "অসামরিক প্রশাসন" খাতেও যে ব্যয়ের পরিমাণ ক্রমাগত বাড়ছে তা স্যার এম. বিশ্বেশ্বরায়া উল্লেখ করেছেন। শাসন সংস্কার পরিকল্পনার অপরিহার্য্য অঙ্গরূপে ভারতীয় সিভিল সার্ভিস, ভারতীয় শিক্ষা সার্ভিস, ভারতীয় চিকিৎসা সার্ভিস ও অন্যান্য যে সমস্ত সার্ভিসের জন্য ইংলণ্ডে লোক নিয়োগ করা হয় তাদের কর্মচারীদের বেতন ও ভাতা প্রভূত পরিমাণে বৃদ্ধি করা হয়। কিছুটা ন্যায়পরায়ণতা দেখাবার উদ্দেশ্যে অধস্তম সার্ভিসগুলির—যাতে ভারতীয়েরা নিযুক্ত—কর্মচারীদের বেতনও বাড়ান হয়েছে।

প্রদেশগুলির আর্থিক অবস্থা এ থেকে ভাল নয়। সংশোধিত পরিকল্পনা অনুসারে ভারতের প্রদেশগুলি একত্রে ১১ কোটি টাকা পায়। তাছাড়া, ১৯২০-২১ সালে প্রদেশগুলির মোট উদ্বৃত্তের পরিমাণ ছিল ২১ কোটি ৬৮ লক্ষ টাকা। কিন্তু গত দুবছরে প্রাদেশিক ব্যয়ের পরিমাণ এমন প্রচণ্ড বৃদ্ধি পেয়েছে যে, যে প্রদেশগুলি উদ্বৃত্ত হবে বলে আশা করেছিল সেগুলিও দেউলিয়া হওয়ার যোগাড়। শাসন সংস্কার যুগের প্রথম বছরে অধিকাংশ প্রদেশকে ঘাটতির সম্মুখীন হতে হয়। কিন্তু উদ্বৃত্ত অর্থ দিয়ে তারা আর্থিক সঙ্কট কোনরকমে ঠেকায়; কিন্তু বর্তমান বছরে বহু প্রদেশে আর্থিক পরিস্থিতির আরও অবনতি ঘটেছে। ব্রহ্মের বাজেটে ১ কোটি ৯০ লক্ষ টাকা ঘাটতি। পাঞ্জাবে ঘাটতির পরিমাণ ১ কোটি ৩০

লক্ষ টাকা। বিহার ও উড়িষ্যায় ৫১ লক্ষ টাকা, মাদ্রাজে ৪১ লক্ষ টাকা, যুক্তপ্রদেশে ২৭ লক্ষ টাকা, মধ্যপ্রদেশে ৩৭ লক্ষ টাকা। মাদ্রাজ সরকার নতুন কর ধার্য্য করে ৭৭½ লক্ষ টাকা সংগ্রহ না করলে ঘাটতির পরিমাণ অনেক বেশী হত। কেন্দ্রীয় সরকারকে দেয় অর্থে ছাড় প্রাপ্তি এবং নতুন কর ধার্যের ফলে বাংলাদেশে ১ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা উদ্বৃত্ত হবে বলে বাজেট বিবৃতিতে আশা করা হয়েছে। কিন্তু এই আশা মিটবে কি না তা নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। আগামী বছরের গোড়ার দিকেই আরও কর ধার্য্যের সম্ভাবনা রয়েছে। আসামের বাজেটে নতুন কর ধার্য্যের পরেও ১৪½ লক্ষ টাকা ঘাটতি থাকবে। পাঞ্জাব, বিহার ও উড়িষ্যা, মধ্যপ্রদেশ এবং আসামে আরও কর ধার্য্যের প্রস্তাব বিবেচনাধীন রয়েছে। যুক্তপ্রদেশে সরকারের প্রস্তাব বিধান পরিষদ অগ্রাহ্য করেছে।

এই সংশোধিত পরিষদগুলিকে তাদের দুরভিসন্ধিমূলক কাজ করতে দেওয়ার নীতি সম্বন্ধে আমার স্বদেশবাসীকে সতর্ক করে দিচ্ছি। করের মাত্রা নিঃসন্দেহে আরও বাড়বে এবং আমার মনে আর একটি শঙ্কা দেখা দিচ্ছে। সমস্ত জোর দিয়ে আমি বলছি, এই কর্মহীনতার নীতি যদি আমরা বজায় রাখি তাহলে আজ যে জনগণ আমাদের সঙ্গে আছে তাদের আমরা হারাব। আমলাতন্ত্র যদি জনগণের দাবী না মানে, আসুন আমরা বিধান পরিষদ ধ্বংস করি ফেলি। আবার যদি নতুন কর ধার্য্য হয় - তা হতে বাধ্য— তাহলে তার জন্য যেন শুধু আমলাতন্ত্রই দায়ী হয়। তাহলে আমি, আপনি, জনগণ একযোগে প্রভুত্বাসীন ক্ষমতার সঙ্গে সংগ্রাম করব।

আমার মতে কৃষক ও শ্রমিক সংগঠনের কাজ কংগ্রেসের নেওয়া উচিত। শ্রমিক সম্পর্কে নাগপুর কংগ্রেসে একটি প্রস্তাব নেওয়া হয়েছিল কিন্তু দুঃখের বিষয়, সেটিকে কাজে লাগান হয়নি।

কংগ্রেসের উদ্দেশ্যে শ্রমিকদের কাজে লাগালে অসহযোগ আন্দোলন বিঘ্নিত হবে, এ ধরণের ভয় কোন কোন অসহযোগীর মনে দেখা দিয়েছে। আবার স্বীকার করছি, এ ধরণের যুক্তি আমার বোধগম্য হয় না। এ যুক্তিতে ধরে নেওয়া হয়েছে যে স্বরাজের জন্য আমাদের সংগ্রামে কৃষক ও শ্রমিক সমাজ আমাদের সঙ্গে নেই। আমি এ ধারণা মানতে রাজী নই। নিজ অভিজ্ঞতায় আমি স্থির জেনেছি যে আজ ভারতের শ্রমিক ও কৃষক সমাজ স্বরাজ লাভে তথাকথিত মধ্যবিত্ত ও শিক্ষিত শ্রেণী থেকে কোন অংশে কম উদ্‌গ্রীব নয়। অল্পবয়স্ক বালক কলেজের ছাত্রদের যদি আমরা 'কাজে লাগিয়ে থাকি', ভারতের নারীদের যদি 'কাজে লাগিয়ে থাকি', ধর্মমত, বর্ণ, পেশা নির্বিশেষে সমগ্র মধ্যবিত্ত সমাজকে যদি 'কাজে লাগিয়ে থাকি' তাহলে শ্রমিক ও কৃষকদের বাদ দেওয়ার যুক্তি কি থাকতে পারে জানতে পারে কি? মনে হচ্ছে এর উত্তর হল, তারা অনায়াসেই কংগ্রেসের সদস্য হতে পারে কিন্তু তাদের জন্য আলাদা সাস্থা গঠন উচিত হবে না। কিন্তু শ্রমিকদের আলাদা স্বার্থ আছে, প্রধানত বিদেশী পুঁজিপতিরা তাদের শোষণ করে থাকে আর কৃষকদের প্রধানত শোষণ করে এক শ্রেণীর লোক যারা আমলাতন্ত্রের ধ্বজাবাহক। এই বিশেষ স্বার্থের সেবা কি কোন দিক থেকে জাতীয়তার সেবার বিরোধী? দরিদ্রের জন্য অন্ন সংস্থান, যারা বিশেষ ধরণের বৃত্তি বা পেশায় নিযুক্ত আছে তাদের সেবা স্বরাজ লাভের কাজ থেকে কি করে পৃথক হতে পারে? যা কিছু জাতীয় উদ্দেশ্য শক্তিশালী করে, যা কিছু ভারতের জনগণকে সমর্থন করে তা সবই হল স্বরাজের জন্য, কংগ্রেস অন্য যা কিছু প্রয়োজন বলে মনে করে তার অনুরূপ গুরুত্বপূর্ণ। আমার পরামর্শ হল, ভারতের শ্রমিক ও কৃষক সংগঠনের জন্য কংগ্রেসের উচিত কালবিলম্ব না করে একটি শক্তিশালী কার্য্যক্ষম কমিটি নিয়োগ করা। ইতিমধ্যে এ বিষয়ে

আমরা অনেক দেরী করে ফেলেছি। কংগ্রেস যদি তার কর্তব্য না করে তাহলে আপনাদের থেকে বিচ্ছিন্ন, স্বরাজের সঙ্গে সম্পর্কহীন শ্রমিকহীন শ্রমিক ও কৃষক সংস্থা গড়ে উঠছে দেখতে পাবেন। তার ফলে শান্তিপূর্ণ বিপ্লবের মল্লভূমিতে শ্রেণী সংগ্রাম ও বিশেষ স্বার্থ সংঘাত অনিবার্য্যরূপে এসে পড়বে। সেই লজ্জাকর অবস্থা এড়ানো যদি কংগ্রেসের লক্ষ্য হয়ে থাকে তাহলে শ্রমিক ও কৃষক সমাজকে আমাদের নিতে হবে। তাদের বিশেষ স্বার্থ এবং সেই স্বার্থ মেটানো এবং তাকে স্বরাজের উদ্দেশ্যে প্রয়োগের উচ্চতর আদর্শ, এই উভয় দৃষ্টিকোণ থেকে তাদের সংগঠিত করতে হবে। এখানেও শ্রমিক ও কৃষকদের স্বার্থপরতাকে আমাদের কাজে লাগাতে হবে। কারণ আমি জানি জাতির জীবনে উপযুক্ত ও যোগ্য অবদানের জন্যই সেই স্বার্থপরতা তৃপ্ত করা প্রয়োজন।

কংগ্রেস ইতিমধ্যে যে কাজ শুরু করেছে আমি এবার সে সম্বন্ধে কিছু বলবো। প্রথমেই জানাচ্ছি কংগ্রেসের কোন আরব্ধ কাজ ছেড়ে দিতে বলা আমার উদ্দেশ্য নয়। গতি পরিবর্ত্তন ও অন্যান্য বাস্তব পরিবর্তনে যে উল্লেখ আমি করেছি তা আরব্ধ কাজ ছেড়ে দেওয়ার জন্য বলা হয়নি বরং কাজ বাড়াবার জন্য তা বলা হয়েছে।

আমার দৃঢ় অভিমত হলো আগের মতই স্কুল কলেজ বর্জন চালিয়ে যেতে হবে। আইন অমান্য তদন্ত কমিটি স্কুল কলেজ থেকে ছেলেদের সরিয়ে নিয়ে আসা বন্ধ করার জন্য যে প্রস্তাব করেছেন আমি তার সঙ্গে একমত নই। আমার মতে এই প্রশ্নটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। স্বরাজ প্রধানত দেশের তরুণদের ওপর নির্ভর করে। যে জাতি স্বেচ্ছায় জেনে শুনে ছেলেদের, তরুণদের দাসত্ব ও বিদেশী কৃষ্টির মোহরে কলঙ্কিত হওয়ার জন্য স্কুল কলেজে পাঠায় তার আর কি হবে? এ প্রশ্নটির আরও বিশদ আলোচনা করতে চাই না। এ

বিষয়ে আমার মত আমি এতবার বলেছি যে তার পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন মনে করি। তবে জাতীয় স্কুল কলেজ স্থাপনের জন্য তদন্ত কমিটি যে সুপারিশ করেছেন আমি তাদের সঙ্গে একমত।

আইনজীবী ও আইন প্রতিষ্ঠান বর্জনের প্রসঙ্গে কমিটি যে প্রধান সুপারিশগুলি করেছেন আমি সেগুলির সঙ্গে একমত। আত্মপক্ষ সমর্থনের অধিকার প্রয়োগ করতে দেওয়া হবে কিনা, এবং হলে কোন কোন ক্ষেত্রে এবং কি উদ্দেশ্যে ইত্যাদি নানা প্রশ্ন উঠেছে। দস্তুর মাফিক নিয়মকানুন আমি কোনকালেই পছন্দ করি না এবং একটি বিশেষ বিষয়ের সমস্ত সম্ভাব্য পরিস্থিতির দি লক্ষ্য রেখে নিয়ম রচনা অসম্ভব বলে আমি মনে করি। আমি শুধু আদালত বর্জনের নীতির দিকে দৃষ্টি দিতে বলি।

হিন্দু মুসলমান ঐক্য, অস্পৃশ্যতা ও অনুরূপ বিষয় তদন্ত কমিটির সুপারিশের সঙ্গে আমি একমত। তবে আমি বলতে চাই যে ভারতীয় জাতির সকল শাখার মধ্যে প্রকৃত ঐক্য আসতে পারে শুধু তাদের মধ্যে সম্যক সহযোগিতা ও একে অন্যের অধিকার স্বীকার করে নেওয়ার মাধ্যমে। তাই আমি ভারতের বিভিন্ন শাখা ও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে চুক্তির প্রস্তাব করছি। শ্রেষ্ঠত্বের মনোভাব নিয়ে আমরা যদি অস্পৃশ্য বলে অভিহিত শাখার কাছে যাই তাহলে আমরা আদৌ তাদের কল্যাণ করতে পারব না। আমাদের কাজে তাদের অবশ্যই নিয়োগ করতে হবে এবং তাদের পাশাপাশি দাঁড়িয়ে, কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে আমাদের কাজ করতে হবে।

এবারে খদ্দরের প্রশ্নে আসা যাক। আমাদের সামনে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নগুলির এটি অন্যতম বলে আমি মনে করি। আগেই বলেছি, আমি বাণিজ্যিক ভিত্তিতে খদ্দর উৎপাদনের বিরোধী।

৩১শে মার্চ ১৯২১ তারিখে গান্ধীজীর বেজওয়াড়া প্রস্তাব সমর্থনকালে আমি বলেছিলাম—"বাইরে বা ভেতর থেকে বিদেশী পুঁজিপতিদের উৎপাদনের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করার উদ্দেশ্যে আমরা জনগণকে চরখা চালাতে বলিনি। চরখা প্রবর্তনের কারণ হল জনগণকে তাদের অর্থনৈতিক জীবন উপলব্ধি ও তা গড়তে, এবং তাদের পরিবারের বাড়তি সময় ও সুযোগ কাজে লাগিয়ে তাদের প্রয়োজনীয় দ্রব্য উৎপাদন ও তাদের অবস্থার উন্নয়নে সাহায্য করা।"

এ দেশের জনগণকে আত্মনির্ভরশীল ও স্বয়ংসম্পূর্ণ করে তোলাই হল উদ্দেশ্য। কাজটি কঠিন কিন্তু অত্যাবশ্যক এবং আমাদের সর্বশক্তি প্রয়োগ করে তা করতে হবে। বৃহদায়তন কারখানা প্রতিষ্ঠার চেয়ে কয়েকটি পরিবারকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করা আমার কাছে বেশী কাম্য। এ ধরণের কারখানা স্থাপনের নীতি অদূরদর্শিতার পরিচায়ক। বর্তমান চাহিদা মেটালেও তা নিঃসন্দেহে এমন অমঙ্গল সৃষ্টি করবে যা দূর করা কঠিন হবে। স্বাভাবিক কারণে আমি ভারতে একটি নতুন ম্যাঞ্চেষ্টার—যে সম্বন্ধে আমাদের যথেষ্ট অভিজ্ঞতা হয়েছে—স্থাপনের বিরোধী। সম্ভব হলে এ পরিস্থিতি পরিহার করা যাক।

শুধু খদ্দরের দ্বারাই স্বরাজ আসবে, একথা প্রায়ই বলা হয়। স্বদেশবাসীর কাছে আমার প্রশ্ন, খদ্দর কিভাবে স্বরাজ আনতে পারে? শুধুমাত্র এক অর্থে ঐ উক্তিটি সত্য হতে পারে। খদ্দরকে স্বরাজের প্রতীক বলে আমাদের মনে করতে হবে। আমাদের জাতীয় জীবনের এক সুবৃহৎ বিভাগে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়ে উঠতে খদ্দর সাহায্য করে। আশা করা যায় খদ্দরের প্রেরণায় সারা জাতি স্বয়ংসম্পূর্ণ ও স্বাধীন হয়ে উঠবে। তাই হল প্রতীকের অর্থ। আমার মনে হয় এই প্রতীক-পূজার জন্য সম্ভাব্য সমস্ত দিকে

অসহযোগিতার কার্য্যকলাপ প্রসারিত করতে হবে। এইভাবে, শুধু এইভাবেই দ্রুত স্বরাজলাভ সম্ভব।

আশা ও ভরসার শেষ বাণী আপনাদের শোনাবার দায়িত্ব আমার ওপর পড়েছে। স্বাধীনতার কোন রাজপথ নেই। স্বাধীনতার পথ অন্ধকার ও কঠিন কিন্তু আপনাদের সাহস অসীম এবং আপনাদের সংকল্প সুদৃঢ়। যদিও বিপর্য্যয়—মাঝে মাঝে চরম বিপর্য্যয় দেখা দেবে কিন্তু তাতে বিদেশী শাসনের বন্ধন থেকে আপনাদের মুক্তি ত্বরান্বিত হবে। কার্য্য সম্পাদনকে সাফল্য বলে যেন ভুল করবেন না। কার্য্য সম্পাদনের কৃতিত্ব হলো বাইরের রূপ এবং সে রূপ প্রায় প্রতারণাপূর্ণ হয়। আন্দোলনের নিছক কৃতিত্ব হিসাবে অনেক কিছুর উল্লেখ আমরা না করতে পারলেও আমি বলছি, আন্দোলনে সাফল্য নিশ্চিত। সেই সাফল্যের ঘোষণা শোনা গেছে আন্দোলনের বৃদ্ধি ও অগ্রগতি রোধ করার জন্য আমলাতন্ত্রের পুনঃপুনঃ প্রয়াসে—কতকগুলি জঘন্যতম দমনাত্মক আইন প্রত্যাহারে অস্বীকারে, কার্য্যনির্বাহক সরকারের স্বেচ্ছাচারী বা বিবেচনামূলক কর্তৃত্বের ঘনঘন প্রয়োগে এবং আমাদের প্রিয় নেতাকে—যিনি আমলাতন্ত্রের ক্রোধাগ্নিতে আত্মাহুতি দিয়েছেন—কারাগারে প্রেরণের মধ্যে। কিন্তু আন্দোলনের চূড়ান্ত সাফল্য নিশ্চিত হলেও আমি আপনাদের সতর্ক করে দিচ্ছি, সমস্ত বিষয়টি শুধু আপনাদের ওপর নির্ভর করছে, নির্ভর করছে বিরুদ্ধ শক্তির মোকাবিলা আপনারা কেমন করে করেন তার ওপরে। ইহুদী ধর্মশিক্ষক ও গোঁড়া ইহুদীদের আইন ও শৃঙ্খলার প্রতি অতি ভক্তির বেদীমূলে নাজারেথের যীশু আত্মবলি দেবার ফলে খৃষ্ট ধর্মের জয় হয়। আপনাদের বিরুদ্ধে যে শক্তি সমাবেশ হয়েছে তা শুধু আমলাতন্ত্রের নয়, আধুনিক ধর্মশাসক ও গোঁড়া ব্যক্তিদের—আমলাতন্ত্রের প্রাচীন গৌরব বজায় রাখাই যাদের স্বার্থ— শক্তিও

তাতে আছে। সত্য ও ন্যায় বিচারের খাতিরে নিজেদের বলি দেবার সুযোগ আপনাদের এসেছে যাতে আপনাদের সন্তান সন্ততিরা আপনাদের নির্য্যাতনের ফলভোগ করতে পারে। আপনারা যেন আধ্যাত্মিক সংগ্রাম করতে পারেন যার ফলে জয়লাভ করার পর আপনারা যেন কলঙ্কিত না হন বা নিজেদের হাতে ক্ষমতা রাখার জন্য প্রলুব্ধ না হন। কিন্তু আধ্যাত্মিক যুদ্ধ করতে হলে আপনাদের হাতিয়ার আধ্যাত্মিক সৈন্যের হওয়া উচিত। ক্রোধ আপনাদের জন্য নয়, ঘৃণা আপনাদের জন্য নয়। আপনাদের জন্য ক্ষুদ্রতা, নীচতা ও মিথ্যাবাদিতাও নয়। আপনাদের জন্য উষার প্রত্যাশা এবং সকালের আস্থা। গ্রীক কাহিনীতে মানুষের নির্ভীক যোদ্ধা টাইটান শৃঙ্খলিত ও কারারুদ্ধ হয়ে যে গান গেয়েছিলেন সে গানতো আপনাদের জন্যই—

"কষ্টভোগ—যা আশা মনে করে অন্তহীন;
মৃত্যু বা রাত্রির চেয়ে অন্ধকার অন্যায়ে ক্ষমা;
সেই শক্তিকে অস্বীকার, যা সর্বশক্তিমান বলে মনে হয়।

ভালবাসা আর সহ্য করা আর আশা করে চলা,
যার ফলে আশা ভঙ্গ হলেও জন্ম নেয় আর এক আশা।
পরিবর্ত্তন নয়, দ্বিধা নয়, অনুশোচনা নয়,
টাইটান গৌরবের মত এও হলো
ভাল, মহান ও আনন্দপূর্ণ, সুন্দর ও স্বাধীন,
শুধু এই হল জীবন, আনন্দ, সাম্রাজ্য ও বিজয়।"

বন্দেমাতরম্।

পরিশিষ্ট—৪

স্বরাজ ও ঔপনিবেশিক স্বায়ত্বশাসন

[জনসভায় শেষ ভাষণ]

ভারতবর্ষ বার বার প্রশ্ন করেছে, "মুক্তি কোন পথে ?" সুদূর অতীতে ব্যক্তির মায়াক্লান্ত ও বাস্তবসন্ধানী আত্মা বার বার শুধু এই প্রশ্নই করেছিল, আজ এই জীবন্ত বর্তমানে ভারতের আত্মার নির্যাতিত কণ্ঠে ধ্বনি উঠেছে, মুক্তি কোন পথে ?

আপনাদের সামনে আমি আবার প্রশ্নটি তুলে ধরছি যাতে আমাদের কি করতে হবে তার পরিষ্কার ধারণা পাওয়া যায়।

ব্যষ্টির মত জাতিরও ক্ষেত্রে প্রশ্ন হল বন্ধন মুক্তি এবং—এটি আমি যোগ করছি—পাপের প্রকৃত অর্থ খুঁজে পাওয়া। পরাধীনতার শৃঙ্খল পরিয়ে দেওয়া পাপ আবার পরাধীনতার শৃঙ্খল পরাও পাপ।

নানা সমাধান পেশ করা হয়েছে—স্বায়ত্বশাসন, হোমরুল, স্বাধীনতা ও স্বরাজ। এগুলো আসলে কি বোঝায় তা সম্যক উপলব্ধি না করলে এগুলো শুধু নামই থেকে যায়। আর সেই উপলব্ধি করার সময় উদ্দিষ্ট লক্ষ্য সাধনের পন্থা সম্বন্ধেও বিবেচনা দরকার।

শান্তিপূর্ণ ও ন্যায়সঙ্গত পদ্ধতির পক্ষপাতী অনেকে আছেন। আবার অনেকে আছেন যাঁরা মনে করেন শক্তি বা হিংসা প্রয়োগ না করলে স্বরাজলাভ অসম্ভব।

এই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটির মীমাংসা করতে আপনাদের সাহায্য করার উদ্দেশ্যে আমি কিছু বলতে চাই। স্বাধীনতার জাতীয় আদর্শ কি এবং তা পূরণের জন্য দেশকে কোন পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে তা বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলন দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করুক।

আমার মতে স্বাধীনতা হল স্বরাজের থেকে সঙ্কীর্ণতর আদর্শ। একথা সত্য যে, স্বাধীনতা বলতে অধীনতার অবসান বোঝায়। কিন্তু তাতে নিশ্চিত কোন আদর্শের সন্ধান পাওয়া যায় না। তা বলে আমি কখনই মনে করি না যে, স্বরাজের সঙ্গে স্বাধীনতার কোন সঙ্গতি নেই। কিন্তু শুধু স্বাধীনতা পেলেই চলবে না, স্বরাজের প্রতিষ্ঠা প্রয়োজন। ইংরেজ চলে গেলে ভারত স্বাধীন হবে কিন্তু শুধু তাতেই স্বরাজ বলতে আমরা যা বুঝি তার প্রতিষ্ঠা হবে না। গয়াতে সভাপতির ভাষণে আমি উল্লেখ করেছিলাম যে, বহু আপাতবিরোধী উপকরণের সমাবেশে ভারতীয় জনগণ গঠিত হওয়ার ফলে তাদের মধ্যে সংহতি সাধনের চিত্তাকর্ষক অথচ জটিল সমস্যা ভারতের রয়েছে। সংহতি সাধনের জন্য দীর্ঘ সময় প্রয়োজন, পদ্ধতিটিও অনেক সময় ক্লান্তিকর ঠেকতে পারে, কিন্তু তা না করলে স্বরাজলাভ অসম্ভব। এই কারণেই মহাত্মা গান্ধীর গঠনমূলক কার্য্যসূচী তাঁর বিরাট বিজ্ঞতার পরিচায়ক। সেই কার্য্যসূচী সম্বন্ধে আলোচনা আমি না করলেও চলবে কারণ মহাত্মা গান্ধীর নিজের মুখ থেকে এ সম্বন্ধে আজ শোনার সৌভাগ্য আমাদের হয়েছে। সেই কার্য্যসূচী আমি পুরোপুরি সমর্থন করি এবং স্বদেশ-বাসীকে এটিকে শুধু মানসিক সমর্থন না জানিয়ে পুরোপুরি বাস্তবে রূপায়িত করার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি।

দ্বিতীয়ত, স্বাধীনতা সেই শৃঙ্খলাবোধ সম্বন্ধে কিছু বলে না যা

স্বরাজের মূল নির্য্যাস। সংহতি সাধনের কথা আগে বলেছি। তার অর্থ হল সেই শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা। আপনাদের পরিষ্কার উপলব্ধি করতে হবে যে, যা কিছু প্রতিষ্ঠা করা হোক না কেন, তার সঙ্গে ভারতীয় জনগণের প্রতিভা, প্রকৃতি ও ঐতিহ্যের সঙ্গতি থাকা প্রয়োজন। স্বরাজ বলতে আমি যা বুঝি তা হল, প্রথমত, ভারতীয় জনগণের বিভিন্ন শাখার মধ্যে সংহতি সাধনের স্বাধীনতা আমাদের অবশ্যই থাকবে। দ্বিতীয়ত, জাতীয় গতি প্রকৃতি অনুসরণ করে আমরা সেই কাজ করব—দু'হাজার বছর পিছিয়ে গিয়ে নয়, জাতীয় প্রতিভা ও প্রকৃতির আলোকে এগিয়ে যাব। উদাহরণস্বরূপ, শৃঙ্খলা রক্ষার কথা যখন বলি সে সম্বন্ধে আমার ধারণা ইউরোপীয় ধারণা থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। ইউরোপীয় সমাজ ও সরকারের ভিত্তি হল শৃঙ্খলা এবং শৃঙ্খলা রক্ষার মনোভাবের ওপর সবকিছু দাঁড়িয়ে আছে তা পূরোপূরি সামরিক। যে শৃঙ্খলার জন্য ইংল্যাণ্ড আজ যা হয়েছে তাও ঐ সামরিক প্রকৃতির। ইউরোপীয় সভ্যতার নিন্দা করতে চাই না। ঐ তাদের পথ, ঐভাবেই তারা নিজেদের পরিপূর্ণ করবে। কিন্তু আমাদের পথ, তাদের পথ নয়, আমাদেরও আত্মচরিতার্থতা প্রয়োজন।

তৃতীয়ত, আমাদের কাজে কোন বিদেশী শক্তি আমাদের বাধা যেন না দেয়।

তাহলে আমাদের আদর্শ বলে যা গ্রহণ করতে হবে তা হল স্বরাজ, স্বাধীনতা নয়। স্বাধীনতা হল স্বরাজের নেতিবাচক। স্বাধীনতার জাতীয় আদর্শ কি আমাদের প্রশ্ন করা হলে একমাত্র উত্তর হবে, স্বরাজ। আমি হোম রুল বা স্বায়ত্বশাসন কোনটিই পছন্দ করি না। আমি স্বরাজের যে বর্ণনা দিয়েছি

সম্ভবত ঐগুলি তার আওতায় পড়ে। কিন্তু আমার কৃষ্টি, 'শাসন' শব্দটির বিরোধী, তা সে 'ঘরের' বা 'পরের' শাসন হোক। স্বায়ত্বশাসন সম্বন্ধে আমার আপত্তি সেই একই কারণে। যদি স্বায়ত্বশাসনের অর্থ হয় 'নিজের জন্য নিজের শাসন' তাহলে আমার আপত্তির কিছুটা খণ্ডন হয়। কিন্তু স্বরাজ বলতে এ সব কিছুই বোঝায়।

এখন প্রশ্ন, এই আদর্শ আমরা সাম্রাজ্যের ভেতরে থেকে আয়ত্ত করব, না বাইরে থেকে করব? কংগ্রেস তার উত্তরে চিরকাল বলেছে, 'আমাদের দাবী মেনে নিলে সাম্রাজ্যের ভেতরে থেকে, দাবী না মানলে সাম্রাজ্যের বাইরে থেকে।' আমাদের নিজস্ব জীবন যাত্রা নির্বাহের সুযোগ—আত্মোপলব্ধি, আত্মোন্নয়ন ও আত্মচরিতার্থতার সুযোগ আমাদের অবশ্যই থাকা দরকার। আমাদের বাঁচার প্রশ্ন। ব্রিটিশ সাম্রাজ্য যদি আমাদের জাতীয় জীবনের বিকাশ ও উন্নয়নের যথেষ্ট সুবিধা দেয় তাহলে সাম্রাজ্যের বাইরে যাওয়ার প্রয়োজন নেই। কিন্তু তা যদি সুযোগ না দেয়, জগন্নাথের রথের মত সাম্রাজ্যের রথচক্র যদি আমাদের জাতীয় জীবনকে পিষে ফেলে তাহলে সাম্রাজ্যের বাইরে গিয়ে স্বরাজ লাভ করা যুক্তিসঙ্গত হবে।

প্রকৃতপক্ষে, সাম্রাজ্যের ধারণা আমাদের সামনে নানা সুবিধা সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরে। আজ ঔপনিবেশিক স্বায়ত্বশাসন বলতে কোনমতেই গোলামী বোঝায় না। এ হল সাম্রাজ্যের অংশভুক্ত যাঁরা তাঁদের সম্মতিক্রমে বাস্তব সুবিধার জন্য প্রকৃত সহযোগিতার মনোভাব নিয়ে মৈত্রীবন্ধন। এই সম্পূর্ণ স্বাধীন মৈত্রীবন্ধনের সঙ্গে জড়িত রয়েছে বিচ্ছেদ ঘটাবার অধিকার। যুদ্ধের আগে সাম্রাজ্যের কতগুলি অংশে পৃথক হওয়ার মনোভাব ক্রমশ

সক্রিয় হয়ে উঠছিল কিন্তু যুদ্ধের পরে সাধারণত এই বিশ্বাসই প্রবল হয়ে উঠেছে যে বিরাট সংঘ গড়া ছাড়া সাম্রাজ্য বা তার অঙ্গের পক্ষে টিকে থাকা সম্ভব নয়। বর্তমান পরিস্থিতিতে যে কোন জাতি বিচ্ছিন্ন হয়ে বাঁচতে পারে না, তা উপলব্ধি করা হচ্ছে। আর, ব্রিটিশ সাম্রাজ্য নামে অভিহিত মহান জাতিসংঘ তার প্রতিটি অংশকে শুধু যে রক্ষা করেছে তা নয়, প্রত্যেককে আত্মোপলব্ধি, বিকাশ ও আত্মচরিতার্থতার অধিকার দিয়েছে। অতএব স্বরাজের যেসব উপকরণের উল্লেখ আমি করছি, সেগুলি সব যোগাচ্ছে।

এই আদর্শের গভীর আধ্যাত্মিক তাৎপর্য্যের জন্যই আমার কাছে এর বিশেষ আকর্ষণ রয়েছে। আমি বিশ্বশান্তিতে বিশ্বাস করি, বিশ্বাস করি একদিন সারা বিশ্ব সঙ্ঘবদ্ধ হবে। আমি মনে করি ব্রিটিশ সাম্রাজ্য নামে অভিহিত মহান জাতিসংঘ—বিশিষ্ট জীবন, সভ্যতা ও মানসিক দৃষ্টিভঙ্গীর বিভিন্ন জাতির সংঘ—যদি রাষ্ট্রনায়কের দ্বারা ঠিকমত পরিচালিত হয় তাহলে যে বৃহত্তম সঙ্ঘ মানুষের কল্পনায় সম্ভব সেই বিশ্ব মানব সঙ্ঘ গঠনের উদ্দেশ্যে সমগ্র মানব জাতিকে একসূত্রে গ্রথিত করার কাজে চিরস্থায়ী অবদান থেকে যাবে। তবে রাষ্ট্রনায়কদের দ্বারা তা উপযুক্তভাবে পরিচালিত হওয়া দরকার। কারণ এই ধারণার বিকাশের জন্য সঙ্ঘের অন্তর্গত দেশগুলিকে স্বার্থত্যাগ করতে হবে। সাম্রাজ্যবাদের ধারণা এবং সেইসঙ্গে আধিপত্য বিস্তারের জঘন্য মনোভাব চিরকালের জন্য বিসর্জন দিতে হবে। আমি মনে করি, ভারতের কল্যাণের জন্য, কমনওয়েলথের কল্যাণের জন্য, বিশ্বের কল্যাণের জন্য ভারতের উচিত কমন-ওয়েলথের ভেতরে থেকে স্বাধীনতার জন্য চেষ্টা করা ও এইভাবে মানবিকতার সেবা করা।

এবার পদ্ধতি সম্বন্ধে বলব। আমার মতে পন্থা সব সময় আদর্শেরই অঙ্গ। অতএব পন্থা সম্বন্ধে আলোচনা কালে আমাদের উদ্দিষ্ট লক্ষ্যের বৃহত্তর দিকটির কথা আমরা ভুলতে পারি না।

এই আলোকে দেখলে আমাদের জীবন ও কৃষ্টির সঙ্গে হিংসাত্মক পদ্ধতি আদৌ খাপ খায় না। তা বলে আমি এ বোঝাতে চাইছি না যে ভারতের ইতিহাসে কোন যুদ্ধ বিগ্রহ নেই, কখনও হিংসা প্রয়োগ করা হয়নি। আমাদের ইতিহাস সম্বন্ধে সামান্য জ্ঞান বিশিষ্ট ছাত্রও জানে যে তা ঠিক নয়। কিন্তু মাঝে মাঝে আমাদের ওপর কোন কিছু জোর করে চাপিয়ে দেওয়া হয়। ইতিহাসের তত্ত্বসন্ধানী ছাত্র আমাদের প্রতিভার প্রকৃত গতি থেকে এগুলিকে আলাদা করতে নিশ্চয়ই সক্ষম হবে। ইউরোপের মত হিংসা আমাদের জীবনের অঙ্গ নয়। ইউরোপে সেই হিংসাকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য যে আইনের সাহায্য নেওয়া হয় তার ভিত্তিও পাশবিক বলের ওপর প্রতিষ্ঠিত। ভারতীয় জনগণ চিরকাল ঐতিহ্য ও প্রাচীন রীতিনীতি অনুসরণে অভ্যস্ত এবং এইভাবে তারা নিজেদের হিংসাত্মক পদ্ধতি থেকে মুক্ত রেখেছে। আমাদের পল্লী সংস্থাগুলি অহিংসাত্মক কার্য্যকলাপের আশ্চর্য্য কেন্দ্র ছিল। আমাদের গ্রাম্য প্রতিষ্ঠানগুলি, ফুল যেরকম আপনিই ফোটে সেরকম আপনা থেকেই বিকশিত হয়েছে। সংঘাত যা কিছু তা মননের ক্ষেত্রে। আত্মার আকুতি সব সময়েই ছিল। বিতর্ক ও বিবাদ চিরকাল হয়েছে কিন্তু তার মীমাংসা হয়েছে শান্তিপূর্ণভাবে। এই প্রকৃতির বিপরীতধর্মী বা বিরোধী যে কোন পদ্ধতি শ্রেষ্ঠতম মান অনুসারে নীতি বিগর্হিত এবং ব্যর্থ হতে বাধ্য। বিপ্লবাত্মক হিংসার মাধ্যমে আমাদের স্বাধীনতা কোনদিনই অর্জন করা যাবে না, আমার এই দৃঢ় বিশ্বাস আমি

বিনা দ্বিধায় ঘোষণা করছি।

তারপর, ভারতীয় মনস্তত্বের কথা ছেড়ে দিলেও, একটা পরাধীন জাতি নিজ সাধ্যমত হিংসা প্রদর্শন করে আজকের অত্যন্ত সুনিয়ন্ত্রিত সরকারের প্রচণ্ড হিংসামূলক প্রচুর আয়োজনের সঙ্গে কি করে পাল্লা দিতে পারে? ফরাসী ও অন্যান্য বিপ্লবের উদাহরণ দিয়ে কোন লাভ নেই। সেসব দিনের জনগণ বর্শা নিয়ে যুদ্ধ করত এবং প্রায়ই জয়লাভ করত। ঐ পদ্ধতিতে কোন আধুনিক সুসংগঠিত সরকারকে উৎখাত করার কথা ভাবা যায় কি! আমার মনে হচ্ছে, এমন কি ইংলণ্ডেও এ ধরণের সশস্ত্র বিপ্লব আজ অসম্ভব।

তাছাড়া, হিংসা প্রয়োগ করলে সংহতি সাধনের—যা না হলে স্বরাজলাভ অসম্ভব বলে উল্লেখ করেছি—প্রয়াস নির্মূল হয়ে যাবে। হিংসার বদলে সরকারের পক্ষ থেকে তীব্রতর হিংসা আসবে এবং সরকারের দমননীতি এমন প্রচণ্ড হয়ে উঠতে পারে যারফলে স্বরাজলাভের জন্য ভারতীয় জনগণের উদ্দীপনা বিশেষ বাধা পেতে পারে। হিংসামূলক বিদ্রোহের পক্ষপাতী যুবকদের কাছে আমার প্রশ্ন, তারা কি মনে করেন যে জনগণ তাদের পক্ষে হবেন! জীবন ও সম্পত্তির হানির শঙ্কা দেখা দিলে তার অনিবার্য্য ফলস্বরূপ জনগণ—যারা নির্য্যাতিত হয় বা নির্য্যাতিত হতে পারে বলে ভয় পায়—এ ধরণের কার্য্যকলাপ থেকে নিজেদের গুটিয়ে আনে অতএব এই পদ্ধতি বাস্তবে রূপায়িত হওয়া সম্ভব নয়। এই তরুণদের উদ্দেশ্যে সততা বা তাদের দেশপ্রেমের তীব্রতার বিরুদ্ধে একটা কথা বলা আদৌ আমার অভিপ্রেত নয়। কিন্তু আমি আগেই বলেছি এই পদ্ধতি আমাদের প্রকৃতির পক্ষে উপযুক্ত নয়। অতএব তা

প্রয়োগ করা মহাত্মা গান্ধীর ভাষায় "সময় ও শক্তির অপচয়"। যেসব তরুণ নিজেদের অন্তরের অন্তস্থলে হিংসাত্মক পদ্ধতির অনুকূলে চিন্তা করেছেন তাঁদের কাছে আমার আবেদন তাঁরা যেন এ চিন্তা পরিত্যাগ করেন। এই পদ্ধতিতে স্বাধীনতা লাভ করা যায় না তা সুস্পষ্টভাবে এবং সর্বসম্মতিক্রমে ঘোষণা করার জন্য আমি বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনের কাছে আবেদন জানাচ্ছি।

কিন্তু এ ধরণের পদ্ধতি প্রয়োগের বিরুদ্ধে হলেও আমি এ কথা বলতে বাধ্য যে বাংলাদেশের বিপ্লবাত্মক আন্দোলনের জন্য সরকারের হিংসা অনেকটা দায়ী। আমার মনে হয় অধ্যাপক ডিকি উল্লেখ করেছেন যে গত ত্রিশবছরে আধুনিক ইংরেজদের মধ্যে আইন ও শৃঙ্খলার প্রতি সম্মান বা শ্রদ্ধার উল্লেখযোগ্য অবনতি ঘটেছে। তিনি দেখিয়ে দিয়েছেন যে, আধুনিক আইন কানুন—যা আইন আদালতের কর্তৃত্ব হ্রাস এবং আইনের শাসন বিপন্ন করেছে—এই অবনতির জন্য প্রত্যক্ষভাবে দায়ী। অর্থাৎ হিংসা হিংসারই জন্ম দেয়। সরকার যদি প্রজাশক্তির ন্যায্য দাবী, ন্যায্য আন্দোলনে বাধা প্রদানের উদ্দেশ্যে বেআইনী কার্য্যকলাপ শুরু করে তবে অধ্যাপক ডিকির ভাষায় "আইনভঙ্গ করার স্পৃহা" প্রজাগণের মধ্যে দেখা দেয়। ভারতের, বিশেষত বাংলাদেশের ইতিহাস অধ্যাপক ডিকির এই উক্তি সমর্থন করে।

ভারতে বিপ্লবাত্মক আবহাওয়া হঠাৎ সৃষ্টি হয়নি। অন্যান্য স্থানের মত এদেশেও তাকে কয়েকটা স্তর অতিক্রম করতে হয়েছে। শুধুমাত্র ইংল্যাণ্ড ও ইংরেজদের স্বার্থের খাতিরে একশ বছরের প্রশাসনের মিলিত ফলস্বরূপ যে অশান্তি দেখা দিয়েছিল তা হল

প্রথম পর্য্যায়। ১৮৫৮ সালে ভারতবর্ষ মহারাণীর শাসনাধীনে আসার পর সেই অশান্তি আরও বাড়ে। ১৮৫৮ সাল থেকে ঐ শতাব্দীর সমাপ্তিকাল পর্য্যন্ত—ভিক্টোরিয়া যুগের শ্রেষ্ঠতর ভাগ—এক বিদেশী আমলাতন্ত্র এদেশ শাসন করেছে ভারতীয় জনগণের স্বার্থ সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়ে। এই কালটি প্রধানত উল্লেখযোগ্য প্রকৃত ভারতীয় স্বার্থকে সযত্নে অবহেলা এবং বাঙ্ময় ও শিক্ষিত জনগণের অভিমতের জন্য। আমি কোনমতেই অস্বীকার করছি না যে ভিক্টোরীয় যুগের শেষভাগে এদেশের প্রশাসনে মাঝে মাঝে কল্যাণ-মূলক স্বেচ্ছাচার দেখা গিয়েছিল—যেমন লর্ড রিপন কর্তৃক মাতৃভাষায় সংবাদপত্র প্রকাশ আইন প্রত্যাহার। স্থানীয় স্বায়ত্বশাসন প্রবর্ত্তন, ইলবার্ট বিল এবং লর্ড ল্যান্সডাউন বড়লাট থাকাকালে ১৮৯১ সালের ভারতের পরিষদ আইনের সংশোধন। এগুলিকে কল্যাণ-মূলক স্বেচ্ছাচার বলার কারণ এদের অধিকাংশের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য ছিল আমলাতন্ত্রের শক্তি সংহত করা। প্রকৃত গুরুত্বপূর্ণ একমাত্র ব্যবস্থা হল স্থানীয় স্বায়ত্ব শাসন। কিন্তু একটু খুঁটিয়ে দেখলে দেখা যাবে এ যা ভাণ করছে আসলে এটি তা নয়। প্রকৃত ক্ষমতা কখনই হস্তান্তরিত করা হয়নি। এমনকি আপাত দৃষ্টিতে জনগণের কল্যাণ-মূলক কার্য্য করার সিদ্ধান্ত গ্রহণকালেও না। অন্যদিকে লর্ড লিটনের মাতৃভাষায় সংবাদপত্র প্রকাশ আইন, ভারতীয় বুদ্ধিজীবীগণ সম্পর্কে লর্ড ডাফরিণের অবজ্ঞামূলক মন্তব্য, "অতি ক্ষুদ্র সম্প্রদায়", এবং মাঝে মাঝে দুর্ভিক্ষ ত্রাণের জন্য মুষ্টিভিক্ষা—পরবর্তীকালের বিপ্লবাত্মক মনোভাব সৃষ্টির উপযুক্ত ভূমি তৈরি করেছিল।

তবে দ্বিতীয় স্তরের বা—বিপ্লবাত্মক মনোভাবের স্তর—সূত্রপাত করেন লর্ড কার্জন, তাঁর অখ্যাতিকর রাজপ্রতিনিধিত্বের জ্বলন্ত অবিবেচনা দিয়ে। তিনিই প্রথম প্রশাসনিক কর্মতৎপরতাকে অযৌক্তিক শ্রদ্ধা দেখান এবং জনগণের প্রয়োজনের উর্দ্ধে তাকে স্থান দেন। একদিকে প্রশাসনিক কর্মতৎপরতার বাড়াবাড়ি,

অন্যদিকে একগুঁয়ে জঘন্যতম পদ্ধতিতে ভারতীয় জনমত উপেক্ষা। জাতীয় আন্দোলনের পাল্টা জবাব ও তার কণ্ঠরোধ করার জন্য একটার পর একটা নির্দেশনামা প্রচার করা হয়েছিল যার ফলে অত্যাচার ও দমনাত্মক নীতির সূত্রপাত। একদিকে অত্যাচার ও ও দমন, অন্যদিকে ভারতীয় বুদ্ধিজীবীদের একটি শাখার মধ্যে প্রকৃত বিপ্লবাত্মক মনোভাব।

লর্ড কার্জনের পর তৃতীয় পর্য্যায় দেখা দিল। বিপ্লবাত্মক মনোভাব কয়েকজন তরুণকে তাদের জ্বলন্ত প্রতিশোধ ও স্বাধীনতা স্পৃহাকে প্রকৃত বিপ্লবাত্মক কাজে পরিণত করতে উদ্বুদ্ধ করল। লর্ড মিণ্টো বড়লাট থাকাকালে সরকার তাঁর বর্ম পরিহিত মুষ্টি দেখালেন। ভেলভেটের দস্তানা খোলামাত্র বিভীষিকাময় রাজত্ব শুরু হল। বাংলাদেশের একদল তরুণ সেই বিভীষিকাময় রাজত্বের জবাব দিলেন অবাধে বোমা ও রিভলভার ব্যবহার করে।

উদারতর দৃষ্টিকোণ থেকে বিষয়টি পর্য্যালোচনা করলে এই নতুন মনস্তত্বের একটি উল্লেখযোগ্য দিক ভুললে বা খেয়াল না করলে চলবে না। ভারতীয় জনগণকে অবিরাম অবহেলা এবং অত্যাচার ও দমনাত্মক নীতিই নিঃসন্দেহে হল ভারতের অশান্তি ও বিপ্লবাত্মক মনোভাবের মূল কারণ। কিন্তু এটা অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে, বর্তমান শতাব্দীর গোড়ার দিকে রাশিয়ার সঙ্গে রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে জাপানের সাফল্য এবং তার ফলে এসিয়ায় নবজাগরণ, মিশরের জাতীয়তাবাদীদের গেরিলা ও সংগ্রাম ও আইরিশ প্রজাতন্ত্রীদের কার্য্যকলাপ, সোভিয়েট রাশিয়ার প্রতিষ্ঠা ও সেই সঙ্গে বিশ্বব্যাপী বলশেভিক প্রচার এবং সর্বশেষে আঙ্গোরা সরকারের কাছে ইংল্যাণ্ড ও গ্রীসের নতি স্বীকার, এ সমস্তই যে কোন পদ্ধতিতে ভারতের স্বাধীনতা লাভের স্পৃহা জাগাতে যথেষ্ট সাহায্য করেছে।

এই প্রশ্নের প্রসঙ্গে ১৯০৫ সাল থেকে ১৯০৯ সাল পর্য্যন্ত প্রধান প্রধান ঘটনার তালিকা দান বিরক্তিকর হলেও লাভজনক।

১৯০৫ সাল

৩রা ফেব্রুয়ারি—ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে সরকারী কর্তৃত্বাধীনে আনার জন্য লর্ড কার্জন একটি বিল আনেন এবং ১০ই ফেব্রুয়ারি বিলটি পরিষদে গৃহীত হয়।

১১ই ফেব্রুয়ারী—কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে লর্ড কার্জন কর্তৃক সমাবর্তন ভাষণ দান—ভারতীয় সত্যনিষ্ঠায় সন্দেহ প্রকাশ করে।

১৯শে জুলাই—বঙ্গভঙ্গ বিষয়ে ভারত সরকারের প্রস্তাব প্রকাশিত হয়।

৭ই আগষ্ট— কলকাতায় বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ। কাশিম বাজারের মহারাজার সভাপতিত্বে টাউনহলে বর্জন আন্দোলন শুরু।

২১শে আগষ্ট— লর্ড কার্জনের বড়লাট পদ ত্যাগের ঘোষণা। (তিনি ১৭ই নভেম্বর ভারত ত্যাগ করেন)

১লা সেপ্টেম্বর—সিমলা থেকে বঙ্গভঙ্গের সরকারী ঘোষণা।

২রা সেপ্টেম্বর— বঙ্গভঙ্গের ঘোষণার ফলে সারা বাংলাদেশে শোক দিবস পালন।

২২শে সেপ্টেম্বর—বঙ্গভঙ্গ রহিত আন্দোলন ও স্বদেশী আন্দোলন সম্পর্কে কলকাতায় টাউনহলে শ্রী লালমোহন ঘোষের সভাপতিত্বে জনসভা। চার হাজার লোক সেই সভায় যোগ দেন।

২৫শে সেপ্টেম্বর—কলকাতার ময়দানে বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন নিষিদ্ধ হয়।

২৯শে সেপ্টেম্বর—সিমলায় সর্বোচ্চ ব্যবস্থাপক পরিষদের অধিবেশনে বঙ্গভঙ্গ বিলটি আইনরূপে গৃহীত হয়।

৮ই অক্টোবর— বঙ্গভঙ্গ সম্পর্কে বর্জন আন্দোলনের ফলে প্রধান প্রধান মাড়োয়ারি ব্যবসায়িগণ ম্যাঞ্চেষ্টার থেকে সূতী বস্ত্র আমদানি করতে অস্বীকার করেন।

১০ই অক্টোবর— বঙ্গ সরকারের মিঃ কার্লাইল ছাত্রদের পিকেটিংএ অংশ গ্রহণ নিষিদ্ধ ঘোষণা করে এক আদেশ জারি করেন।

১২ই অক্টোবর—বঙ্গভঙ্গ সম্পর্কে কাগজপত্র সরকারীভাবে প্রকাশিত হয়।

১৬ই অক্টোবর—নতুন ছোটলাট স্যর ব্যামফিল্ড ফুলার কর্তৃক শিলংএ নতুন পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন। ফেডারেশন হলের ভিত্তি স্থাপন এবং সারা বাংলাদেশে শোক পালন ও স্বর্গত শ্রী এ. এম. বসুর সভাপতিত্বে রাখী দিবস পালন।

১লা নভেম্বর— বাংলাদেশের ঐক্যের জন্য জনগণের ঘোষণা প্রদেশের সর্বত্র পাঠ করা হয়।

৮ই নভেম্বর— প্রকাশ্য রাস্তা ও পার্কে 'বন্দে মাতরম' ধ্বনি উচ্চারণ নিষিদ্ধ করে স্যার ফুলারের চীফ সেক্রেটারি মিঃ পি. সি. লায়নের আদেশ জারি।

১৯০৬ সাল

১২ই জানুয়ারি—ভারতীয় সমিতির প্রতিনিধিদলের দাবীর উত্তরে লর্ড মিণ্টোর ঘোষণা, বঙ্গভঙ্গ 'সম্পাদিত তথ্য'।

১৫ই এপ্রিল— জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ এমারসনের আদেশে বরিশাল সম্মেলন পণ্ড করা হয়।

২৭শে অক্টোবর—মৈমনসিংহে কয়েকজন ভদ্রলোক ও ছাত্রকে পুলিশ অযথা প্রহার করে।

১৯০৭ সাল

১লা জানুয়ারি—ময়দানে রাণী ভিক্টোরিয়ার মূর্তিতে আলকাতরা নিক্ষেপ ও তার বিকৃতিকরণ।

৯ই মে— ১৮১৮ সালের তৃতীয় বিধি অনুসারে লালা লাজপত রায় গ্রেপ্তার ও নির্বাসিত হন।

২০শে মে— একদল গুর্খা সৈন্য সিরাজগঞ্জে আমদানি ও হিন্দুদের মধ্যে ভীতির সঞ্চার।

১৭ই জুন— অমৃতসরে সভাসমিতি নিষিদ্ধ করে আদেশ জারি। লাহোরে 'হিন্দুস্তান' পত্রিকার সম্পাদক গ্রেপ্তার ও হাতকড়া লাগিয়ে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয়।

১১ই জুলাই— ফরিদপুর জেলা সম্মেলন—শ্রী পৃথ্বীশ চন্দ্র রায় সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন—নিষিদ্ধ।

২রা অক্টোবর— বিডন স্কোয়ারে পুলিশ বলপ্রয়োগ করে স্বদেশী সভা ভেঙ্গে দেয় এবং রাতে আশে পাশের অনেক দোকান লুঠ করে।

১০ই অক্টোবর—প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ সুইনহো গ্রীয়ার পার্ক ছাড়া কলকাতায় সব পার্কে জনসভা নিষিদ্ধ করে আদেশ জারী করেন।

১লা নভেম্বর— রাজদ্রোহমূলক জনসভা বিল আইনরূপে গৃহীত হয়।

২৬শে ডিসেম্বর—সুরাটে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের ২৩তম অধিবেশন পণ্ড।

১৯০৮ সাল

৩রা ফেব্রুয়ারি —মৈমনসিংহ জেলাকে তিনভাগে ভাগ করার প্রস্তাব করা হয়।

৩০শে এপ্রিল—মজঃফরপুরে শোচনীয় বোমা বিস্ফোরণ। শ্রীমতী ও কুমারী কেনেডীর গাড়ীতে বোমা নিক্ষেপ করা হয়।

১লা মে— মানিকতলায় বোমা ষড়যন্ত্রকারীরা ধরা পড়েন। শ্রীমতী ও কুমারী কেনেডীর হত্যাকারী সন্দেহে ওয়েনিতে ক্ষুদিরাম বসু গ্রেপ্তার।

২রা মে— ৩৮।৪ নং রাজা নবকৃষ্ণ ষ্ট্রীট থেকে শ্রী হেমচন্দ্র দাস গ্রেপ্তার। বাবু অরবিন্দ ঘোষ এবং 'নবশক্তি' পত্রিকার ম্যানেজার শ্রী শৈলেন্দ্র নাথ বসু ও সহকারী ম্যানেজার শ্রী অবিনাশ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য বোমা ষড়যন্ত্রের সঙ্গে লিপ্ত থাকার অভিযোগক্রমে নবশক্তি অফিস থেকে গ্রেপ্তার।

২রা মে— ৩২নং মুরারীপুকুর রোডের বাগানবাড়ী থেকে বারীন্দ্র কুমার ঘোষ, উল্লাসকর দত্ত, ইন্দুভূষণ রায়

ও আরও দশজন বোমা, বিস্ফোরক দ্রব্য ও অস্ত্রশস্ত্র সমেত গ্রেপ্তার।

৩রা মে— শ্রীমতী ও কুমারী কেনেডীর অন্যতম হত্যাকারী সন্দেহক্রমে প্রফুল্ল চাকীকে গ্রেপ্তার করার সময়ে সে নিজের রিভলভারের গুলিতে আত্মহত্যা করে।

৫ই মে— মানিকতলা বোমা ষড়যন্ত্র সম্পর্কে শ্রীরামপুরে নরেন্দ্রনাথ গোস্বামী গ্রেপ্তার।

৬ই মে— জনৈক খৃষ্টান মিশনারি মিঃ হিকিনবোথামকে গুলি করা সম্পর্কে কুষ্ঠিয়ায় পাঁচজন হিন্দুকে গ্রেপ্তার।

১৫ই মে— কলকাতায় গ্রে ষ্ট্রীটে ট্রাম লাইনে বোমা বিস্ফোরণের ফলে চারজন আহত হন।

২৪শে মে— হাওড়ায় প্যাসেঞ্জার ট্রেণের তৃতীয় শ্রেণীর কামরায় দুটি বোমা আবিষ্কার।

২রা জুন— ঢাকায় বারহাতে সশস্ত্র ডাকাতি। চল্লিশ জন সশস্ত্র লোকের তিনশ গ্রামবাসীর সঙ্গে লড়াই এবং চারজনকে হত্যা।

৮ই জুন— সংবাদপত্র আইন ও বিস্ফোরক দ্রব্য আইন অনুমোদিত।

২১শে জুন— কাঁকিনাড়ায় একটি দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরায় বোমা নিক্ষিপ্ত হয়, ফলে জনৈক ইউরোপীয় যাত্রী গুরুতর আহত হন।

২২শে জুন— মানিকতলা বোমা ষড়যন্ত্রের অন্যতম আসামী রাজসাক্ষী হয়ে অরবিন্দ ঘোষ ও বাংলাদেশের আরও কয়েকজন খ্যাতনামা ব্যক্তির বিরুদ্ধে ডাকাতি ও হত্যা প্রয়াসের অভিযোগ করে এক চাঞ্চল্যকর বিবৃতি দেন।

২রা আগষ্ট— অস্ত্র আইন বলে হ্যারিসন রোড মামলার ধৃত দুজন আসামীর মধ্যে নগেন ও ধরণী গুপ্ত এবং উল্লাসকর দত্তকে সাত বছর করে সশ্রম কারাদণ্ড এবং অন্যান্যদের মুক্তি দেওয়া হয়।

১১ই আগষ্ট— ক্ষুদিরামের ফাঁসী।

১২ই আগষ্ট— চন্দননগর রেল ষ্টেশনের কাছে দুটি বোমা আবিষ্কার।

২৮শে আগষ্ট— মেদিনীপুরে সমস্ত ইউরোপীয় কর্মচারীকে হত্যার ষড়যন্ত্র করার অভিযোগে নাড়াজোলের রাজা নরেন্দ্রলাল খাঁ ও আরও আটজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার। (১৮ই সেপ্টেম্বর তাঁদের জামীনে মুক্তি দেওয়া হয়। ৯ই ডিসেম্বর বিচারপতি এস. পি. সিংহ তাঁদের বিরুদ্ধে মামলা প্রত্যাহার করেন।)

৩১শে আগষ্ট— মানিকতলা বোমা ষড়যন্ত্র মামলার রাজসাক্ষী নরেন্দ্রনাথ গোস্বামীকে আলিপুর জেলে গুলি করে হত্যা করা হয়।

৮ই সেপ্টেম্বর— ভার্সোভা থেকে দাদাভাই নওরোজী দেশবাসীকে হিংসাত্মক পদ্ধতি অবলম্বন না করার জন্য অনুরোধ জানান।

২০শে সেপ্টেম্বর—রাজদ্রোহের অপরাধে টিলকের ছবছর নির্বাসনের দণ্ডাজ্ঞা বম্বে সরকার হ্রাস করে ছবছর বিনাশ্রম কারাদণ্ড দেন।

১৪ই অক্টোবর—কলকাতার চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট তাঁদের এলাকার মধ্যে জনসভা অনুষ্ঠান নিষিদ্ধ করে যে আদেশ দিয়েছিলেন বঙ্গ সরকার তার মেয়াদ ২২শে অক্টোবর থেকে আরও ছমাস বাড়িয়ে দেন।

৭ই নভেম্বর— জিতেন্দ্র নাথ রায়চৌধুরী কলকাতায় ওভারটুন হলে বাংলার ছোটলাট স্যার অ্যাণ্ড্রু ফ্রেজারকে হত্যার চেষ্টা করেন।

৯ই নভেম্বর— বাংলাদেশের গোয়েন্দা বিভাগের নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায়কে—যিনি প্রফুল্ল চাকীকে গ্রেপ্তার করার চেষ্টা করেছিলেন—কলকাতার একটি গলিতে গুলি করে হত্যা করা হয়।

১০ই নভেম্বর— আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে কানাইলাল দত্তের ফাঁসী। বহু নরনারীর উপস্থিতিতে তাঁর শবদাহ করা হয়।

২৩শে নভেম্বর—নরেন্দ্রনাথ গোস্বামীর হত্যার অপরাধে দণ্ডিত সত্যেন্দ্রনাথ বসুকে আলিপুর জেলে ফাঁসী দেওয়া হয়।

৩০শে নভেম্বর— লণ্ডনে নিউ রিফর্ম ক্লাবে এক ভাষণে শ্রী গোখলে বলেন যে, ভারতে পরিস্থিতি গুরুতর রূপ নিচ্ছে এবং বঙ্গভঙ্গ রদ ও সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি না দিলে বাংলাদেশকে কিছুতেই শান্ত করা যাবে না।

১লা ডিসেম্বর— কমন্স সভায় মিঃ রীস ফ্রান্স থেকে ভারতে রাজদ্রোহমূলক সাহিত্য প্রেরণ নিষিদ্ধ করার প্রস্তাব করেন।

১১ই ডিসেম্বর— রাজনৈতিক বন্দীদের আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ না দিয়ে বিচার ও কয়েকটি সমিতি ও সংস্থা নিষিদ্ধ ঘোষণা করার জন্য একটি বিশেষ অপরাধ আইন ভারতের ব্যবস্থাপক সভায় মাত্র একদিনের বৈঠকেই গৃহীত হয়।

১১ই ডিসেম্বর— ১৮১৮ সালের তৃতীয় বিধি অনুসারে কৃষ্ণ কুমার মিত্র গ্রেপ্তার ও নির্বাসিত।

১৩ই ডিসেম্বর—১৮১৮ সালের তৃতীয় বিধি অনুসারে অশ্বিনী কুমার দত্ত, সুবোধ চন্দ্র মল্লিক ও আরও পাঁচজনের নির্বাসন।

১৯০৯ সাল

৬ই জানুয়ারি— নতুন অপরাধ আইন অনুসারে পূর্ববঙ্গের অনেকগুলি সমিতি নিষিদ্ধ হয়।

১০ই ফেব্রুয়ারি—চারু চন্দ্র বসু সরকারী উকিল ও চব্বিশ পরগণার পাবলিক প্রসিকিউটর আশুতোষ বিশ্বাসকে আলিপুরের ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালত প্রাঙ্গণে গুলি করে হত্যা করেন।

২রা মার্চ— কমন্স সভায় মিঃ লুপটন জানতে চান রাশিয়ায় ও ভারতে দমনাত্মক পদ্ধতির মধ্যে পার্থক্য কি। আণ্ডার সেক্রেটারি কোন জবাব দেননি।

১৫ই এপ্রিল— সূর্য্যাস্তের আধ ঘণ্টার মধ্যে কলকাতার পার্কগুলিতে জনসভা অনুষ্ঠান নিষিদ্ধ করে যে আদেশ জারী ছিল তার মেয়াদ আর এক বছর বাড়ান হয়।

৬ই মে— বিচারপতি বীচ্‌ক্রফট আলিপুর বোমা ষড়যন্ত্র মামলায় রায় দেন। গ্রীষ্মকালে পার্লামেণ্টে ভারতীয় পরিষদ আইনের সংশোধন গৃহীত হয়। তাতে মর্লে-মণ্টেগু সংস্কার ব্যবস্থা সংযোগ করা হয়।

১৯১০ সাল

মিণ্টো-মণ্টেগু সরকার পরিকল্পনা কার্য্যকরী এবং প্রচণ্ড দমনমূলক সংবাদপত্র আইন গৃহীত হয়।

১৯১০ সাল থেকে আজ পর্য্যন্ত প্রধান প্রধান ঘটনাবলী এই পঞ্জীতে আমি উল্লেখ করিনি কারণ সেগুলি আপনাদের পরিষ্কার মনে আছে। ১৯১২ সালে বঙ্গভঙ্গ রহিত, রাজকীয় শোভাযাত্রা সহকারে যাত্রাকালে দিল্লীতে চাঁদনীচকে লর্ড হার্ডিঞ্জের ওপর বোমা নিক্ষেপ, ভারত রক্ষা আইন অনুসারে অন্তরীণ, রাওলাট আইন, জালিয়ানওয়ালাবাগের শোচনীয় হত্যাকাণ্ড এবং কোমাগাতা মারুর ঘটনা প্রভৃতি এই কালের স্মরণীয় ঘটনা।

এ থেকে একটা জিনিষ স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, সরকারের দমনাত্মক ব্যবস্থার ফলেই বিপ্লব আন্দোলন। আবার তারফলে উগ্রতর চণ্ডনীতি। ব্রিটিশ সরকার যখন হিতকর ব্যবস্থা অবলম্বন করতেন তখনও তার সঙ্গে সঙ্গে আসত দমনাত্মক ব্যবস্থা।

জালিয়ানওয়ালাবাগের শোচনীয় ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে এক নতুন যুগের সূত্রপাত হয়। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের নতুন হাতিয়ার

নিয়ে এলেন মহাত্মা গান্ধী—অহিংসা। আশা করি সারা ভারত তা মেনে নিয়েছে। কোন রূপে বা আকারে হিংসার অনিবার্য্য ব্যর্থতা সম্বন্ধে সচেতন হওয়ার জন্য আমি সরকার ও আমার বিপ্লবী বন্ধুদের উভয়কেই অনুরোধ জানাচ্ছি।

নতুন অর্ডিন্যান্স আইন জনগণের ওপর হিংসা চিরস্থায়ী করার ভ্রান্তিকর প্রয়াস। সারা ভারত একস্বরে এর নিন্দা করেছে। উপযুক্ত ভাষায় এ সম্বন্ধে আমার অভিমত প্রকাশ করতে গিয়ে আত্মসম্বরণ করতে পারব বলে মনে হয় না। আমি নিজেকে সংযত রাখতে চাই। আমি শুধু এ কথাই বলব যে, বিনাদ্বিধায় আমি এর নিন্দা করছি। সরকারের দমনাত্মক নীতির সঙ্গে আমাকে সহযোগিতার আমন্ত্রণ জানিয়ে লর্ড বার্কেনহেড যে কথা বলেছিলেন তার একমাত্র সঠিক জবাব—যা যে কোন ভারতীয় দেবেন—দিয়েছিলাম।

আপনাদের মনে আছে যে, লর্ড বার্কেনহেড বলেছিলেন, অপরাধী ছাড়া আর কাউকেই অর্ডিন্যান্সটি আঘাত করেনি। তিনি যে পুরো প্রশ্নটি এড়িয়ে গিয়েছেন তার উল্লেখ কি আমি করতে পারি? এই অর্ডিন্যান্স অনুযায়ী ধৃত সকল ব্যক্তিকে অপরাধী বলে গণ্য করতে আমি অস্বীকার করছি। তাঁরা অপরাধী কি না তার একমাত্র প্রমাণ হতে পারে প্রকাশ্য বিচারের দ্বারা। গোপন খবর নয়, প্রকৃত ঘটনার ভিত্তিতে—যা প্রকাশ্য আদালতে যাচাই করা যেতে পারে—বিচার হবে। কর্তৃপক্ষ আদালতের স্থান নেওয়ার চেষ্টা করলে জনগণের মধ্যে যে অনিরাপত্তার ভাব আসে সে সম্বন্ধে ইংল্যাণ্ডের সংবিধানের প্রখ্যাত ইতিহাস লেখকগণ উল্লেখ করেছেন।

সরকার তাঁদের চণ্ডনীতির সমর্থনে যে সমস্ত ঘটনার কথা

বলেছেন সেগুলির পুনরুল্লেখ করে আপনাদের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটাতে চাই না। গত ২৫শে ফেব্রুয়ারী বিধান সভায় বঙ্গ জরুরী বিধি সম্বন্ধে আলোচনা কালে পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু এ সম্বন্ধে বিশদ বিবরণ দিয়েছেন। সরকার তাঁর অন্যান্য দাবীর অনুকূলে কোন নির্ভরযোগ্য ঘটনা তুলে ধরতে পারেন নি, সে বিষয়ে যদি আপনাদের কারুর সন্দেহ থাকে তাহলে তাঁদের প্রত্যেককে আমি পণ্ডিত নেহেরুর ভাষণটি পড়ার জন্য অনুরোধ করছি। আমি আরও জানাতে চাই যে, সরকারের চণ্ডনীতির সমর্থনে যে বিবৃতি দেওয়া হয়েছে তা বিশ্বাস করা কঠিন। আমি শুধু একটি ঘটনার উল্লেখ করেই শেষ করব। ১৯০৮ সালের ১১ই ডিসেম্বর তারিখে শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র ও স্বর্গত অশ্বিনীকুমার দত্ত এবং আরও ন'জন বাঙ্গালী ভদ্রলোককে গ্রেপ্তার ও আটক প্রসঙ্গে তদানীন্তন ভারত সচিব লর্ড মর্লে লর্ড মিণ্টোকে এক চিঠিতে লেখেন—"এক বছর আগে রাজার বিশেষ ক্ষমতাবলে আপনি ন'জন লোককে আটক রাখেন কারণ ফৌজদারী ষড়যন্ত্রের সঙ্গে তাঁদের যোগ আছে বলে আপনি মনে করেছিলেন এবং আশা করেছিলেন যে তাদের আটক করলে এ ষড়যন্ত্র রোধ করা সম্ভব হবে।"

এবার শোনা যাক স্যার হিউজ ষ্টিফেনসন এ বিষয়ে কি বলেন। এই সেদিন বঙ্গ পরিষদে তিনি তাঁর আসন থেকে বলেন, "আমাদের পদ্ধতি শুধু কার্য্যকারিতা নয়, আন্তরিকতা সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করার জন্য সংবাদপত্রগুলি যে তিনটি ঘটনার উল্লেখ করেছে আমি সেগুলো সম্বন্ধে বলতে চাই। প্রথম দুটি হল বাবু অশ্বিনীকুমার দত্ত ও বাবু কৃষ্ণকুমার মিত্র সংক্রান্ত। এ কথা বলা হয়েছে যে, তাঁরা সন্ত্রাসবাদমূলক অপরাধের সঙ্গে কোনভাবে জড়িত ছিলেন, একথা কেউ বিশ্বাস করবে না।

অতএব পুলিশ যে গোপন সংবাদ দিয়েছে তা মিথ্যা এবং সরকারও এ মিথ্যা সংবাদে প্রতারিত হয়েছেন। বাবু অশ্বিনী কুমার দত্তকে আমি চিনতাম না। কিন্তু বাবু কৃষ্ণকুমার মিত্র আমার বিশেষ বন্ধু এবং সন্ত্রাসমূলক অপরাধের প্রতি তাঁর বিন্দুমাত্র সহানুভূতি নেই বলে আমি মনে করি। আমি যতদূর জানি, তাঁর এবং বাবু অশ্বিনী কুমার দত্তের বিরুদ্ধে অপরাধে অংশগ্রহণ দূরে থাক, অপরাধ বৃদ্ধিতে সহায়তা করার অভিযোগ কেউ করেন নি। সরকারের বিরুদ্ধে ঘূর্ণিঝড়ের মত ভাষণ দিয়ে বেড়ানর জন্যই বাবু অশ্বিনী কুমার দত্তের বিরুদ্ধে তৃতীয় বিধি প্রয়োগ করেন।"

এ থেকে নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হয় যে, বেআইনী আইন প্রয়োগের যে বিবেচনামূলক ক্ষমতা এদেশের সরকার ব্যবহার করে থাকেন তারও অপপ্রয়োগ হতে পারে। প্রকৃতপক্ষে, সমস্ত ব্যবস্থার প্রকৃতির জন্যই তা ঘটতে বাধ্য। বিশ্বের ইতিহাসে দেখা যায় যে, আমলাতান্ত্রিক সরকার চিরকাল 'আইন ও শৃঙ্খলা' পদ্ধতির সাহায্যে নিজেদের ক্ষমতা সংহত করতে চেষ্টা করছে। এটি একটি চমৎকার শব্দ কিন্তু যে সব দেশে আইনের শাসন নেই সেখানে এর অর্থ হল, ক্ষমতাসীন ব্যক্তিদের অবরোধমূলক ক্ষমতার যথেচ্ছ বা বিবেচনামূলক অবাধ প্রয়োগ। দমনাত্মক ব্যবস্থা হল স্বেচ্ছাচারী ক্ষমতা সংহত করার পদ্ধতি এবং আমি সরকারের হিংসামূলক কাজের—চণ্ডনীতি হল হিংসার হিংস্রতম রূপ—তীব্র নিন্দা করি। তেমনি রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জনের জন্য হিংসাকে পদ্ধতি হিসাবে ব্যবহার করারও তীব্র নিন্দা করি। আমি সরকারকে সাবধান—করে দিচ্ছি চণ্ডনীতি হল অদূরদর্শিতার পরিচায়ক। কিছুকাল তা সরকারের হাতকে শক্তিশালী করতে পারে কিন্তু আমি নিশ্চিত জানি—এবং

লর্ড বার্কেনহেডের তা উপলব্ধি করা দরকার—সরকারের হাতিয়ার হিসেবে তার ব্যর্থতা অনিবার্য্য।

এ পর্য্যন্ত পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করার উদ্দেশ্য হল হিংসা শুধু নীতিহীন নয়, অযৌক্তিকও বটে তা দেখান। নীতিহীন, কারণ তা আমাদের জীবন ও কৃষ্টির সঙ্গে খাপ খায় না। অযৌক্তিক, কারণ কোন সুসংগঠিত সরকারকে বোমা ও রিভলভার দিয়ে উৎখাত করা যায় একথা আজ ভাবাই যায় না। তাহলে প্রশ্ন ওঠে, স্বরাজ লাভের জন্য আমরা কোন পদ্ধতি অবলম্বন করব? আমাদের গম্ভীরভাবে বলা হয়েছে যে আমরা যদি বর্তমান শাসন সংস্কার আইন কার্য্যকরী করতে সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করি তাহলে স্বরাজ আমাদের মুঠির মধ্যে। এই যুক্তি প্রসঙ্গে আমার বক্তব্য খুব পরিষ্কার। এ সম্বন্ধে যাতে বাকবিতণ্ডা না হয় সেজন্য আমি আমার বক্তব্য আবার পেশ করছি। আমি যদি বুঝতে পারতাম যে বর্তমান আইন জনগণের হাতে কোন প্রকৃত দায়িত্ব দিয়েছে, যদি বুঝতে পারতাম যে এই আইনে আত্মোপলব্ধি, আত্মোন্নয়ন ও আত্মচরিতার্থতার সুযোগ আছে তাহলে বিনাদ্বিধায় সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা এবং পরিষদের ভেতরে থেকে গঠনমূলক কাজ সুরু করতাম। কিন্তু ছায়ার জন্য কায়া ত্যাগ করতে আমি রাজী নই। শাসন সংস্কার আইন জনগণকে যে কোন প্রকৃত দায়িত্ব দেয়নি তা আজ প্রতিপন্ন করতে গিয়ে আপনাদের সময় নেব না। এ সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা আমি আমেদাবাদ কংগ্রেসে আমার ভাষণে করেছি এবং আরও যুক্তির প্রয়োজন যদি হয় তাহলে মুডিম্যান কমিটির সামনে প্রদত্ত সাক্ষ্যতে পাওয়া যাবে। যাঁরা সাক্ষ্য দিয়েছিলেন তাঁদের নরম মনোভাব সম্বন্ধে সরকারের কোন সন্দেহ থাকতে পারে না। বর্তমান আইনের ভিত্তি হল মন্ত্রীদের অবিশ্বাস। অবিশ্বাসের আবহাওয়ায় সহযোগিতার কোন কথাই হতে পারে

না। সেই সঙ্গে আমার মতবাদ—আশা করি বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনের মতবাদও—পরিষ্কার জানতে চাই। জনগণের হাতে যদি কোন প্রকৃত দায়িত্ব দেওয়া হয় তাহলে সরকারের সঙ্গে আমাদের সহযোগিতা না করার কোন কারণ নেই। কিন্তু এই সহযোগিতা বাস্তব ও ফলপ্রসূ করতে হলে দুটি জিনিষ করা দরকার—প্রথমত আমাদের শাসন কর্তাদের অন্তরের প্রকৃত পরিবর্তন হওয়া দরকার; দ্বিতীয়ত সম্পূর্ণ অর্থে স্বরাজের প্রতিশ্রুতি এখনই দিতে হবে। নিকট ভবিষ্যতে তা আপনা থেকেই আসবে। আমি সব সময় বলেছি যে আমাদের গঠনমূলক কাজ এক্ষুণি শুরু করার সুযোগ পাওয়ার জন্য আমাদের বিরাট স্বার্থত্যাগ করতে হবে। আশা করি আপনারা উপলব্ধি করবেন যে, এক্ষুণি যদি স্বরাজের ভিত্তি স্থাপিত হয় এবং শাসক ও শাসিত উভয়েরই অন্তরের যদি প্রকৃত পরিবর্তন ঘটে তাহলে কয়েক বছর একটা জাতির ইতিহাসে কিছুই নয়। আপনারা হয়ত বলবেন যে "অন্তরের পরিবর্তন" কথাটি সুন্দর এবং সেই পরিবর্তনের কিছু বাস্তব নমুনা প্রয়োজন। আমি তা মানি। কিন্তু সেই প্রকাশ নির্ভর করে কোন প্রস্তাবিত মীমাংসার দ্বারা তৈরি আবহাওয়ার ওপরে। বিশ্বাস বা অবিশ্বাসের আবহাওয়া সহজেই অনুভব করা যায় কিন্তু কোন শান্তিপূর্ণ মীমাংসার ক্ষেত্রে প্রকৃত শর্ত অপেক্ষা তার পেছনের মনোভাবের ওপর অনেক কিছু নির্ভর করে। বর্তমান মুহূর্তে এ ধরণের কোন মীমাংসার সঠিক শর্ত স্থির করা অসম্ভব। কিন্তু হৃদয়ের পরিবর্তন যদি ঘটে এবং উভয়পক্ষ যদি শান্তি, সামঞ্জস্য ও পারস্পরিক বিশ্বাসের ভিত্তিতে আলাপ আলোচনা চালায় এই শর্তগুলির সংজ্ঞা নির্দেশ সম্ভব হয়ে উঠবে।

তবে বাংলাদেশের জনগণের সর্বাপেক্ষা প্রিয় বিষয়ের দিকে নজর রেখে কয়েকটি প্রস্তাব করা যেতে পারে।

প্রথমত, অবরোধের উদ্দেশ্যে বিবেচনামূলক ব্যাপক ক্ষমতা প্রয়োগে সরকার বিরত থাকবেন এবং তারপর, সকল রাজনৈতিক বন্দীকে মুক্তি দেবেন। তারপর, কমনওয়েলথের ভেতরে থেকে নিকট ভবিষ্যতে স্বরাজ প্রতিষ্ঠায় আমাদের পূর্ণ ক্ষমতা সরকার স্বীকার করবেন এবং এই স্বরাজের নিশ্চিত ও উপযুক্ত ভিত্তি এখনই স্থাপন করতে হবে। উপযুক্ত ভিত্তি স্থাপিত হওয়া উচিত আলাপ আলোচনা ও মীমাংসার মাধ্যমে। মীমাংসা শুধু সরকার ও জনগণের মধ্যে নয়, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যেও— ইউরোপীয় ও ইঙ্গ-ভারতীয় সম্প্রদায়কে বাদ না দিয়ে। একথা আমি গয়াতে সভাপতির ভাষণে বলেছিলাম।

একথাও বলা দরকার যে, আমাদের পক্ষ থেকে প্রতিশ্রুতি দেওয়ার জন্য প্রস্তুত হতে হবে যে আমাদের কথায়, কাজে বা ভাবভঙ্গীতে বিপ্লবাত্মক প্রচারে উৎসাহ আমরা দেব না এবং এ ধরণের আন্দোলনের অবসান ঘটাবার জন্য সর্বপ্রকার চেষ্টা করব। তবে এই প্রতিশ্রুতির কোন প্রয়োজন নেই কারণ বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলন কোনদিনই বিপ্লবাত্মক প্রচারের দিকে ঝোঁকেনি। আমার বিশ্বাস সরকারের অন্তরের পরিবর্তন ঘটার সঙ্গে সঙ্গে বিপ্লবীর মানসিক দৃষ্টিভঙ্গীরও পরিবর্তন ঘটবে এবং যে মীমাংসার উল্লেখ করেছি তা ঘটলে বিপ্লব আন্দোলন অতীতের বিষয় হয়ে দাঁড়াবে। আর আজ সরকারের বিরুদ্ধে যে ক্ষমতা ও শক্তি প্রয়োগ করা হচ্ছে তাই জনগণের প্রকৃত সেবায় নিয়োজিত হবে।

তবে আমাদের মীমাংসা প্রস্তাব যদি কোন সাড়া জাগাতে না পারে তাহলে গত দু বছর ধরে আমরা যে নীতি অনুসরণ করে আসছি সেই অনুসারে আমরা জাতীয় কাজ অবশ্যই চালিয়ে যাব যাতে সরকারের পক্ষে ব্যতিক্রমমূলক ক্ষমতা

প্রয়োগ ব্যতীত দেশ প্রশাসন অসম্ভব হয়ে পড়ে। কেউ কেউ আছেন যাঁরা এই পথ থেকে শিউরে সরে দাঁড়ান। তাঁদের অখণ্ডনীয় যুক্তি হল আমরা যদি গ্রামে গিয়ে প্রজাদের কর দানে নিবৃত্ত করতে প্রস্তুত না হই তাহলে রসদ প্রত্যাখ্যানের অধিকার আমাদের নেই। আমার জবাব হল, জাতীয় আইন অমান্য আন্দোলন—যা স্বাধীনতার জন্য সংগ্রামী মানুষের শেষ হাতিয়ার—ঐতিহাসিক নজিরের কোন প্রয়োজন আমার নেই; কিন্তু আমাদের বর্তমান সংগ্রামে ইংরেজের ইতিহাসের প্রসঙ্গ উত্থাপনের যদি প্রয়োজন হয় তাহলে বলতে পারি যে, ষ্টুয়ার্টদের আমলে ইংল্যাণ্ডে কর দানে অস্বীকার দেখা গিয়েছিল পার্লামেণ্ট কর্তৃক রাজার বরাদ্দ দানে প্রত্যাখ্যানের বহু বছর পরে। সরকারকে রাজস্ব সংগ্রহের জন্য ব্যতিক্রমমূলক ক্ষমতা প্রয়োগে বাধ্য করেই আইন অমান্য আন্দোলনের আবহাওয়া সৃষ্টি করা যায়। এবং সেই সময় যখন আসবে তখন স্বদেশবাসীকে কর না দিতে—যে কর আদায়ের জন্য সরকার ব্যতিক্রমমূলক ক্ষমতা প্রয়োগ করেছেন—বিনা দ্বিধায় অনুরোধ করব।

আশা করি সে দিন আসবে না। বস্তুত সর্বত্র হৃদয়ের পরিবর্তন দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু এই তথ্য আমাদের স্বীকার করতেই হবে যে, পুনর্মিলনের সকল আশাই যদি ব্যর্থ হয় তাহলে আইন অমান্য আন্দোলন করা ছাড়া আমাদের উপায় নেই। কিন্তু আমাদের এ তথ্যও স্বীকার করতে হবে যে, আইন অমান্য আন্দোলনের জন্য প্রয়োজন অতি উচ্চ স্তরের সংগঠন, স্বার্থত্যাগের অসীম ক্ষমতা এবং জাতির সাধারণ স্বার্থে ব্যক্তিগত ও সাম্প্রদায়িক স্বার্থত্যাগের আন্তরিক ইচ্ছা। মহাত্মা গান্ধীর গঠনমূলক কার্য্যসূচী পূরোপূরি রূপায়িত করার জন্য ভারত প্রস্তুত না হলে ভারত কোনকালেই আইন অমান্য আন্দোলনের

জন্য তৈরি হতে পারবে না বলে আমার মনে হয়। তবে উদ্দেশ্যের দিকে অবশ্যই দৃষ্টি দিতে হবে, কারণ স্বাধীনতা অবশ্যই লাভ করতে হবে।

কিন্তু সর্বত্র আমি পুনর্মিলনের চিহ্ন দেখতে পাচ্ছি। বিশ্ব আজ সংগ্রাম ক্লান্ত। আমি চারদিকে সৃষ্টির, সংহতি সাধনের প্রকৃত ইচ্ছা দেখতে পাচ্ছি। আমি বিশ্বাস করি, বিশ্বের ইতিহাসে ভারতের বিরাট ভূমিকা নেওয়ার আছে। তার একটা বাণী দেবার আছে এবং বিশ্ব জাতির বিরাট কমনওয়েলথে—যার কথা আমি আগে বলেছি—সেই বাণী দেওয়ার জন্য ভারত উদগ্রীব। ব্রিটিশ রাজনীতিজ্ঞগণ কি ঠিকমত সাড়া দেবেন? তাঁদের আমি বলি, আপনাদের এবং আমাদের উভয়ের পক্ষে সম্মানজনক শর্তে আপনারা শান্তি পেতে পারেন। ভারতে ব্রিটিশ সম্প্রদায়কে বলি, আপনারা স্বাধীনতার ঐতিহ্য নিয়ে এসেছেন এবং আমাদের জাতীয় সংগ্রামে সহযোগিতা করতে আপনারা অস্বীকার করতে পারেন না। তবে চূড়ান্ত মীমাংসার সময় আপনাদের কথা বলার অধিকার আমরা স্বীকার করে নেব। বাংলাদেশের জনগণকে বলি, রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভের সাহস দেখানর ফলে আপনারা বিরাট স্বার্থত্যাগ করেছেন এবং সরকারী ক্রোধের সকল পরিণাম আপনাদের সহ্য করতে হয়েছে। কিন্তু আপনাদের রাজনৈতিক অস্ত্রগুলি সরিয়ে রাখার সময় এখনও আসেনি। কঠোর সংগ্রাম করুন কিন্তু সে সংগ্রামে কলুষতা যেন না থাকে। তারপর আপোষ মীমাংসার দিন যখন আসবে—যা আসতে বাধ্য—উদ্ধত মনোভাব নয়, উপযুক্ত নম্রতার সঙ্গে শান্তি সম্মেলনে আপনারা যোগ দেবেন যাতে লোকে বলে যে আপনাদের সাফল্য—আপনাদের দুঃখ দুর্দশা থেকে আরও মহীয়ান করেছে। জাতীয়তা হল আত্মোপলব্ধি,

আত্মোন্নয়ন ও আত্মচরিতার্থতার উপায় মাত্র। এটিই উদ্দেশ্য নয়। মানবিকতা, আত্মোপলব্ধি, উন্নয়ন ও চরিতার্থতার জন্যই জাতীয়তার বৃদ্ধি ও বিকাশ প্রয়োজন। আপনাদের কাছে আমার বিনীত নিবেদন, মীমাংসার শর্তগুলি আলোচনাকালে জাতীয়তার দম্ভে মানবিকতার বৃহত্তর দাবীর কথা ভুলবেন না। আমি কি খুঁজছি তার পরিষ্কার ধারণা আমার আছে। আমি চাই, ভারতের সকল রাজ্যের এক সংঘ, যেখানে প্রত্যেক রাজ্যের নিজস্ব সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য অনুসরণের অবাধ অধিকার থাকবে, সর্বসাধারণের সেবায় রাজ্যগুলি পরস্পরের সঙ্গে আবদ্ধ থাকবে। ভারত হবে স্বাধীন জাতি সংঘের মধ্যে এক মহান সংঘ যার স্বাধীনতা হল তার মানব সেবার মাপকাঠি এবং যার ঐক্য বিশ্বের সকল মানুষের মধ্যে শান্তির আশা সঞ্চার করবে।

বন্দে মাতরম্।

চিত্তরঞ্জনের জীবনপঞ্জী

১৮৭০ (৫ই নভেম্বর)—	জন্ম।
১৮৮৬—	কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।
১৮৯০—	আই. সি. এস পরীক্ষার জন্য লণ্ডন যাত্রা।
১৮৯৩—	ব্যারিষ্টারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। কলকাতা হাইকোর্টে যোগদান।
১৮৯৫—	'মালঞ্চ' (প্রথম বাংলা কবিতা সঙ্কলন) প্রকাশ।
১৯০৪—	'মালা' প্রকাশ।
১৯০৫—	স্বদেশী মণ্ডলী গঠন।
১৯০৬—	বরিশালে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনে মূল প্রস্তাবের খসড়া রচনা।
১৯০৭—	রাজদ্রোহমূলক মামলায় ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় ও বিপিন চন্দ্র পালের পক্ষ সমর্থন।
১৯০৯—	আলিপুর বোমা ষড়যন্ত্র মামলায় অরবিন্দ ঘোষকে রক্ষা করেন।
১৯১০—১৯১১—	'সাগর সঙ্গীত' রচনা। ঢাকা ষড়যন্ত্র মামলায় পুলিন বিহারী দাসের পক্ষ সমর্থন।
১৯১৪—	দিল্লী ষড়যন্ত্র মামলা। বাংলা সাপ্তাহিক 'নারায়ণ' প্রকাশ।

১৯১৭—	ভারত সচিব ই. এস. মণ্টেগুর সঙ্গে সাক্ষাৎকার। কলকাতা বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনে সভাপতিত্ব।
১৯১৮—	আলিপুর ট্রাঙ্ক হত্যা মামলা ও অমৃতবাজার পত্রিকা মানহানি মামলা।
১৯২১—	আইন ব্যবসায় ত্যাগ। ফৌজদারী বিধি সংশোধনী আইন অনুসারে গ্রেপ্তার। আমেদাবাদে কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত।
১৯২২—	ছ মাস সশ্রম কারাদণ্ড। গয়া কংগ্রেসের সভাপতি।
১৯২৩—	মতিলাল নেহেরুর সঙ্গে স্বরাজ্য দল গঠন। বম্বেতে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সভাপতি। ফরোয়ার্ড পাবলিশিং কোম্পানী প্রতিষ্ঠা ও 'ফরোয়ার্ড' পত্রিকা প্রকাশ।
১৯২৪—	কলকাতা পৌর প্রতিষ্ঠানের প্রথম মেয়র নির্বাচিত। বঙ্গীয় বিধান সভায় স্বরাজ্য দলের প্রথম নেতা।
১৯২৫—	ফরিদপুরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনের সভাপতি।
১৯২৫ (১৬ই জুন)—	মৃত্যু।

নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জী

ব্যানার্জি দাস এণ্ড কোং—'স্পীচেস অব সি. আর. দাশ' (১৯১৭-১৮) (কলকাতা) ১৯১৮

দাশ, সি. আর ও দাশ, ভগবান—'আউটলাইন স্কীম অব স্বরাজ' (বম্বে) ১৯২৩

দাস, স্নকুমার রঞ্জন—'দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন' (কলকাতা) ১৯৩৬

দাসগুপ্ত, হেমেন্দ্রনাথ—'দেশবন্ধু স্মৃতি' (কলকাতা) ১৯২৬

পাল, বিপিন চন্দ্র—বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনে সভাপতির ভাষণ, বরিশাল, ১৯২১

রায়, পৃথ্বীশ চন্দ্র—'দি লাইফ অ্যাণ্ড টাইমস অব সি. আর দাশ' (কলকাতা) ১৯২৭

সেন, রাজেন ও সেন, বি. কে—'দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন' ১ম খণ্ড (কলকাতা) ১৯২৬

সীতারামায়া, বি. পট্টাভি—'দি হিষ্ট্রি অব দি ইণ্ডিয়ান কংগ্রেস, ১৮৮৫—১৯৩৫' (এলাহাবাদ) ১৯৩৫

'দি ওয়ে টু স্বরাজ'—মাদ্রাজে দেশবন্ধু দাশের বক্তৃতাবলী (মাদ্রাজ) ১৯৩৩

নব ভারত স্রষ্টা

প্রকাশন বিভাগ
তথ্য ও বেতার মন্ত্রক
ভারত সরকার